হংসেশ্বরী

নারায়ণ সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৮.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে
স. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫১ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে অ

পরমশ্রদ্ধেয়া

শ্রীআশাপূর্ণা দেবীকে

এক

আশাচলেন্দু সম্পূর্ণে শকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভরা
রেজে তৎ শ্রীগৃহস্ক শ্রীনৃসিংহদেব-দত্ততঃ ॥

—অর্থ বুঝলে বাবা?

প্রশ্নটা শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিত শ্রীত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ—অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত। শিলালিপিটা সকলেই দেখেছে—নূতন শক্তি মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রোথিত শিলালেখ। সদ্য বসানো হয়েছে সেটি; আজই সকালে। শিষ্য বললে, দ্বিতীয় পংক্তির অর্থগ্রহণ হয়েছে, কিন্তু প্রথমার্ধের অর্থগ্রহণ হয়নি—'আশাচলেন্দু সম্পূর্ণ শকে' শব্দসমষ্টির অর্থ কি?

কথা হচ্ছিল সদ্য সমাপ্ত মন্দিরের নাটমণ্ডপে। আগামীকাল মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠা দিবস। পুণ্যাহ। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্বয়ম্ভরা কালী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সে মূর্তি কেউ দেখেনি। রক্তচীনাংশুকে আবৃতা তিনি। গর্ভগৃহের শুল বসানো ভারী কাঁটাল কাঠের দ্বার অর্গলবদ্ধ। আজ কৃষ্ণ চতুর্দশী, আগামীকাল কার্তিকের অমাবস্যায় মহাকালীর আরাধনা—সেই পুণ্যমুহূর্তে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবেন মহাতান্ত্রিক পুণ্ডরীক শাস্ত্রী। দীর্ঘদিন নৌকাযাত্রা সমাপ্ত করে তিনি সম্প্রতি এসে পৌঁছেছেন কাশীধাম থেকে। বাঁশবেড়িয়া রাজার নিমন্ত্রণে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে। না, রাজা নয়, রাজা-মহাশয়। রাজা তো কতই আছে, মহারাজাও এ ভারতভূখণ্ডে একাধিক; কিন্তু রাজা-মহাশয় আছেন মাত্র একজনই। সারা ভারতবর্ষে। বংশবাটির শূদ্রমণি রাজারা আজ চার পুরুষ ধরে—'রাজা-মহাশয়'। স্বয়ং ভারতসম্রাট বাদশাহ্ আলমগীরের দেওয়া খেতাব। ঐ 'রাজা-মহাশয়' খেতাব সারা ভারতে আর কেউ পাননি—প্রথম পেয়েছিলেন বংশবাটির রাজা রাঘবচন্দ্র রায়ের পুত্র রামেশ্বর রায়। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ—বংশানুক্রমে সেই খেতাব ওঁরা চার পুরুষ ধরে ভোগ করে আসছেন—রামেশ্বর, রঘুদেব, গোবিন্দদেব এবং বর্তমান রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব।

নাটমণ্ডপের অপর প্রান্তে ষোড়শ-কোণ বিশিষ্ট একটি শোভাস্তম্ভের নিচে বসেছিলেন একজন তরুণ পণ্ডিত। ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়স তাঁর। সুগঠিত শরীর, উজ্জল শ্যাম গাত্রবর্ণ। প্রথম বৈশাখের নবোদ্ভিন্ন আম্রপত্রের ন্যায় একটা চিক্কণ আভা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত—তাতে দীর্ঘ সামবেদী উপবীত। ভ্রূমধ্যে শ্বেত-চন্দনের একটি টিপ। ওখানে বসে একমনে উপবীত গণনা করছিলেন। আগামী-

কালের পুণ্যাহে এক হাজার আটটি উপবীত লাগবে—ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দেওয়ার প্রয়োজনে। তাই গ্রাম-গ্রামান্তরের ব্রাহ্মণবাড়ি থেকে সংগৃহীত হয়েছে তকলি অথবা চরকায় কাটা সুতোয় যজ্ঞোপবীত। তিনি গুনে গুনে সেগুলি একটি কাঠের পরাতে সাজিয়ে রাখছিলেন। তাঁকেই সম্বোধন করে বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, তুমি ঐ শ্লোকের অর্থ বলতে পার শঙ্করদেব?

নিজ নাম কর্ণগোচর হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। সেটাই শিষ্টাচার। শঙ্করদেব কাব্যতীর্থ পুরোহিতের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র। সম্প্রতি উপাধি পেয়েছেন। পুত্রের পাণ্ডিত্যে পিতা গর্বিত। পিতৃদেবের মুখের উপর আয়ত দুটি চক্ষু মেলে তরুণ পণ্ডিত শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী? বল দেখি বুঝিয়ে?

—'আশা' অর্থে দিক, অর্থাৎ দশ। 'অচল' অর্থে সাত এবং 'ইন্দু' তো চন্দ্র, এক। সবটা একত্রে—দশ-সাত-এক। 'অঙ্কস্য বামাগতি' সূত্রে সংখ্যাটা দাঁড়ালো সতেরশ' দশ, অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গাব্দ।

স্মিত তৃপ্তির হাস্য ফুটে উঠল বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত মুখে। শিষ্যের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক কথা। বর্তমান বঙ্গাব্দ—সতেরশ' দশ। যাবনিক বিচারে তাহলে হচ্ছে সতেরশ' অষ্টআশি খ্রীষ্টাব্দ। ঐ প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকে রাজা-মহাশয় ভবিষ্যৎকালকে জানিয়ে দিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কালটুকু।

কার্তিকের মাঝামাঝি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গঙ্গার পরপারে পশ্চিমাকাশে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য মেঘের আড়ালে অন্তর্ধান করেছেন। তাই মনে হচ্ছে গোধূলিক্ষণ, বাস্তবে এখনও সূর্যাস্ত হয়নি। মন্দিরের চত্বর গঙ্গাবক্ষ থেকে অনেকটা উঁচুতে—নাটমণ্ডপে বসে গঙ্গার স্রোত দেখা যায় না; তবে খাড়া বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ক্রমসঞ্চরমান মহাজনী নৌকার মাস্তল ও পাল দেখা যায়। দিবা-রাত্র নৌকা যাতায়াত করছে গঙ্গা দিয়ে। হাজার হাজার মণ পণ্য যায় এক-একটা মহাজনী নৌকায়। গঙ্গাই 'এ গঙ্গাহৃদি'-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। উত্তরে ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, খাগড়াঘাট, মুর্শিদাবাদ হয়ে পাটনা, কাশী। দক্ষিণে নতুন-গড়ে-ওঠা বন্দর কলকাতা। বাণিজ্যের সদর সড়কের ধারে গড়ে উঠেছে এই বংশবাটি।

নবনির্মিত মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। আগামীকাল সেখানে এসে সমবেত হবে মানুষ, মানুষ আর মানুষ। দূর-দূরান্তর থেকে। শুধু পুণ্যসঞ্চয় করতেই নয়, রাত্রে আতস-বাজির রোশনাই দেখতে। আসবেন গ্রাম-গ্রামান্তরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা—নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, ভেষড়া থেকে।

অনেকে ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজবাটিতে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আসবে ফরাসী চন্দননগর, কলকাতা, হুগলী থেকে সাহেবসুবো। আর আসবে সাধারণ মানুষ—কাতার দিয়ে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বাঁশের খুঁটির উপর প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটাচ্ছে ঘোলসরা তালুকের প্রজার দল। বেগার খাটছে। তাতে দুঃখ নেই তাদের। কেন থাকবে? প্রথমত মায়ের কাজ, দ্বিতীয়ত রাজা-মহাশয় স্বয়ং ওঁদের জগজ্জননীর খাসবন্দী সেবায়েৎ করে যাবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। পাকা দলিলে। হুগলী কালেক্টারিতে দরখাস্ত করে আঠারো নম্বর তৌজির গোটা ঘোলসরা তালুকটা মায়ের নামে নিব্যূঢ় স্বত্বে লিখে দিয়েছেন। ঘোলসরা তালুকের মানুষ আর রাজা-মহাশয়ের প্রজা নয়, মায়ের প্রজা। ঐ তালুকের উপার্জন থেকেই স্বয়ম্ভরা মায়ের সেবা চলতে থাকবে যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী। ঘোলসরার মোড়ল জগাই সর্দার তাই মাথায় জড়িয়েছে হাট-থেকে-কেনা নতুন গামছা। তদারকি করছে, ওরে ও সুমুন্দির পো! তোর বাঁ-হাতি কানাৎটুকু উঠাই লও হে। ত্যাড়চা হই গেল যে গুয়োটার ব্যাটা।

নায়েব রতিকান্ত গড়াঞ দাঁড়িয়ে ছিলেন অদূরে। সেখান থেকেই প্রতিবাদ করেন, গাল দিচ্ছিস কেন জগাই, অ্যা? ত্যাড়চা হয়ে গেছে তো সোজা করে তোল্। মায়ের ঠাঁঞে কাজ করতে এসেছে. গালমন্দ করিস না বছরকার দিন।

স্বয়ম্ভরা মন্দিরের সংলগ্ন অনন্তবাসুদেব মন্দিরের চাতালে বসে জপ করছিলেন নসীরাম সাণ্ডেল, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। রোজ সন্ধ্যাবেলায় তিনি এসে বসেন মন্দির-চাতালে। এখানেই সন্ধ্যাহ্নিক সেরে লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে ভদ্রাসনে ফিরে যান। জপ শেষ হয়েছিল তাঁর। মালাটি কপালে ঠেকিয়ে তিনি সায় দিলেন, অ্যা-অ্যাই। এই কথাটি তোরা ভুলিস না বাবাসকল। ঐ রতিকান্ত যে কথা বললে। এখন থেকে তোরা যে মায়ের খাস প্রজা। তোরা তো তরে গেলি রে! কত ভাগ্য করেছিলি! এ শুধু তোদের বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যফল! তবে আবার মুখ-খারাপ করিস কেন, অ্যাঁ? জিহ্বা সংযত করতে শেখ্—তোরা হলি মায়ের খাস প্রজা! রাধা-মাধব! রাধা-মাধব—

স্ফটিকের মালাটি আবার কপালে স্পর্শ করলেন।

জগাই মোড়ল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বটেই তো! এখন থেকে সে যে মায়ের খাস তালুকের মোড়ল। রসনাকে সংযত করতে হবে। নাঃ, আর মুখ খারাপ করবে না কোনদিন।

রতিকান্ত বৃদ্ধ নসীরামের দিকে ঘনিয়ে আসেন। তাঁর জপ শেষ হয়েছে দেখে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসে পড়েন মন্দিরচাতালে। বলেন, পেন্নাম হই বামুনঠাকুর। আপনার জপ সারা হল ?

নসীরাম সে-কথার জবাব না দিয়ে পূর্ব-প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে থাকেন, আর ওদেরই বা দোষ দেবে কেমন করে গড়াঞ ? পেটে দিনরাত আগুন জ্বলছে— বাক্যিগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই তো ফিরিয়ে আসবে।

—তা যা বলেছেন। বাজারের যে কী হাল হয়েছে।—মুখটা ফিরিয়ে একটু নলচের আড়াল দেওয়া সহবতে এক টিপ নস্য নিলেন রতিকান্ত।

—তাই বল না কেন! আমাদের কালে আমরা কী পেয়েছি, আর এরা কী পেল ? আমার ছেলেবেলায় আমি মুর্শিদাবাদে দেখেছি, এক তঙ্কায় চার মণ চাল! খামারে খামারে উপচে পড়ছে ধানের গোলা। ছোলা-মসুর মুগের বাখার টইটম্বুর। ভাঁড়ারে জালায় জালায় সংবৎসরের মজুত খেজুর-গুড়। তখন মাসে এক তংকা যার উপার্জন সে সপরিবারে দু-বেলা পেট পুরে গোবিন্দভোগ চালের অন্নসেবা করত।

রতিকান্ত বললে, আপনি তো নবাবী আমলের কথা বলছেন ঠাকুরমশায়। আপনার বাল্যকাল মানে তখনও কোম্পানির রাজ্যের পত্তন হয়নি। এই ফিরিঙ্গিরাই দেশটাকে খেলে!

অর্ধফলা সমেত একরাশ কাশফুলের মত সাদা চুলে ভর্তি মাথা দুলিয়ে নসীরাম বললেন, কথাটা তোমার ঠিক হল না গড়াঞয়ের-পো। শুধু ফিরিঙ্গিদের দোষ দিও না। দেশটাকে শ্মশান করে দিয়ে গেল আসলে বর্গীরা। তারা ফেরঙ্গ নয়; হিঁদুর সর্বনাশ হিঁদুতেই করেছে, না, শুধু হিঁদু নয়, মুসলমানরাও! যেমন রাজা জগৎশেঠ, কেষ্টচন্দর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, তেমনি জাফর আলি, সিরাজ-উদ্দৌলা, মীরকাসেম আলি! ফেরঙ্গদের দোষ দিয়ে কি হবে ? ওরা বরং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে। বর্গীদের কব্জা করেছে।

রতিকান্ত কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে, তাহলে কি হয় ? বিধর্মী যে! যবন!

—ও কথা বলো না রতিকান্ত। তফাৎ কী ? ওরা মা যশোদার নাম দিয়েছে মা মেরী। তফাৎ কোথায় ? আমাদের হুগলীর তারাচাঁদ তো সেই জগজ্জননীরই ভক্ত। ধর না কেন, আমাদের লাট বাহাদুর—ন্যায়বিচার তো তিনিই করলেন। নবাব আলিবর্দী যে পাপ করেছিল তার কিছুটা তো স্খালন হল ? রাজা-মহাশয়ের তালুকগুলো তিনিই তো ফেরত দিলেন। আর তোমাদের বর্ধমানের মহারাজ বাহাদুর আর নদীয়ার কেষ্টচন্দর—অম্লানবদনে গ্রাস করলেন বিধবার

সম্পত্তি! এর পরেও তুমি বলবে এরা হিঁদু আর ওরা যবন?

রতিকান্ত শাস্ত্রবাক্যে একটা জুৎসই জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ও পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, পেন্নাম হই না'ব মশাই। আমরা পদ্মফুল নি-এইচি আজ্ঞে। কুথায় থুব বলেন?

এক হাঁটু কাদা, উদাম গা, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা। মাথায় ছোট একটি টুকরি। ওর পিছনে আরও দু-তিনজন মানুষ—তাদের মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাঁকায় ভর্তি পদ্মফুল।

—কোন্ তালুকের প্রজা তোরা?

—আজ্ঞে কালীচক। আমরা আসছি গাঙের ওপার থিকে। অধমের নাম বেন্দাবন। গোমস্তামশাই হুকুম দেছিলেন, কাত্তিকের আঁধার পক্ষ শেষ হবার আগের রাতে, অর্থাৎ কিনা আজ সন্ঝের ভিৎরি ষাট-কুড়ি পৌঁছে দিতি হবে। তা কুথায় থুব বলেন?

রতিকান্ত জবাব দেবার আগেই নবনির্মিত মন্দিরের নাটমণ্ডপ থেকে ত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ হাঁক পাড়েন—তোমরা এই দিকে এস বাবা সকল। ফুলের ডালি এই মন্দিরচাতালে থুয়ে দেও।

লোকগুলি সদ্যসমাপ্ত শ্বয়ম্ভরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে। বৃন্দাবন তার মাথা থেকে ফুলের ডালিটা মন্দিরের চাতালে নামিয়ে রাখে। গামছায় মুখটা মুছে নিয়ে ডালির উপরকার ঢাকনাটা খুলে দেখায়। সদ্য ফোটা একরাশ লাল পদ্মে ডালিটা ভর্তি। ত্রিপুরেশ্বর পুত্রকে আহ্বান করেন, শঙ্করদেব, ফুলের এই ডালিগুলি মন্দিরের ভিতরে পৌঁছে দাও। ওখানে মা-লক্ষ্মীরা আছেন। ওঁদের বল, এ থেকে বেছে বেছে এক হাজার আটটি নিদাগ পুষ্প চয়ন করে পরাতে সাজিয়ে রাখতে।

মুনিষরা আসছে সাত রাজ্য পাড়ি দিয়ে। তাদের পায়ে কাদা ও ময়লা। তাছাড়া তাদের জাতেরই বা ঠিক কি? মন্দির-চত্বরে তারা ওঠে না। মাটিতে দাঁড়িয়েই মন্দিরের আড়াই হাত বুক-সমান উঁচু পোতায় একে একে ঝাঁকাগুলি নামিয়ে রাখে। শঙ্করদেব এগিয়ে আসেন। মুগ্ধ হয়ে যান সদ্যস্ফুট সহস্রাধিক পদ্মের সৌগন্ধ সৌন্দর্যে। এবার ওঁকেই একা হাতে ঐ ফুলের ঝাঁকাগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহ-সংলগ্ন 'অন্তরাল'-এ পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে আছেন রাজবাটির পুরললনার দল। নিশ্চয়ই আছেন। সারাদিন তাঁরা পাল্কীতে করে আসছেন, যাচ্ছেন। শঙ্করদেব লক্ষ্য করেছেন। ওঁরাই ঝাঁকা থেকে বেছে বেছে এক হাজার আটটি নিদাগ অর্ঘ্যপুষ্প-চয়ন করে রাখবেন। ঠিক তিনি যেমন এতক্ষণ

গুছিয়ে রাখছিলেন যজ্ঞোপবীত। কীটদষ্ট বা অন্যভাবে আহত পদ্মফুলে মায়ের অর্ঘ্য দেওয়া যাবে না। বৃন্দাবনের ডালিটা ভারী নয়, শঙ্করদেব প্রথমে সেটিকেই তুলে নেন। ধীরপদে এগিয়ে আসেন অন্তরালের দিকে।

নামটি সুন্দর : অন্তরাল! তার একদিকে মণ্ডপ—যেখানে সমবেত হয় হাজার ভক্ত। সেটা সদর—জনগণেশের কৌতুক কোলাহল, 'মা-মা' ধ্বনি আর নাম-কীর্তনে নিত্য মুখরিত। অপর দিকে 'গর্ভগৃহ'—বীজমন্ত্রের আধার; সেখানে কোলাহল নেই, আলো নেই, আছেন আদ্যশক্তির মূর্ত প্রতীক—রহস্যময় ঘন অন্ধকারে। দুইয়ের মাঝে এই অন্তরাল—আড়াল। যা ঘরেও নয়, বা'রেও নয়। যেখানে কোলাহলও নেই, নৈঃশব্দও নেই—উজ্জ্বল আলোও নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারও নেই। তাই তা যেন আরও রহস্যঘন।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি। মন্দিরের ভিতরটায় তবু দিনান্তের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একটি বড় পিতলের পিলসুজের উপর পঞ্চমুখী ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোকপাতে অন্তরালের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি ঈষদালোকিত। ওখানেই বসে ফুলের মালা গাঁথছেন রাজবাড়ির মেয়েরা। চোখে দেখেননি, তবে তথ্যটা জানা ছিল শঙ্করদেবের। রাজবাটির অন্দরমহলে কখনও যাননি শঙ্করদেব—কাউকে চেনেন না। তাই প্রথমেই আত্মঘোষণার উদ্দেশ্যে একটা গলা-খাঁকারি দিলেন। ফুলের ডালিটি দু'হাতে ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। তার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হঠাৎ। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন।

অন্তরাল প্রকোষ্ঠটি আকারে ছোট। পূজার নানা উপকরণে পূর্ণ। কোষা-কুশি, দীপদান, ধূপপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, জলশঙ্খ পাত্র, নানান আকারের পরাৎ ও তৈজস—কিছু পূজার, কিছু দানের। পা রাখবার ঠাঁই নেই। যা ভেবেছিলেন তা মোটেই নয়—বৃন্দাবনের ডালায় যেমন ভিড় করে আছে পদ্মফুল, অন্তরাল-গৃহটি সেভাবে রাজবাটির পুরললনায় আদৌ উপচীয়মান নয়। নির্জন ঘরে বসে আছে একটি মাত্র কিশোরী—হ্যাঁ, প্রথম দর্শনে কিশোরীই মনে হয়েছিল তাকে। একেবারে একা। তার কোলের উপর প্রকাণ্ড একটি গোড়ে মালা। পাশেই পুষ্প-পাত্রে স্তূপীকৃত ফুল। মেয়েটি একমনে মালা গাঁথছিল একা—বোধ করি সে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাষাণ-প্রাচীরে ঠেস দিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটি, চোখ দুটি নিমীলিত। শঙ্করদেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঘৃতপ্রদীপে-উজ্জ্বল ঐ অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরীর দিকে।

ইতিপূর্বে ওকে কখনও দেখেননি। কিন্তু চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। রূপবর্ণনা শোনা ছিল। বংশবাটি রাজবাড়ির এই কনিষ্ঠা রাজমহিষীর সৌন্দর্য-

খ্যাতি রাজপুরীর বাইরেও প্রচারলাভ করেছিল। তাছাড়া ওর মাথায় রানীমার মুকুটটাও তার পরিচয় ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট। রাজা মহাশয় নৃসিংহদেবের দ্বিতীয়া মহিষী—রাণী শঙ্করী দেবী।

কাব্যতীর্থের মনে পড়ে গেল উত্তরমেঘের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি যার শেষ কথা —'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।' তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংশোধন করলেন নিজেকে—না! ও যক্ষপ্রিয়া নয়, ও কুমারসম্ভবের নায়িকা। রাজা-মহাশয়ের 'ছায়েবানুগতা' এ হচ্ছে তপস্যারতা উমা, অপর্ণা। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। অনুষ্টুপ ছন্দে একটি শ্লোক ওঁর মনে অনুরণিত হতে থাকে। কাব্যতীর্থ কবিতা লেখেন—অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটি অজাত শ্লোক ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করতে চায়: কে কাকে আলোকিত করছে? ঐ নিবাত নিষ্কম্প ঘৃতপ্রদীপ শিখাটি কি ঐ দিবাস্বপ্নলীনা মেয়েটির রূপে মুগ্ধ, বজ্রাহত?

হঠাৎ মেয়েটি সচকিত হয়ে ওঠে। গায়ে মাথায় কাপড় টেনে দেয়। উঠে দাঁড়ায়।

শঙ্করদেব সংবিৎ ফিরে পান। ইতস্তত করে বলেন, ইয়ে—আর সবাই কোথায় গেল?

মেয়েটি প্রত্যুত্তর করে না। মাথার ঘোমটা আরও একটু টেনে দেয়।

শঙ্করদেব পুনরায় বলেন, আমার কাছে সঙ্কোচ করার কিছু নেই রানীমা। আমার নাম—থাক, নামে কী এসে যায়? অনন্তবাসুদেব মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন আমার পিতৃদেব। শুনুন—

মেয়েটি মাথার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয়। প্রদীপের আলোয় আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অন্তরালবর্তিনীর অনিন্দ্য আনন। বলে, আপনিই ন্যায়তীর্থ মশাইয়ের পুত্র? কাব্যতীর্থ?

শঙ্করদেব হাসেন। গ্রীবাসঞ্চালনে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করেন। রানীমা তাহলে তাঁর পরিচয় জানেন। রানী শঙ্করী এগিয়ে আসে। শঙ্করদেব যেন এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দূরত্বটা কমে যাওয়ায় একটু সচকিত হয়ে ওঠেন। যে গন্ধটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পথে ওঁকে হঠাৎ সচকিত করে তুলল তা কি পদ্মফুলের, না পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌগন্ধ্য? হঠাৎ রানীমা ওঁর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে যায়। শিউরে উঠলেন শঙ্করদেব। কী বিড়ম্বনা! এ যে দেবমন্দির! হাতে ধরা ছিল পদ্মফুলের ডালি। কাত হয়ে গেল সেটা। ঝর ঝর করে একরাশ পদ্মফুল ঝরে পড়ল আনত রানী-মায়ের মুকুট-লাঞ্ছিত খোঁপায়। ডালিটা ফেলে দিলেন। দু'হাত তুলে প্রতিবাদ

করেন শঙ্করদেব—না, না, প্রণাম করো না!

মেয়েটি শোনে না। কজ্জল-লাঞ্ছিত দুটি আয়ত নয়ন ওঁর মুখে তুলে নিঃসঙ্কোচে বলে, কেন? আপনি ব্রাহ্মণ! আমাদের কুল-পুরোহিতের—

কথাটা তার শেষ হয় না। মাথাটা নেমে আসে শঙ্করদেবের যুগ্মচরণে।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন তরুণ পণ্ডিত। মুহূর্তের বিহ্বলতা। প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সংস্কারবশে বাধা দেন। গাত্রস্পর্শ করেন মেয়েটির। দু হাতে ওর দুই কাঁধ ধরে ফেলে বলেন, না, ছি, এ যে মায়ের মন্দির। এখানে একজনই প্রণম্য! এখানে আমি প্রণাম নিতে পারি না রানীমা!

মেয়েটিও অবশ হয়ে যায়। থমকে থেমে পড়ে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে শঙ্করদেবের। হাত দুটি সরিয়ে নেন।

উদ্যত প্রণাম অসমাপ্ত রেখে রানীমা উঠে দাঁড়ায়। একথা বলে না যে, এ মন্দিরে মায়ের এখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। মৃন্ময়ী এখনও চিন্ময়ী হননি। কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য দুজনেই স্তম্ভিত। কথা নেই কারও মুখে।

ঠিক তখনই দ্বারের কাছে আবির্ভূত হল একটি অতি প্রবীণা মহিলার মূর্তি। রাজা নৃসিংহদেবের ধাত্রীজননী—সবাই ডাকে 'আয়ী-মা'। সে বোধ করি কিছু আগে এসে দাঁড়িয়েছিল ওখানে। এরা দুজন খেয়াল করেনি। আয়ী-মা বলে ওঠে, ও মা গ! তা—হ্যাঁ বামুন-ঠাকুর! মায়ের-নামে-আনা পদ্মফুলগুলান শেষ-বেশ রানীমায়ের চরণেই অঞ্জলি দিলে?

একটা আর্তনাদ আটকে গেল শঙ্করদেবের কণ্ঠে—না, না, না।

এ কী বিড়ম্বনা! পলায়নের একমাত্র পথটি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ বর্ষীয়সী মহিলা। না হলে ছুটে বেরিয়ে যেতেন শঙ্করদেব। আয়ী-মা বলে, 'না' কি গো! আমি যে পষ্ট দেখনু! তা তোমারেই বা কেমন করে দুষব বামুন-ঠাকুর? ও আবাগীকে দেখলে মুনিরও মতিভ্রম হয়—

আর সহ্য হল না। এবার ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন কাব্যতীর্থ। শঙ্করী আয়ী-মায়ের দিকে ফিরে বললে, ছি ছি ছি! এ তুমি কী বললে আয়ী-মা? তোমার মুখের কি কোনও আড় নেই?

নিদন্ত হাসি হাসল বৃদ্ধা। বললে, আমি আবার কী বলনু? যা চখ্যে দেখনু তাই বলনু। নে, ফুলগুলো টুকিয়ে তোল্ দিকিন।

পদ্মফুলগুলি সে সাজিয়ে তুলতে থাকে ডালায়। গজগজ করতে থাকে আপন মনে, এ ফুলে তো আর অর্ঘ্য হবে নে! এগুলান নে যেতে হবে রাজবাড়িতে। ভালই হল—এ দিয়েই আজ ফুলশেষ হবে নে।

শঙ্করী অবাক হয়ে যায় : ফুলশেষ! মানে? কার?

—তোর লো তোর! কিছুই জানিস না, না? তবে অত সাজের ঘটা কেন আজ, অ্যাঁ? ন্যাকা!

শঙ্করী মরমে মরে যায়।

সে জানত আয়ী-মায়ের ষড়যন্ত্রের কথা! জানত—হ্যাঁ, আজ তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন—তিন বৎসর বিবাহিত জীবনান্তে আজ তার ফুলশয্যা।

দুই

তাহলে একটু আগে থেকে বলতে হয়।

আজকের দিনে পাঠিকার কাছে সংবাদটা শুধু বিস্ময়কর নয়, ধাঁধার পর্যায়ে। রানী শঙ্করী ষোড়শী। তের বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল তার। তিন বছর স্বামীর ঘর করছে, এবং স্বামীও ওকে প্রোষিতভর্তৃকা করে বিদেশ-যাত্রা করেননি। তাহলে এতদিন পরে আজ আবার নতুন করে ফুলশয্যা কিসের?

হ্যাঁ, ফুলশয্যা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অবাক-রাত্রি যথানিয়মে এসেছিল ত্রয়োদশবর্ষীয়া শঙ্করীর জীবনে। খাস গেলাসের আলোয়, আতস-বাজির রোশনাইয়ে, সানাইয়ের মূর্ছনায় আর ফুলে-ফুলে-ফুলে ভরা নারীজীবনের সে সার্থকতার অবাক-রাত্রি এসেছিল ওর জীবনেও। তখন বোঝেনি, আজ বুঝতে পারে—সেটা ছিল শুধুমাত্র প্রহসন। তার সবটাই ফাঁকা, সবটাই ফাঁকি। বড় রানীমার একটা খেয়াল—একটা পুতুল খেলা! বঞ্চনার বেদনাটা সেদিন তিলমাত্র অনুভব করেনি শঙ্করী। আজ সেটা বুঝতে পারে। আজ সে পূর্ণ-যৌবনা, ষোড়শী। এ তিন বছর ও সীমন্তে দিয়েছে চীনা সিঁদুর, হাতে পরেছে কালীঘাটের শাঁখা, কামাক্ষ্যামায়ের নোয়া, কিন্তু সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা সীমন্তিনী আজও পায়নি স্বামীর উপর নিঃসপত্ন অধিকার! না, একটিমাত্র রাত্রের জন্যও নয়। ওর যখন বিবাহ হয় তখন রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেবের বয়স পঁয়তাল্লিশ। অর্থাৎ বয়সে তিনি ওর চেয়ে তিন গুণের উপর বড়। তা হোক, তবু তিনি তখনও পূর্ণ যুবাপুরুষ। একটি চুলে পাক ধরেনি, জরা ফেলতে পারেনি তাঁর দার্ঢ্যে ভরা মুখে আসন্ন বার্ধক্যের একটি আঁচড়। কিন্তু হলে কি হয়, বড় রানী

মহামায়ার বয়সও তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, এবং সেই বয়সেও তাঁর যৌবনে ভাঁটার টান পড়েনি। শুভদৃষ্টির সময়ে শঙ্করী লজ্জায় সঙ্কোচে তার স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সে জানত, পরামানিকের অভিশাপ অগ্রাহ্য করে এক রাশ মেয়ে শুভদৃষ্টির কাণাৎ উঁচু করে লক্ষ্য করছিল তাকে। দেখছিল, অপরূপা নববধূর লজ্জাবনতা মুখটি। পারেনি চোখ তুলে তাকাতে ফুলশয্যার রাত্রেও। ঘরে যদি তৃতীয় ব্যক্তি না থাকত তাহলে হয়তো সে সঙ্কোচ জয় করে সে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখত—সে চেষ্টা করেছিলও একবার। বেচারী ধরা পড়ে যায়। রাজার প্রথমা পত্নী মহামায়া কৌতুকে বিদ্রূপে ওকে এমনভাবে বিদ্ধ করেছিল যে, দ্বিতীয়বার সে আর চেষ্টা করতে ভরসা পায়নি।

তাই বলে শঙ্করী ঈর্ষা করে না তার বড়দিকে। না, বড়দি তার বড় দিদির মতই। একটু কৌতুকপ্রবণা, কলহাসিনী এবং শঙ্করীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। তা হোক, ছোট বোনকে সে ভালও বাসে। পিতৃকুলে কেউ নেই শঙ্করীর—মাকে হারিয়েছে শৈশবে; দিদি নেই, মাসী নেই, বৌঠান নেই, বস্তুত বাপের বাড়ির অস্তিত্বই নেই। বড়দি মহামায়ার মধ্যে তাই সে শুধু জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নয়, খুঁজে পেয়েছিল শৈশবে হারানো তার অদেখা মাকে। হাজার হোক বড়দিই তো তাকে রাজরানী করেছে। পিতৃমাতৃহীন অনাথাকে করেছে বংশবাটি রাজবাড়ির ছোট মা।

হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা—আজকালকার ছেলেমেয়েরা—বাস্তবে ঘটনাটা ঐ রকমই ঘটেছিল। নৃসিংহদেবের দ্বিতীয়া মহিষীর পাত্রী নির্বাচন করেছিলেন মহামায়া স্বয়ং। শুধু তাই নয়—ঐ অনাথা মেয়েটিকে সম্প্রদানও করেছিলেন তিনি, আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃতা হয়ে। বলতে পার রাজরানীর খেয়াল, বলতে পার বড়লোকের বউয়ের অহৈতুকী জিদ। তা হোক, এমনটা কেউ কখনও শুনেছে? রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে সপত্নীত্বে স্বেচ্ছায় বরণ করা? স্বয়ং সম্প্রদান করা?

রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব মহামায়াকে বিবাহ করেন সতের বছর বয়সে; মহামায়ার বয়স তখন আট। গৌরীদান করেছিলেন মহামায়ার পিতৃদেব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সময়টা একটা চিহ্নিত খণ্ডকাল—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। গঙ্গার এপারে বংশবাটি যখন আতস বাজির আলোয় উদ্ভাসিত, ঠিক তখনই গঙ্গার ওপারে পলাশীর প্রান্তরে অস্ত যেতে বসেছিল এতদিনের নবাবী শাসনসূর্য।

তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সাতাশ বছর। মীরজাফরের সুলতানী শেষ হল। মীরকাশেমের স্বপ্ন নিঃশেষিত হল উদয়নালায়। বিদায় হলেন ক্লাইভ। এলেন

ভ্যান্সিটার্ট। অস্তমিত হলেন কৃষ্ণনগরের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তারপর এল মন্বন্তর। এক কোটি মানুষ প্রাণ হারাল। এলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। কলকাতায় স্থাপিত হল সুপ্রীম কোর্ট। মহারাজ নন্দকুমার ঝুললেন ফাঁসিকাঠ থেকে।

সতেরশ' সাতান্ন থেকে সতেরশ' চুরাশী!

দীর্ঘ সাতাশ বছর বিবাহিত জীবনান্তে বংশবাটি রাজমহিষীর জীবনে এল সমস্যা। দুরারোগ্য রোগের আক্রমণে শয্যাশায়ী হলেন তিনি। রাজবৈদ্য কিছুদিনের মধ্যেই স্বীকার করলেন এ রোগ চিকিৎসার অতীত। মহামায়ার জীবনের মেয়াদ আর বড়জোর দু-এক বছর। রাজা-মহাশয় অত সহজে হার মানবেন না—স্থির করলেন, হুগলী অথবা খাস কলকাতা থেকে নিয়ে আসবেন সাহেব ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না মহামায়া। বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তুমি কাশীধামে লোক পাঠাও, মাকে নিয়ে এস।

'মা' অর্থে নৃসিংহদেবের গর্ভধারিণী রানী হংসেশ্বরী। দীর্ঘদিন তিনি কাশীবাসী। সংসার ত্যাগ করে গিয়েছেন চিরকালের জন্য। নৃসিংহদেব রোগাক্রান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কেন বড় বউ? মা এসে কি করবেন?

—তোমাকে সংসারী করে আবার ফিরে যাবেন কাশীতে।

—সংসারী করে? তুমি তো জান বড় বউ—তা হবার নয়। এ নিয়েই আমার সঙ্গে মায়ের মতবিরোধ হয়েছিল।

তা ভালমতই জানা ছিল মহামায়ার। তাঁর বিবাহ হয়েছিল নিষ্ফলা। দীর্ঘ সাতাশ বৎসরেও তাঁর গর্ভে আসেনি বংশবাটির অধস্তন পুরুষ। কত বার, ব্রত, মানত করেছেন, কত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন—তবু অভাগিনীর বুক জুড়াতে কোনও সোনার চাঁদ এল না। মা চেয়েছিলেন পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিতে—সে আমলে বহুবিবাহ না করাটাই ছিল ব্যতিক্রম—বিশেষ রাজারাজড়ার পরিবারে। কিন্তু কিছুতেই সম্মত হননি নৃসিংহদেব। কী হবে বংশরক্ষার কথা ভেবে? রাজ্যই থাকল না, তার রাজপুত্র! এ নিয়েই মতান্তর—মায়ে ছেলেয়। মতান্তর থেকে মনান্তর। মা কাশীবাসী হয়েছিলেন। এসব তথ্য অজানা ছিল না মহামায়ার।

কিন্তু এবার জিদ ধরলেন তিনি। মহামায়াকে অদেয় ছিল না কিছুই। তবু এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না নৃসিংহদেব। আর মজা হচ্ছে এই, বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে লাগল ততই যেন জিদ বাড়তে থাকল

মহামায়ার। মহানুভবতার প্রতিযোগিতায় তিনি এক ইতিহাস রচনা করতে বদ্ধপরিকর। এ সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্বে স্বয়ং তাঁর উত্তরাধিকারিণীকে দিয়ে যাবেন সংসার ও স্বামীর উপর নিঃসপত্ন অধিকার। চিরকাল যা হয়ে এসেছে তাই হল। রানীমায়ের জিদই বজায় থাকল। পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজা-মহাশয় রাজী হলেন নূতন করে টোপর পরতে। মহামায়ার শেষ ইচ্ছায় বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু পাত্রী কোথায়?

মহামায়া বললেন, পাত্রী আমি দেখে রেখেছি।

নৃসিংহদেব উদাসীন কণ্ঠে বলেন, ও। পাত্রী নির্বাচনও তাহলে করে রেখেছ ইতিমধ্যে! বেশ, বল তার নাম-ঠিকানা। পালকী পাঠাই।

—পালকী পাঠাতে হবে না। সে এখানেই আছে।

—এখানেই? বংশবাটিতেই?

—না। 'এখানেই' মানে এই রাজবাড়িতেই।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজা-মহাশয়—কী বলছ তুমি। এই রাজবাড়িতেই মানে? তাকে আমি দেখেছি? চিনি?

—দেখেছ। চেন। তাকে তুমিই উদ্ধার করেছিলে। আমি শঙ্করীর কথা বলছি।

বিস্ময়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নৃসিংহদেব। বলেন, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে বড় বৌ? শঙ্করী। সেই দশমবর্ষীয়া বালিকা!

—না, দশ নয়, আমি জানি—তার বয়স তের। রাজরানী হবার মত রূপ যে তার আছে তা তুমি পুরুষমানুষ, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ।

—কী বলছ তুমি? সে যে আমার কন্যার বয়সী।

—তা হোক। আমি চিতেয় উঠতে আরো হয়তো দু-তিন বছর লাগবে। তদ্দিনে সে দিব্যি ডাগর হয়ে উঠবে।

নৃসিংহদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, অসম্ভব। এতে আমি স্বীকৃত নই।

কিন্তু সে দৃঢ়তা রাজমহিষীর চক্রান্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল অচিরে। রোগশয্যা থেকেই যাবতীয় আয়োজন করলেন মহামায়া। কারও পরামর্শ শুনলেন না, কারও আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। রাজরানীর খেয়াল! কে বাধা দেবে? স্বয়ং রাজা-মহাশয়ও মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারলেন না। পুতুল খেলা বই তো নয়।

হ্যাঁ, মেয়েটিকে তিনিই উদ্ধার করে এনেছিলেন বটে। তখন সে ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র। বিচিত্র পরিবেশে। বিচিত্র ঘটনাচক্রে। সেটা আজও

স্পষ্ট মনে আছে ওঁর।

শহর কলকাতা থেকে ফিরছিলেন নৌকোয়। একাই। না, একা নয়, মাঝি-মাল্লা ছাড়া সঙ্গে ছিল ভৈরব সর্দার। ওঁর দেহরক্ষী লাঠিয়াল। দিনটা সার্থক। সেই দিনই লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ওঁকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—নয়টি বাজেয়াপ্ত পরগণা বংশবাটিরাজকে প্রত্যর্পণ করা হবে। লাট বাহাদুরের প্রাসাদ থেকে সফলকাম রাজা-মহাশয় অতঃপর গিয়েছিলেন চিৎপুরে, নবনির্মিত গোবিন্দরামের নবরত্ন মন্দিরে পূজা দিতে। কালীঘাটেই যেতেন, কিন্তু অতদূর যাবার সময় ছিল না। পূজা দিয়ে চাঁদপাল ঘাটে নৌকোয় চাপতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। বৈশাখ মাস। কৃষ্ণপক্ষ। ঐ সময়েই উঠল কালবৈশাখী ঝড়। বাধ্য হয়ে আরও দেরি হল নৌকো ছাড়তে। ঝড়বৃষ্টি ততক্ষণে থেমেছে। তবু আকাশ আছে কালো করে—গঙ্গা এবং আকাশ একাকার হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। নৌকো চলেছে উত্তরমুখো—পালের নৌকো। দাঁড়িরা দাঁড় বাইছে না, শুধু আবদুল মাঝি হালটা ধরে বসে আছে গলুইয়ের মাথায়। রাজা-মহাশয় দাঁড়িয়ে ছিলেন বজরার ছাদে। শাক্ত তিনি, মা-কালীর ভক্ত—এমন বিদ্যুচ্চকিত অমারাত্রে ভীষণা প্রকৃতি যে সেই আদ্যাশক্তিরই রূপ পরিগ্রহ করতে চায়। দু'চোখ ভরে তাই দেখছিলেন উনি। হঠাৎ একটা কোলাহলে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমকে রাজা-মহাশয় দেখতে পেলেন ওলাইচণ্ডী শ্মশানঘাটের খাড়া বালিয়াড়ির পাড় দিয়ে একজন মানুষ রুদ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—সে সবলে বুকের উপর সাপটে ধরেছে কোন কিছু। হয় কোন প্যাঁটরা অথবা কোন মানবশিশু। আর তার বিশ-পঁচিশ হাত দূরে তার পশ্চাদ্ধাবন করছে পাঁচ-সাতজন দস্যু। বিদ্যুৎ-ঝলকে রাজা-মহাশয় স্পষ্ট দেখলেন, তাদের হাতে নগ্ন কৃপাণ। অগ্রগামী লোকটা চিৎকার করতে করতে ছুটেছে—বাঁচাও! বাঁচাও!

নির্জন নদীতীর। শুধু ওলাইচণ্ডী শ্মশানঘাটে একটা ধূমায়িত চিতার কাছাকাছি বসেছিল কয়েকজন শববাহী। তারা উঠে দাঁড়াল—কিন্তু সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। একটা 'হায় হায়' রব উঠল শুধু। বর্গীর হাঙ্গামা সদ্য-অতীত। এ দৃশ্য দেখতে তখনও ওরা অভ্যস্ত। সশস্ত্র দস্যুদলকে রুখবার জন্য তারা যে এগিয়ে আসবে না এটা নিশ্চিত। রাজা-মহাশয় নিজের অজান্তেই হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে উঠলেন—অ্যাই! খবরদার!

বজরা তখন ঘাট থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত নদীর ভিতরে। তবু নৃসিংহ-

দেবের ধমনীতে বইছে রাজরক্ত। তাঁর পৌরুষ-ব্যঞ্জক সাবধান-বাণীটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে খাড়া গঙ্গার পাড়ে প্রতিহত হয়ে। দস্যুদল মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। একবার চোখ তুলে দেখল বজরাটার দিকে। পরমুহূর্তেই সেটাকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হল ঐ হতভাগ্যের দিকে। প্রত্যুত্তরে ডাকাতরাও চিৎকার করে উঠল—হর-হর! ব্যোম ব্যোম!

বর্গী! এখনও নিঃশেষ হয়নি তাহলে! আজও আছে ওরা দলছুট হয়ে! ইংরাজ শাসনের গলিঘুঁজিতে দস্যুবৃত্তি করে চলেছে আজও!

সামনের লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নৃসিংহদেবের চিৎকার শুনে। তার পরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ চমক দিল। নৃসিংহদেব স্পষ্ট দেখলেন—ঐ লোকটা তার বুকের তলায় চাদরে জড়ানো সম্পদটা নিয়ে সেই খাড়া পাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভরা গঙ্গায়। পরমুহূর্তে চার-পাঁচজন দস্যু মুক্ত কৃপাণ দাঁতে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। ঝপ ঝপ-ঝপ।

নৃসিংহদেব চিৎকার করে ডাকলেন, ভৈরব!

আহ্বানের প্রয়োজন ছিল না। দেহরক্ষী ভৈরব ঘোষ ইতিমধ্যে দ্রুত-পরিবর্তিত ঘটনাচক্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সে বন্দুক হাতে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভুর পাঁজর ঘেঁষে। রাজা-মহাশয় বলেন, বন্দুকটা আমার হাতে দে।

ঘোষের-পো আপত্তি করে না। বিখ্যাত লাঠিয়াল ভৈরব ঘোষ তার তেল-পাকা চার হাত লম্বা লাঠিখানা হাতে পেলে একসঙ্গে বিশ-ত্রিশজন লেঠেলের মহড়া নিতে পারে; কিন্তু সে জানে, ঐ যাবনিক অস্ত্রটা তার প্রভুর ডাকেই ঠিকমত সাড়া দেয়। ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে প্রতীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে মাঝি-মাল্লারা চার-পাঁচটা মশাল জ্বেলে ফেলেছে। তারই আলোয় নৃসিংহদেব দেখতে পেলেন নৌকো থেকে বিশ হাত দূরে ভাসছে সেই হতভাগ্য মানুষটির মাথা। দক্ষ সাঁতারু সে—কারণ দু'হাতে সে তখনও ধরে রেখেছে তার সম্পদ। কোনক্রমে ভেসে আছে। নৌকোর দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। অপরপক্ষে চার-পাঁচজন দস্যু দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুক ছুঁড়লেন রাজা-মহাশয়—দ্রুম্! দ্রুম্!

পরমুহূর্তেই নদীর পাড় থেকে ভেসে এল সংকেত: আ—বা-বা-বা!

দস্যু-দলপতি জলে নামেনি। বোধ করি ওদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তাই এক্ষেত্রে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দস্যু-সর্দারের আহ্বান শুনে বাকি তিনটি পশ্চাদ্ধাবনকারী সাঁতারু মুখ ঘোরাল। দুজন তলিয়ে গেছে

অব্যর্থ-সন্ধানী নৃসিংহদেবের দু-দুটি বুলেটের বিনিময়ে।

এদিকে ভৈরবও আর অপেক্ষা করেনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে।

লোকটা অত্যন্ত সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়েছিল। শঙ্করীর সেটুকুই পিতৃ-পরিচয়। লোকটার নাম নিত্যানন্দ দাস। সম্পন্ন জোতদার। মূর্ছাহত কন্যাকে রাজা-মহাশয়ের পায়ের নিচে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আপনারে আমি চিনি। বাঁশবেড়ের রাজা-মশাই! রইল আমার মেয়ে। একদিন এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

প্রস্থানোদ্যত লোকটার হাত চেপে ধরেছিলেন নৃসিংহদেব, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—আমার গোলায় ওরা আগুন দেছে। আমার ভিটে এখনও পুড়ছে।

নৃসিংহদেবের হাত ছাড়িয়ে লোকটা তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল গঙ্গায়।

আর কোনদিন ফিরে আসেনি সে!

ছয় বছরের একফোঁটা মেয়েটাকে নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এসেছিলেন রাজা-মহাশয়। অপুত্রক মহামায়া তাকে মানুষ করেছেন, মেয়ের মতই। সেই ছ বছরের বালিকা আজ ত্রয়োদশী। সেই নাকি বংশবাটির কনিষ্ঠা রাজমহিষী হতে চলেছে।

তাই হয়েছিল। কাশীবাসী রাজমাতা অবশ্য আসেননি। তা হোক, তবু অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হতে দেয়নি মৃত্যুপথযাত্রিনী মহামায়া। তবে নিজের বিয়ের সময় যা যা ঘটেছিল তার কোনটাই বাদ গেল না। শুধু ঐ একটিমাত্র ব্যতিক্রম—ফুলশয্যার রাতে নববধূ দেখতে পেল, স্বামীর সঙ্গে উপস্থিত আছেন কৌতুকময়ী মহামায়া। নববধূকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দুটো দিন সবুর করতে হবে ছুটকি। তোর তো সারাটা জীবনই পড়ে রইল, আমি যে কটা দিন আছি—বলেই অসঙ্কোচে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিলেন রাজা-মশাইকে তাঁর বাহুডোরে—শঙ্করীর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

এক-গা ফুলের গহনা-পরা ত্রয়োদশী বালিকা লজ্জায় রাঙিয়ে উঠেছিল।

মহামায়া খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিলেন। ধমকে ওঠেন, মর্ ছুঁড়ি। আমি করছি পিরীত, আর তুই লাজে রাঙিয়ে উঠছিস কেন রে?

রাজা-মশাই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, আঃ বড় বউ! কী হচ্ছে!

সে আজ তিন বছর আগেকার কথা।

আশ্চর্য! সব ব্যবস্থা করেও মহামায়া শেষরক্ষা করতে পারলেন না। মরা হল না তাঁর। শঙ্করীর বিবাহের পর অবস্থা যখন আরও খারাপ হল তখন

রাজবৈদ্য নাড়ি দেখে বললেন, সময় হয়েছে। এবার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর। ব্যবস্থা হল। তারপর কী হল জানতে হলে আপনাদের পড়তে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লেখা মিসেস এলিজা ফে'র ২৭শে সেপ্টেম্বরের চিঠিখানি। মিসেস ফে তাঁর ইংলণ্ডবাসী ভগ্নীকে ঐ চিঠিতে লিখছেন 'রুগ্ন ও মুমুর্ষুদের বিষয়ে হিন্দুদের আরও একটি বীভৎস প্রথা আছে। এ-দেশের ব্রাহ্মণেরা শুধু পৌরোহিত্যই করেন না, চিকিৎসাদিও করেন। কোনও রুগীর মৃত্যু আসন্ন বুঝলে গঙ্গাযাত্রা বা গঙ্গাজলির ব্যবস্থা হয়। আত্মীয়রা তাকে কাঁধে করে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে জলে চুবিয়ে তার চোখ-মুখ-নাকে গঙ্গামাটি ঠেসে দেওয়া হয়। ফলে রুগী অচিরে গঙ্গালাভ করে। অর্থাৎ মরতে তাকে বাধ্য করা হয়। কারণ গঙ্গাজলির পরে বেঁচে থাকলেও তাকে আর ঘরে নেওয়া হয় না। তাহলে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়।

'ডাঃ জ্যাকসন (যে আইরিশ চিকিৎসকটির কথা পূর্ব চিঠিতে লিখেছি) একবার একজন হিন্দুরাজার স্ত্রীর গঙ্গাযাত্রা শুরু হবার সময় রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি রাজাকে বলেন যে, তাঁর স্ত্রীর বেঁচে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং তিনি নিজে তাঁর চিকিৎসা করবেন। ভাগ্যিস গঙ্গাযাত্রা শুরু হয়ে যায়নি! তাহলে তো মহিলাকে মরতেই হত। জ্যাকসন কোম্পানীর ডাক্তার, তাঁর নামডাক খুব। রাজা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং রানীর চিকিৎসা চলতে লাগল। রানী বেঁচে উঠলেন এবং আজও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন।'*

মোট কথা, ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যাবার বাসনা চরিতার্থ হল না মহামায়ার। প্রথম প্রথম শঙ্করীকে বলতেন, কী করব বল্ ছুট্‌কি? মরতে কি আমার অসাধ? কিন্তু মরছি না। যে। তোরই কপাল!

শঙ্করী বড়দির হাত দুটি চেপে ধরে বলত, অমন কথা বলো না বড়দি! আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক তোমার।

* পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। যে কালের এ ঐতিহাসিক উপন্যাস সে যুগটা ঘন কুয়াশাবৃত। মিসেস এলিজা ফে'র ঐ দুষ্প্রাপ্য চিঠিখানি ব্যবহারের লোভ তাই সামলাতে পারলুম না। এ আমার সজ্ঞান-অ্যানাক্রনিজম্! কাহিনী অনুযায়ী ঘটনা ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের। এলিজা ফে'র চিঠির তারিখ ২৭।৯।১৭৮১, ধরে নেওয়া যাক—মহামায়ার কপালেও অনুরূপ ঘটনা কিছু ঘটেছিল।

সে কথাটাও ছিল আন্তরিক। তারপর শঙ্করীও দেহেমনে বেড়েছে। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। অনেক দুঃখে বুঝেছে—নিঃসন্তান বড়দি তাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলতে চায়। নিজের বিয়ের গহনা পরিয়ে দেয় তাকে, নিজের বেনারসী, বালুচরী, মসলিন দিয়ে সাজিয়ে তোলে, চুল বেঁধে দেয়, টিপ পরিয়ে দেয়, শ্বেতচন্দনের আলপনা এঁকে দেয় ললাটে, গণ্ডে। তারপর চিবুকটা তুলে ধরে দক্ষ শিল্পী'র মত দেখে ওর অনিন্দ্য মুখশ্রী। বলে, এমন না হলে রাজরানী! আজ তোকে দেখলে রাজা-মশাইয়ের মাথা ঘুরে যাবে।

কিন্তু ঐ। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মহামায়া তার অধিকার ছাড়ে না। মুখে বলে বটে 'রাজা-মশাইয়ের মাথা ঘুরে যাবে', আসলে প্রসাধন শেষে সে ওকে রাজা-মশাইয়ের সামনে নিয়েই আসে না। হয়তো লোকলজ্জায়—আয়ী-মা বা অন্য কোনও পুরললনার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিহ্বল হয়ে সে শঙ্করীকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় শয়নকক্ষে—কিন্তু শঙ্করী ক্রমশঃ বুঝতে শিখল, তার সবটাই ফাঁকি। সবটাই ফাঁকা। বড়'দির নির্লজ্জ ব্যবহারে শুধু শঙ্করী নয়, রাজা-মশায়ও মর্মান্তিক লজ্জিত হতেন। শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে ছুটকি যখন ছুটে পালাতো তখন খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেন বড়রানী। তখন অর্গলবদ্ধ হত শয়নকক্ষ।

তারপর একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল শঙ্করীর কাছে। এক নিদাঘ দ্বিপ্রহরে শঙ্করীকে আক্রমণ করল আয়ী-মা। শঙ্করীর মহাল রাজপ্রাসাদের একান্তে। আপন মনে পুতুল খেলছিল সে। আয়ী-মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ওঠ্, দেখি ছুঁড়ি। তোরে একটা কাজ করতে হবে নে। এই পানের বাটাটা নে যা। দিয়ে আয় রাজা-মশাইকে।

দিবাভাগে রাজা-মহাশয় থাকেন বা'র-মহালে। বেলা দ্বিপ্রহরে অনন্তবাসুদেবের ভোগ শেষ হলে মধ্যাহ্নে আহার করতে আসেন অন্দর-মহলে। বড়রানীর শয়নকক্ষে রেশমের আসনে বসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাপ্ত করেন। মহামায়া বসে থাকেন পাখা হাতে অদূরে। "এটা খাও, ওটা খাও—না খাও তো আমার মাথা খাও'—নিত্য রসিকতায় মধ্যাহ্ন আহারের পর্বটা শেষ হত। তারপর রাজা-মহাশয় পান মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করেন। কখনও বা কাব্য পাঠ করে শোনান মহিষীকে। অপরাহ্নে আবার গিয়ে বসেন বা'র-মহালে। সে মধ্যাহ্ন-নাটকে শঙ্করীর কোন ভূমিকা নেই। তাই সে অবাক হয়ে বলে, কেন? বড়দির কী হল?

—তেনার বাপের বাড়ির নোক এয়েছেন। তুই আয় দেখি মুখপুড়ি!

জোর করে ওকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আয়ী-মা। শঙ্করী চোখ তুলে

দেখল—রাজা-মহাশয় বড়রানীর পালঙ্কে অর্ধশয়ান হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে ফরসির নল। সব রকম আয়োজন সম্পূর্ণ করেই মহামায়া গিয়েছিলেন মাঝ-মহালে, তাঁর ভাইয়ের তদারকি করতে। 'মাঝ-মহাল' একটা মধ্যবর্তী অংশ, যেখানে প্রয়োজনে অন্দর-মহলের মানুষ বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে—কখনও চিকের পর্দার ওপাশ থেকে, কখনও বা প্রকাশ্যে।

সলজ্জ চরণে ওকে অগ্রসর হতে দেখে উঠে বসলেন রাজা-মহাশয়। ওর প্রসারিত করমুষ্টিতে ধৃত রূপার বাটায় পান-সুবাকের আয়োজনটা দেখে বললেন, তোমার বড়দির ত্রুটি সংশোধন করছ বুঝি?

শঙ্করী নত নয়নে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। পানের বাটা নামিয়ে রেখে প্রস্থান করবে কি না স্থির করে উঠতে পারে না। রাজা-মহাশয় নিজে থেকে বলে ওঠেন, কিন্তু তোমার বড়দি তো শুধু পান দিয়েই নিষ্কৃতি পায় না। এই সময় গল্পও করে আমার সঙ্গে। তুমি বসে গল্প করবে না? বস না?

পঞ্চদশী শঙ্করী কোথায় বসবে বুঝে উঠতে পারে না। বড়দি এক্ষেত্রে কোথায় বসে? ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক। গদি-মোড়া কেদারা কিছু আছে বটে—কিন্তু তা একেবারে ও-প্রান্তে। সেখানে গিয়ে বসলে গাল-গল্প করা যায় না। খাটের বাজু ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর হাত থেকে পানের বাটাটি গ্রহণ করার পরিবর্তে হাতটা চেপে ধরেন রাজা-মহাশয়। একটু আকর্ষণ করে বলেন, বস এখানে, এই পালঙ্কে।

অগত্যা। গায়ে মাথায় ভাল করে কাপড় টেনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে শঙ্করী।

—তুমি কী কর সারাদিন? পুতুল খেল?

শঙ্করীর ইচ্ছা হল বলে, আমি কি বাচ্চা মেয়ে? পারলে না বলতে। বড়দি ঘরে থাকলে হয়তো বলতে পারত। একেবারে নির্জন ঘরে পুরুষমানুষের কাছে অতটা প্রগল্ভ হওয়া যায়? মাথা নেড়ে সে জানাল—না।

রাজা-মহাশয় বললেন, বড় গরম লাগছে, একটু হাওয়া করবে?

শঙ্করী তালপাখাটা তুলে নেয়। হাওয়া করতে হলে এতটা দূর থেকে তা করা যায় না। উপায় নেই। বাধ্য হয়ে একটু ঘনিয়ে আসে শঙ্করী। হঠাৎ পাখাসমেত ওর হাতখানা চেপে ধরেন রাজা-মশাই। শঙ্করী যেন কাঠের পুতুল। তটস্থ হয়ে যায়। রাজা-মহাশয় বলেন, তুমি আমার উপর খুব রাগ করে আছ, না?

এবার অসঙ্কোচে সে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

জীবনে প্রথম।

বললে, কেন? আপনার উপর রাগ করব কেন?

—আমি বুড়ো বর বলে?

দৃষ্টি নত হল শঙ্করীর। জবর একটা জবাব ওর মনে এসেছিল, কিন্তু সঙ্কোচে বলতে পারলে না। রাজা-মহাশয় পুনরায় বলেন, কই জবাব দিলে না?

সব সঙ্কোচ জয় করে এবার বাধ্য হয়ে জবাব দিয়েছিল শঙ্করী। বেচারী জানে না, এই একটিমাত্র বাক্যই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। নত নয়নে মরীয়া হয়ে শঙ্করী শুধুমাত্র প্রাতপ্রশ্ন করেছিল, আপনি রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' পড়েছেন?

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বংশবাটির রাজা-মহাশয়, নৃসিংহদেব রায়। নিজে তিনি সুপণ্ডিত। একাধিক ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার। সংস্কৃত, আরবিক, ফারসি এবং ইংরাজী। সংস্কৃত এবং ফার্সিতে তিনি কবিতাও লিখতেন। 'উদ্দীশতন্ত্র' নামে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর রচিত একটি গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ বঙ্গভাষায় অনুবাদও করেছেন। তাঁর রাজ্য নেই, কিন্তু রাজসভা আছে—এবং সেখানে একাধিক হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত মাসোহারার বন্দোবস্তে হাজিরা দেন। ওঁর এ পরিচয় অবশ্য শুধু বা'র-মহালেই সীমিত। অন্দর-মহলে এ জাতীয় কথোপকথন ওঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে কখনও করতে হয়নি। মহামায়ার অক্ষর-পরিচয়ই নেই—রাজা-মহাশয় তাঁকে কাব্য পড়ে শোনাতেন। জুৎ হত না।

বিস্মিত রাজা-মহাশয় বলেছিলেন, তুমি বাঙলা পড়তে পার? কোথায় শিখেছ?

—পাঠশালায়। তারপর নিজে নিজে।

—কী কী বই পড়েছ তুমি?

—বই পাব কোথায়? তবে অন্নদামঙ্গলের একটা পুঁথি তো আপনার ঘরেই আছে।

—তুমি 'বিদ্যাসুন্দর' পড়েছ?

শঙ্করী জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। নূপুর-ঝঙ্কারে সে সচকিত হয়ে দ্বারের দিকে ফেরে। দেখে, পূর্বমুহূর্তেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন মহামায়া। যেন অনধিকারী—লাফ দিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়েছিল শঙ্করী। এমন পরিবেশে সে আশঙ্কা করেছিল, বড়দি কৌতুকে ফেটে পড়বে: 'হ্যা লা ছুটকি! তোর পেটে পেটে এত?' না, সে জাতীয় কোন কথা বড়দি বলেনি। একদৃষ্টে সে শুধু তাকিয়ে দেখছিল ওদের দুজনকে। যেন কিছু একটা পরিমাপ করতে চায়। সে

দৃষ্টিতে কৌতুক ছিল না, রহস্যের বাষ্পমাত্র ছিল না। আর বড়দির সেই জলন্ত চোখ-জোড়া থেকেই অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিল শঙ্করী।

অপরাধী যেন রাজা-মহাশয় নিজেই। যেন পরস্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন এতক্ষণ। ধড়মড়িয়ে তিনিও উঠে পড়েন। বলেন, বেলা যায়। এবার যাই।

ছুটে এসে বাধা দিয়েছিলেন মহামায়া, সে কি কথা রাজা-মশাই! আপনার বিদ্যাকে 'সুন্দর'-এর উপাখ্যানটা না শুনিয়েই চলে যাচ্ছেন যে!

রাজা মহাশয় মহামায়াকে সরিয়ে নীরবেই স্থানত্যাগ করেছিলেন।

এ থেকেই সূত্রপাত। বড় রানীমার ঘরে হাতে-লেখা পুঁথিটা এরপর চুরি করেছিল শঙ্করী। সে জানত, ঐ কাব্যগ্রন্থ থেকে রাজা-মহাশয় পাঠ করে শোনাতেন মহামায়াকে। কী আছে সে গ্রন্থে তা জানত না এতদিন। এবার জানল। এবং তারপরেই রহস্য-যবনিকাটা সম্পূর্ণ সরে গেল ওর দৃষ্টিপথ থেকে।

বালিকা শঙ্করী যুবতী হল।

তিন

পরিবর্তন একা শঙ্করীর হয়নি। হয়েছিল মহামায়ার। এবং নৃসিংহদেবের। দোষ দেব কাকে। এই তো জগতের নিয়ম। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। মহামায়ার কথাই ধরা যাক:

আট বছর বয়সে এসেছিল এ সংসারে। নবাবী আমলে। তারপর দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস গেছে আমূল বদলে, কিন্তু এ ত্রিশ বছরে মহামায়ার জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তোমরা বলবে হয়েছে—বালিকা হয়েছে কিশোরী, তরুণী, যুবতী। আজ সে আটত্রিশ বছরের প্রৌঢ়া। তা হোক—তবু তার ধারণা ছিল, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার অধিকার একদিনের জন্যও শিথিল হয়নি। নৃসিংহদেবের একমুখী প্রেমে কোনদিন কোন খাদ মেশেনি। প্রথমা পত্নীর সন্তান না হওয়ায় ওঁর জননী হংসেশ্বরী দেবী বহু চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে সম্মত করাতে পারেননি পুত্রকে। তারপর হল ওর মরণাপন্ন অসুখ। কবিরাজ নিদান হাঁকলে—মেয়াদ এক বছর। জীবনদীপ নিবিয়ে দেবার আগে মহামায়া চেয়েছিল একটা মহান ত্যাগের নজির রেখে যাবে। স্বামীকে সুখী করাই যে ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তার অকাট্য প্রমাণ রেখে বিদায়

নেবে। অজানা-অচেনা নয়, তাই সে নির্বাচন করেছিল তার কন্যার মত ঐ শঙ্করীকে। মাত্র ছয় বছরের বালিকাটিকে নৃসিংহদেব এনে ফেলে দিয়েছেন নিঃসন্তানা মহামায়ার ক্রোড়ে। বলেছিলেন, ভগবান এক হাতে দিলেন না, অন্য হাতে তোমাকেই দিয়েছেন। নাও—মানুষ কর একে।

মহামায়া নিজের গর্ভজাত কন্যার মতই তাকে মানুষ করেছেন। সাজিয়েছেন, পরিয়েছেন, পুতুল খেলেছেন। জননীর সখ-আহ্লাদ মিটিয়েছেন। শঙ্করীর মধ্যে তিনি যেন নিজ শৈশব কে খুঁজে পেয়েছিলেন। শঙ্করী যেন দ্বিতীয়া মহামায়া। তাই যখন ওপারের ডাক এল, তখন নিরভিমান উদারতায় ঐ মেয়েটিকেই দিয়ে যেতে চাইলেন তাঁর সবচেয়ে আদরের সম্পদটি।

কিন্তু! মানুষ ভাবে এক, হয় আর। ওপারে পাড়ি দেওয়া হল না। না হোক। তবু ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মহামায়া নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাঁর স্বামীর ঐকান্তিক প্রেমের ভাগীদার কোনদিন হতে পারবে না ঐ একফোঁটা মেয়েটা। এ হয় না, এ অসম্ভব।

তবু সেই অসম্ভই সম্ভব হতে বসেছে। ঐ একফোঁটা মেয়েটা ক্রমে যেন ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় রূপান্তরিত হতে চায়। পক্ষিশাবক যেন আর তার পরিচিত নীড়ে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয—এবার সে মুক্ত নীলাকাশে ডানা মেলতে চায়। আর সেখানে তার জননীর কোন ভূমিকা নেই। যে মা তাকে শৈশবে আহার যুগিয়েছে, উড়তে শিখিয়েছে, সেই মাকে পিছনে ফেলে তারুণ্যের উদ্দামতায় সে নিঃসঙ্গ-সঞ্চারী জীবনে অভিষিক্ত হতে চায়। না, নিঃসঙ্গ নয়—সঙ্গী যে সেও চায়। আর সঙ্গী হিসাবে সে চায় এমন একজনকে,—কিন্তু ওর দোষ কোথায়? এ যে মহামায়ার স্বখাত সলিল!

মহামায়া বুঝল সবই—মেনে নিতে পারল না। প্রাণপণে সে রুখতে চাইল এই অনিবার্য পরিণামটাকে। চোখে চোখে রাখতে থাকে দুজনকে। ওর বাপের বাড়ি থেকে ভাই এসেছিল নিমন্ত্রণ করতে। ওর ছোট ভগ্নীর বিবাহ। কিন্তু প্রাণ ধরে সেখানে যেতে পারল না মহামায়া। ও বুঝতে পেরেছে---মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হলেই ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঐ নবযৌবনবতী শঙ্করী এই সুযোগই খুঁজছে; আর খুঁজছে আর একজন। যাকে একদিন অকুণ্ঠ বিশ্বাস করে এসেছেন মহামায়া—ঐ প্রৌঢ় মানুষটা। ছি ছি ছি!

কিন্তু দোষ কি রাজা-মহাশয়কেই দেওয়া যায়? হ্যাঁ, তিনি দ্বিতীয়বার যখন বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন তখন তাঁর একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মৃত্যু-পথ-যাত্রিণী সহধর্মিণীর শেষ ইচ্ছার পূরণ। এ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মানুষ

তার নিজের মনটাকেই বা কতটুকু চেনে? হ্যাঁ, সেই বালিকা আজ ষোড়শী; তার এ পরিবর্তন যে হবে তা তো জানাই ছিল। ছিল অন্তত মহামায়ার। সে বলেছিল—'আমি আর কদিন? তদ্দিনে শঙ্করী দিব্যি ডাগর হয়ে উঠবে।' কথাটা মেনে নিয়েছিলেন, মনে নেননি! নৃসিংহদেব চরিত্রগতভাবে ইন্দ্রিয়-সংযমী। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর পাঁচজন রাজা-রাজড়ার মত আদৌ নন। তাঁর চরিত্র সেদিক থেকে নিষ্কলঙ্ক। বাইজীর আসর বসত না তাঁর বিলাসকুঞ্জে। শঙ্করী যদি সাধারণ পুরললনা হত, তাহলে তিনি মাতৃজ্ঞানেই তাঁকে সমীহ করে চলতেন—কিন্তু কেমন করে আজ তিনি ভুলে যাবেন—ও তাঁর স্ত্রী! সহধর্মিণী! তার মনেও এতদিনে কামনা-বাসনা জাগতে পারে! জেগেছে। সে দায় মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব যে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছেন। প্রতিগৃহ্ণামি! তিনি যে দেখেছেন, ঐ মেয়েটির চোখের পাতায় প্রত্যাশা কাঁপছে। অন্নদা-মঙ্গলের উমা যেন বৃদ্ধ পতির প্রতি তাঁর দেহমনের অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছেন।

অন্নদামঙ্গল! হ্যাঁ, মেয়েটি বাংলা পড়তে পারে। কবিপ্রকৃতির রাজা-মহাশয় হঠাৎ এই প্রৌঢ় বয়সে আবিষ্কার করে বসেছেন—তাঁর দাম্পত্যজীবনের একটা দিকে ফাঁক ছিল। ঐ মেয়েটি হয়তো তা পূরণ করতে পারবে। আজ না পারুক, দুদিন পরে। ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করলে। সে চেষ্টা করেছিলেন রাজা-মহাশয়—কিন্তু শঙ্করী রাজী হয়নি কোনও পরপুরুষের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে। না, বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছেও নয়। মহামায়ার কটাক্ষ অস্বীকার করে অগত্যা তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সে দায়িত্ব। কয়েকদিনের মধ্যেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী, অধ্যবসায়ী। প্রতিদিন সে পাঠ নিত, পাঠ দিত। মহামায়ার উপস্থিতিতেই। রাজা-মহাশয় আর সন্ধ্যার পর বা'র-মহালে যান না। খাসগেলাসের আলোয় পড়াতে বসতেন কনিষ্ঠা পত্নীকে। মহামায়া অদূরে বসে পাহারা দিত। সে বুঝে নিয়েছিল—এখানে তার এক বাজি হার হয়েছে। এখানে বাধা দিতে গেলে সে সম্পূর্ণভাবে হেরে যাবে। তাই সে মেনে নিয়েছিল এ ব্যবস্থা।

ইংরাজী শিখতে সম্মত হল না শঙ্করী। বললে, বাংলা আর সংস্কৃতটাই আগে ভাল করে শিখি। বাংলা ছাপা বই কোথায় পাবেন? বছর পাঁচেক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে 'হিকির গেজেট', কিন্তু তাও ইংরাজী ভাষায়। হাতে লেখা কিছু পুঁথি ছিল—বৈষ্ণব কবিদের। সেগুলি পাঠ শুরু করার পরেই একদিন বিস্ফোরণ হল। সরল বিশ্বাসে শঙ্করী তার শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিল—ঐ পংক্তিটার অর্থ কি

হল ? ঐ যে—'কচুয়া ধরত যব হাসিয়া' ?

শিক্ষক ইতস্তত করছিলেন ব্যাখ্যা দিতে।

মহামায়ার অক্ষর-পরিচয় নেই, কিন্তু রাজা-মশায়ের কাছে শুনে শুনে বৈষ্ণব পদাবলী ভালই জানা ছিল তার। হঠাৎ ক্ষেপে গেল সে। দুম্‌ দুম্‌ করে উঠে গেল এবং একখানা হাতে-লেখা পুঁথি এনে ফেলে দিল শিক্ষক আর শিষ্যার মাঝখানে। বললে, তাহলে এটাই বা বাকি থাকে কেন ? নাও, পড়াও। আমি বরং চলে যাচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ গৃহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

শঙ্করী চোখ তুলে দেখে পুঁথিখানা তার সুপরিচিত। 'বিদ্যাসুন্দর'। চুরি করে পড়ে সেটাকে সে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল। বড়দির ব্যথাটা কোথায় এখন সে বুঝতে পারে। বড়দির ক্রোধোন্মত্ততাই তাকে বুঝিয়ে দেয়—যে পংক্তিটির অর্থ সে জানতে চেয়েছিল তার মানে কি। লজ্জা পায় শঙ্করী। তার চেয়েও দুঃখ হয় বেশি। বড়দি কেন এভাবে মিছামিছি হিংসা করছে তাকে ?

বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে সেও প্রস্থানের উদ্যোগ করে।

বাধা দেন রাজা-মহাশয় স্বয়ং। বলেন, যেও না, বস। তোমার বড়দি অহেতুক উষ্মা প্রকাশ করছেন। এ রাজ্য এখন আর তোমার কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল নয়। তুমি বয়ঃপ্রাপ্তা। বস, তুমি যে প্রশ্নটা করলে তার অর্থ—

বাধা দিয়ে শঙ্করী বলেছিল, থাক। আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি তার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

ঘর নির্জন। মহামায়া অনুপস্থিত। রাজা-মহাশয় সকৌতুকে বলেন, কী ওর অর্থ, বল তো ?

স্বামীর মুখে আয়ত দুটি চক্ষু মেলে শঙ্করী বললে, আমি ঐ পুঁথিখানাও পড়েছি। ইঙ্গিতে সে রায়গুণাকরের কাব্যটিকে দেখায়।

রাজা-মহাশয় একবার গ্রন্থটি একবার তাঁর সহধর্মিণীকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করেন, কোন্‌ কাব্যটি তোমার কাছে বেশি ভাল লেগেছে ? 'অন্নদামঙ্গল' না 'বিদ্যাসুন্দর' ?

বড় কঠিন প্রশ্ন। মহা-মহা পণ্ডিতরাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। শঙ্করী একটু ভেবে নিয়ে বললে, অন্নদামঙ্গল।

এ জবাব প্রত্যাশা করেননি রাজা-মহাশয় ঐ যুবতী নারীর কাছে। যে হতভাগিনী স্বামী পেয়েও পায়নি। ষোলোটি বসন্ত যার তনু-মন থরে থরে ভরিয়ে তুলেও সার্থকতা খুঁজে পায়নি। তিন বৎসর বিবাহিত জীবন অতিক্রম

করেও যে জানে না—পুরুষমানুষ মুখে চুমু খেলে দেহে কী জাতের শিহরণ জাগে! রাজা-মহাশয় নিঃসংশয়ে বুঝলেন, মেয়েটি সঙ্কোচে, সরমে সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করছে। সাহিত্যে যে পরিমাণ অধিকার থাকলে বলা যায়—তুলনামূলক বিচারে 'অন্নদামঙ্গল' শ্রেষ্ঠতর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য, সে জাতীয় শিক্ষা ওর নেই। তাই প্রশ্ন করলেন, কেন বল দেখি?

মেয়েটি জবাবে যে কথা বলল তাতে আরও অভিভূত হয়ে পড়লেন নৃসিংহদেব। স্পষ্ট উচ্চারণে শঙ্করী বলল, কোন্ কাব্যগ্রন্থ উৎকৃষ্টতর তা পণ্ডিতে বলতে পারবেন। আমার কাছে অন্নদামঙ্গল ভাল লেগেছে দুটি কারণে। প্রথমত অন্নদামঙ্গলই হচ্ছে আমার জীবনে প্রথম পঠিত কাব্যগ্রন্থ। স্বতঃই তার প্রতি একটু বেশি মমতা আছে আমার। দ্বিতীয় কথা, 'বিদ্যাসুন্দর' আমি বড়দির দেরাজ থেকে চুরি করে পড়েছিলাম। অপরাধবোধ আছে তাতে।

নৃসিংহদেব বুঝতে পারেন—এ মেয়েটি শুধু মেধাবী নয়, প্রতিভাময়ী। বিচারবুদ্ধি তার প্রখর। রূপের জন্য নয়, বুদ্ধির জন্যই সে রাজমহিষী হবার উপযুক্ত। অত্যন্ত প্রীত হন তিনি। বলেন, কিন্তু চুরি করে যদি ভাল জিনিস খাওয়া যায় তাতে স্বাদ তো কমে না ছোট বউ। তা তো আরও মধুর লাগে। চুরি করে খাওয়ার মাধুর্য!

একটু চমকে ওঠে শঙ্করী। জীবনে এই প্রথম রাজা-মহাশয় তাকে ঐ নামে ডাকলেন। শব্দটা তার কানে মধুবৃষ্টি করল। ছোট বউ! অর্থাৎ এতদিনে সে বংশবাটির কনিষ্ঠা মহিষীর মর্যাদা পেল। সেই প্রাপ্তির আনন্দেই বোধ করি আরও একটু প্রগল্‌ভা হয়ে পড়ে শঙ্করী। বলে, তাই হয় রাজা-মহাশয়। মধুর হয়তো লাগে, কিন্তু তাতে তার মূল্যমান বাড়ে না। 'বিদ্যাসুন্দর' হচ্ছে আমার কাছে চুরি করে খাওয়া কুলের আচার, আর 'অন্নদামঙ্গল' শৈশবের মাতৃস্তন্য। আপনি পণ্ডিত, এবার বলুন—শুধু ভাল লাগাটাই কি তাদের ঔৎকর্ষের কষ্টিপাথর?

নৃসিংহদেব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন, তুমি আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছ ছোট বউ। এতটুকু বয়সে এত সুন্দর কথা বলতে তুমি শিখলে কেমন করে? বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভারি ভাল লাগছে আজ।

শঙ্করী কিন্তু বসেনি। যথেষ্ট দূরত্ব রেখেই বলেছিল, এবার কিন্তু তুলনাটা আপনার নিজের প্রতি প্রয়োগ করার সময় হয়েছে রাজা-মহাশয়!

—তার মানে ?

—আপনার ছোট বউও 'কুলের আচার'। মুখরোচক হলেও তা হয়তো আপনার কাছে পুষ্টিকর নয়। আপনি আপনার অভ্যস্ত 'অন্নদামঙ্গলে'র রসাস্বাদনেরই চেষ্টা করুন।

কথাটা বলেই ছুটে পালিয়ে এসেছিল ছুটকি।

নিজেকে শঙ্করীও ঠিক চিনতে পারেনি। বুঝে উঠতে পারেনি, সে কী চায়। ধরা দিতেই যদি চায় তাহলে এমন করে বারে বারে পালিয়ে আসে কেন? সে কি অনাঘ্রাতা কুমারীর সহজাত সঙ্কোচ? লজ্জা? না কি বড়দির মনে ব্যথা দিতে চায় না বলেই। বড়দি তো শুধু তার বড়দি নয়, সে যে তার মা! সে সম্পর্কে নৃসিংহদেব যে আবার তার পালক-পিতা। অথচ নারায়ণ-শিলা আর অগ্নি সাক্ষী করে সে তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। দ্বিতীয় কোন পুরুষমানুষের দিকে সে কখনও চোখ তুলে তাকায়নি, তাকাবে না। ইতিমধ্যে বিদ্যাসুন্দর পড়ে, বৈষ্ণব-সাহিত্য পড়ে সে বুঝতেও শিখেছে কী ভাবে তার নারীজন্ম সার্থক হতে পারে। বংশবাটির রাজা-মহাশয় আজও অপুত্রক। যে সার্থকতা মহামায়া আনতে পারেনি রাজা-মহাশয়ের জীবনে, সেই অসম্পূর্ণতাকে সুসম্পন্ন করতেই সে জন্মগ্রহণ করেছে এ ধরাধামে। আর তার প্রথম ধাপ ঐ বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষোত্তমের বাহুবন্ধে ধরা দেওয়া। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? বড়দির চোখের সামনে?

সে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিল আয়ী-মা। এ রাজবাড়িতে ঐ নিরক্ষরা বৃদ্ধা মহিলার একটা মর্যাদা আছে। বোধ করি রানী-মা হংসেশ্বরীর অবর্তমানে সে-ই সে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিতা। স্বয়ং রাজা-মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ করেছিল সে। একদিন তার সঙ্গে তুমুল কলহ হয়ে গেল মহামায়ার। যে কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলতে পারছিলেন না নৃসিংহদেব অথবা শঙ্করী, সে কথাটা নির্লজ্জ ভাষায় বলে বসল আয়ী-মা।

পরিবেশ সেই একই। রাজা-মহাশয়ের আহারান্তিক মধ্যাহ্ন-অবকাশ। আজকাল অবশ্য তিনি বিশেষ সময়ই পান না। স্বয়ম্ভরা মন্দির সমাপ্ত হয়েছে। আগামী কার্তিক-অমাবস্যায় দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। আর মাত্র তিন দিন বাকি। অতিথি-অভ্যাগতরা প্রতিদিনই আসছেন। গঙ্গার ধারে তাঁবু পড়েছে। উঠেছে অস্থায়ী ছাউনি। রাজা-মহাশয় সময়ই পান না। তবু আহারান্তে অভ্যাসমত তামাকু সেবনে বসেছিলেন অর্ধদণ্ডের জন্য। হঠাৎ শঙ্করীর হাত ধরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল আয়ী-মা। রাজা-মহাশয় শায়িত অবস্থায় ছিলেন।

হাজার হোক, আয়ী-মা মাতৃস্থানীয়া—তাই উঠে বসলেন তিনি। বললেন, কী সমাচার আয়ী-মা?

—এ আবাগী তোরে নেমন্তন্ন করতে এয়েছে বাপ্।

—নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ রে ছুটকি? প্রশ্ন করলেন মহামায়া। তিনিও উঠে বসেছেন।

—বেরৃত। চতুরদশীর রাত্তিরে।

মহামায়া পুনরায় বলে, এবারও শঙ্করীকে—তা নিমন্ত্রণ করতে চাস নিজে এসেই করলে পারতিস। আবার দূতী সঙ্গে নিয়ে এসেছিস কেন রে ছুটকি?

এবারও জবাব দিল আয়ী-মা, তোমার ছুটকি যে ডরায়। নিজের ঠাঞে নিজেই চোর হয়ে আছে। কপাল।

যে নিমন্ত্রণ করছে এবং যাকে করছে তারা দুজনেই নীরব। মহামায়াই আবার ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেন, আহা-হা! মরে যাই! তা কাত্তিকের কেষ্টপক্ষের চতুর্দশীতে আবার কিসের ব্রত? এ তো অনন্তচতুর্দশীও নয়, শিবচতুর্দশীও নয়। ভূতচতুর্দশী ব্রত নাকি?

কথায় পার পাবে না আয়ী-মার সঙ্গে। অম্লান বদনে বললে, আজ্ঞে না, বড় রানীমা। পেত্নীচতুর্দশী। ছুটকির ঘাড়ে যে পেত্নী চড়ি বসিছেন, তাঁরই নামানোর বেরৃত।

মুখ কালো হয়ে ওঠে মহামায়ার। গম্ভীর হয়ে বলেন, এতবড় কথাটা তুমি বললে আয়ী-মা?

আয়ী-মা নির্ভীক। বলে, ও মা! আমি আবার কই বলনু? তুমিই তো বলালে।

এতক্ষণে রাজা-মহাশয় এ কথোপকথনের ভিতর প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। ব্যাপারটা লঘু করতে বলে ওঠেন, বেশ তো, আমরা যাব। নিমন্ত্রণ যখন হয়েছে—

—আজ্ঞে না, রাজা-মশায়। 'আমরা' লয়, 'আমি'। নেমন্তন্ন তোমার একার।

আবার রুখে ওঠেন মহামায়া। আয়ী-মাকে অগ্রাহ্য করে শঙ্করীকেই প্রশ্ন করেন, কেন রে ছুটকি? তোর বড়দিকে দুটি রেঁধে খাওয়াতে পারিস না?

শঙ্করী কী জবাব দেবে? সমস্ত ষড়যন্ত্রটাই যে আয়ী-মার। কিন্তু তাকে জবাব দিতে হল না। বাক্‌পটু আয়ী-মা তৎক্ষণাৎ বললে, তা পারবে না কেনে গো? এস না তুমি, আজ এস, কাল এস, পরশু এস। ছুটকি তার মহালে বইসে

তোমারে পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াবে। তবে বেবৃত বলে কথা। চতুর্দশীর রাত্তিরে রাজা-মশাই অন্নসেবা করে ওঁয়ার মহালেই শোবেন যে।

এতক্ষণে পরিকল্পনাটার পূর্ণ অর্থগ্রহণ হয় বড়রানীর। ফস্ করে বলে বসেন, ও। তাহলে আসল ষড়যন্ত্রটা এই ? ফন্দিটা করি ? তোমার, না ছুটকির ?

এবার আয়ী-মাকে সে সরাসরিই প্রশ্ন করেছে। তাই জবাব দিতে তার দেরি হয় না। বলে, আমারও লয়, ছুটকিরও লয়, বড় রানীমার। তেনিই তো জিদ্ করে রাজা-মশায়ের বে দেওয়ালেন।

আর সহ্য করতে পারেননি মহামায়া। দুরন্ত ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন, তুমি এমনি করে আমার সর্বনাশ করবে আয়ী-মা ! দুধ-কলা দিয়ে কী সাপই পুষেছিলাম !

অজান্তে সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছে বড়রানী। এবার দুধ-কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তুলে দাঁড়ালো। বললে, কতাটা যখন তুললে বড়রানী তখন খুলেই বলি। রানীমা কাশীবাসী না হলে সে-ই বলত। দুধ-কলা দিয়ে যে আমারে এ রাজবাড়িতে পুষেছেল সে তুমি লয়, তোমায় শ্বশুর। তিনি সগ্যে থেকে দেখতেছেন—আমি তাঁর ছাওয়ালের সংসারে কি করি না করি। কিন্তু তুমি বড়রানী—তুমি বুড়ি মাগী হই গেলে—আজও বোঝ না এ বাছার পরাণডা কেমন করে ? না বোঝ, নাই বোঝ—কিন্তক্ এটুকু তো বোঝ বংশবাটির বংশে পিদিম জ্বালাবার সলতে আজও পয়দা হয়নি ? ছি ছি ছি ! এভাবে বুড়ো বয়সে সোয়ামিরে আগলে রাখতি সরম হয় না তোমার ? আয় রে ছুটকি।

শঙ্করী একটা কথাও বলতে পারেনি। আয়ী-মা ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। ওরা জানতেও পারেনি পরমুহূর্তেই বংশবাটির বড় রানীমা লুটিয়ে পড়েছিল তার বিছানায়। বালিশটা আঁকড়ে ধরে তারপর তার কী ফুলে ফুলে কান্না !

একটু পরে ওকে হাত ধরে পুনরায় বসিয়ে দিয়েছিলেন রাজা-মহাশয়। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেছিলেন, বড় বউ ! আজ তুমি রাগ কর, অভিমান কর—কিন্তু এ কথাটা তো অস্বীকার করতে পার না—এর জন্য তুমিই মূলতঃ দায়ী। আমি চাইনি, আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলাম—কিন্তু তুমি শোননি। বল, আমি কিছু ভুল বলছি ?

চোখের জল মুছে মহামায়া স্থির হয়ে বসে। জবাব দিতে পারে না।

রাজা-মহাশয় পুনরায় বলেন, রাজ্য নেই, তবু আমি তো বংশবাটির রাজা ? নিজের সংসারেই যদি সমদৃষ্টি রাখতে না পারি তাহলে প্রজাসাধারণকে সমদৃষ্টিতে দেখব কেমন করে বল ? তুমি দুঃখ পাবে বলে অনিবার্য পরিণামটাকে ঠেকিয়ে

রেখেছিলাম এতদিন ; কিন্তু তুমিই আমাকে বুঝিয়ে বল—কোন্ অপরাধে ছোট রানীকে ত্যাগ করব ?

—ত্যাগ করতে তো আমি বলিনি। মহামায়া ভাষা খুঁজে পায়।

রাজা-মহাশয় জবাব দেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহিষীর দিকে। তাঁর সেই নীরব দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ছিল তাঁর জবাবের। মহামায়া বুঝল। বুঝল —যে তার পরাজয় এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহামায়া জীবনে কখনও হার মানেনি। আজও সে পরাজয়কে জয় করল। এতক্ষণে শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললে, আমারই ভুল হ্যাঁ, তোমাকে বাধা দেব না। ছুটকির প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। তাছাড়া আমি যা পারিনি, সে তোমাকে হয়তো তাই দিতে পারবে। বংশধর। তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করব আমি, একদিন যেমন ছুটকিকে করেছিলাম। সেটাই হবে আমার সান্ত্বনা।

রাজা-মহাশয় ওঁর হাতখানা তুলে নিয়ে পুনরায় বলেন, তুমি খোলা মনে অনুমতি দিচ্ছ তো বড় বউ ? না হলে, বিশ্বাস কর, আমি হযতো···কী বলব ? স্ত্রী বলতে, সঙ্গিনী বলতে আমি যে আজও শুধু তোমাকেই বুঝি বড় বউ।

প্রৌঢ় প্রৌঢ় স্বামীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন কলহান্তরিতা মহামায়া। এর চেয়ে বিজয়ীর আর কী সম্মান হতে পারে ? স্বামীর কপাটবক্ষে মুখ লুকিয়ে শুধু বলেছিলেন, ওর মধ্যে তুমি আমাকেই খুঁজে পাবে—সেই বিশ বছর আগে-কার আমাকে। ও যে আমার নিজের হাতে গড়া। ও যে দ্বিতীয়া আমি।

চুম্বনে চুম্বনে অবশ করে দিয়েছিলেন নৃসিংহদেব তাঁর উত্তীর্ণ যৌবনা জীবন-সঙ্গিনীকে। মুক্তি পেয়ে রাজার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েই মহামায়া বলেছিলেন, আমার নিমন্ত্রণ নেই—তবু আমি যাব। নিজে হাতে ওর ফুলশয্যা সাজিয়ে দিয়ে আসব। আজ বাদে কাল স্বয়ম্ভরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে তুমি—তার আগে আমার ছুটকিকে স্বয়ম্ভরা করে তোল। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ তুমি—আমার কোনও দুঃখ নেই এতে।

চার

বংশের আদি পুরুষ উদয়নারায়ণ দত্তরায় বোধ করি পাটুলিতে বাস করতেন তাঁর অথবা তাঁর পুত্র জয়ানন্দ দত্তরায়ের সম্বন্ধেও ইতিহাসে কোন হদিস পাই না। তারপর দেখছি, ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সম্রাট শাহজাহান

বর্ধমান-অন্তর্গত পাটুলির ভূম্যধিকারী রাঘব দত্তরায়কে একটি সনদে 'চৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করছেন এবং একুশটি পরগনার জমিদারী প্রদান করছেন। রাঘবই সম্ভবত পাটুলি ত্যাগ করে গঙ্গার ধারে বংশবাটিতে এসে জমিদারীর কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হন এবং একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বর ঐ প্রাসাদকে আরও সম্প্রসারিত করেন। পাটুলির বাস তুলে দিয়ে বংশবাটিতেই রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাসাদের চারিপাশে একটি প্রশস্ত পরিখা খনন এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে রাজপ্রাসাদকে সুরক্ষিত করা তাঁরই কীর্তি। সম্ভবত তখন থেকেই এই স্থানটির নাম হল 'বংশ-বাটি'। রামেশ্বর ছিলেন অত্যন্ত রাশভারি এবং ক্ষমতাশালী জমিদার। সেটা সম্রাট আলমগীরের আমল। সম্রাট আলমগীর খুশি হয়ে তাঁকে 'পঞ্চপাঞ্জা' প্রদান করেন এবং 'রাজা-মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামেশ্বর রাজবাটি সংলগ্ন ভূখণ্ডে পাশাপাশি কতকগুলি গ্রামের পত্তন করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও নবশাক পরিবারকে বাঁশ-বেড়িয়ার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করেন। কাশী ও মিথিলা থেকে কিছু সুপণ্ডিত এনে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার চতুষ্পাঠীর আয়োজন করেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত 'অনন্তবাসুদেব' মন্দিরটি তাঁরই কীর্তি। বোধ করি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর বাদ দিলে এত ভাল পোড়ামাটির কাজ সারা বাংলাদেশে আজ আর নেই।

শুধু আলমগীর নয়, বাংলার নবাব পৃথকভাবে তাঁকে একটি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন—'শূদ্রমণি'। শূদ্রমণি রামেশ্বর রাজা-মহাশয় একজন নদীয়ার জমিদারকে শেষ মুহূর্তে অর্থসাহায্য করে 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' থেকে রক্ষা করেন। সে আমলে সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে মুসলমান নবাব কীভাবে জমিদারদের 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' করাতেন তা যাঁরা জানেন তাদের বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য, যাঁরা জানেন না তাঁদের না জানানোই মঙ্গল। কল্পনাতেও না হয় সে জাতীয় বৈকুণ্ঠ দর্শন না-ই করলেন।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হচ্ছেন রঘুদেব, এবং রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব আমাদের কাহিনীর যিনি নায়ক তাঁর পিতৃদেব। গোবিন্দদেব স্বর্গলাভ করেন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে—অপুত্রক অবস্থায়। হ্যাঁ, আমাদের নায়ক নৃসিংহদেব জন্মগ্রহণ করেন পিতৃবিয়োগের তিন মাস পরে, যাকে যাবনিক ভাষায় বলে 'পসথুমাস চাইল্ড'।

জন্মের পূর্বেই কিন্তু নৃসিংহদেব ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন। সেটা নবাবী

আমল। সুবে বাংলার মশনদে তখন আসীন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁ। নবাবী আমলে আইন ছিল—কোন ভূম্যধিকারী অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হলে তাঁর সম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। নবাব ঐ অপুত্রক জমিদারের কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করতেন—কখনও বা অন্য কোন পার্শ্ববর্তী জমিদারের সঙ্গে নয়া ব্যবস্থা হত। বলা বাহুল্য, এই সুযোগে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নজরানার প্রাপ্তিযোগ ঘটত।

এক্ষেত্রেও হুগলীর বংশবাটিরাজ গোবিন্দদেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন—এ সংবাদে এ রাজ্য লাটে ওঠাবার আয়োজন হল। তারস্বরে প্রতিবাদ করলেন গোবিন্দদেবের সদ্যবিধবা এবং আসন্নপ্রসবা হংসেশ্বরী দেবী। তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান রঘুদেব দত্ত রওনা না হয়ে পড়লেন দ্রুতগামী ছিপ নিয়ে—কর্তার শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন না হতেই। গঙ্গা বেয়ে উজানে মুর্শিদাবাদ এসে পৌছলেন। কিন্তু নবাব-বাহাদুরের এজলাসে তাঁর এত্তেলাহ পৌছায় না। বহু খরচপত্র করে শেষবেশ হাজার দুয়ারীর আম-দরবারে নবাব-বাহাদুরের সামনে সদ্যোবিধবার আর্জিটি পেশ করলেন—বললেন, হয়তো ইতিমধ্যে পরলোকগত রাজা মহাশয়ের পুত্র সূতিকালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে রাজা হন—'কর্ণেন অন্ধঃ'। কোনও ফল হল না রানীমায়ের আর্জিতে। যেদিন ফরমানে নবাবের সীল-মোহর পড়ল—বংশবাটির জমিদারী রাজ-সরকারে বাজেযাপ্ত করা হচ্ছে—সেদিন নৃসিংহদেব এক সপ্তাহের শিশু। কিন্তু সে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন নবাব বাহাদুরের কানে পৌছলো না। কারণ ছিল। বর্ধমান মহারাজের পেশকার ধূর্ত মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দীকে ইতিপূর্বেই জানিয়ে রেখেছিল—উচ্চতর খাজনার হারে বর্ধমান-রাজ ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত নিতে রাজী—ভালমত নজরানাও দেওয়া হবে হস্তান্তরের সময়। ওদিকে গঙ্গার পরপারের মৌজাগুলি গ্রাস করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে নদীয়াকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্রও নোলা বাড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর দূতও নিত্য ঘুর ঘুর করছে নবাবী মহাফেজখানায়। ফলে আলিবর্দী ফতোয়া জারী করলেন—যেহেতু বংশবাটিরাজ গোবিন্দদেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন, তাই তাঁর সমস্ত জমিদারী নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হল।

রাজ্য দুই টুকরো হয়ে গেল। এক গ্রাস খেলেন বর্ধমানরাজ, অপর গ্রাস নদীয়ারাজ। বিধবার অধিকারে রইল শুধু বসতবাড়ি-সংলগ্ন সামান্য ভূখণ্ড। রাজা নৃসিংহদেবের স্বহস্তলিখিত দিনপঞ্জিকাটি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। পরিণত বয়সে সুপণ্ডিত নৃসিংহদেব লিখেছেন:

"সন ১১৪৭ (অক্টোবর ১৭৪০) সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ-

দেবরায়ের কাল হয় সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মানিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত-পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারীর সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে (এপ্রিল ১৭৪১) মাহ বৈশাখে খামখা দখল করে ও হলফা পরগণা কিসমের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কীসমৎ মজকুর আপন পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল, পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙলার কোন জমিদার ও তালুকদারের উপর এমন বে-আইনসাপী ও বেদারদ কখনও হয় নাই।"

সূতিকালয়ের সেই শিশুটি ক্রমে হল বালক, কিশোর, ক্রমে তরুণ। জ্ঞান বুদ্ধি হলে তিনি বুঝলেন ঐ নিষ্ঠুর সত্যটা—যা তিনি লিখে গেছেন তাঁর দিনপঞ্জিকায় পরিণত বয়সে—'সুবে বাঙলার কোন জমিদার ও তালুকদারের উপর এমন বে-আইনসাপী ও বেদারদ কখনও হয় নাই।' কিন্তু রাগ করবেন কার উপর? ততদিনে সেই অন্যায়কারী আলিবর্দী গিয়েছে কবরের তলায় এবং যার জন্য চুরি করা, সেই তাঁর অতি আদরের দৌহিত্র সিরাজও শুয়েছে মুর্শিদাবাদের খোস্‌বাগে মীরন-এর ছোরার মুঠটুকু সম্বল করে।

গোবিন্দদেবের বিধবা রানী হংসেশ্বরী রাজ্য খুইয়েছেন বটে কিন্তু আশা ত্যাগ করেননি। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল—পুত্র উপযুক্ত হবে অপহৃত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। 'জীজাবাঈ-য়ী' নিষ্ঠায় তিনি পুত্রকে মানুষ করে তুলতে থাকেন। শিবাজীর যুগ গেছে, এখন অশ্বারোহণ আর অসিচালনায় হৃতরাজ্য উদ্ধার হয় না। দেশে এখন কোম্পানির রাজত্ব। এখন বুদ্ধির যুগ। শিক্ষার যুগ। ছেলেকে অতি সযত্নে তিনি শেখালেন নানান শাস্ত্র, নানান ভাষা, নানান আদবকায়দা। তরুণ নৃসিংহদেব সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, এবং যাবনিক ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। সঙ্গীতচর্চা করতেন তিনি নিষ্ঠাভরে—রাগ-রাগিণীর উপর তাঁর মৌলিক আলোচনা আছে। পরিণত বয়সে তিনি 'উদ্দীশতন্ত্র' নামে বাংলা ভাষায় শারীর বিজ্ঞানের উপর বোধ করি প্রথম গ্রন্থটি রচনা করেন—আদ্যন্ত ছন্দোবদ্ধ পদে। ভূকৈলাশের রাজার তরফে 'কাশীখণ্ডে'র অনেকখানি তিনি রচনা করেছিলেন।

কিন্তু সে-সব তো নৃসিংহদেবের পরবর্তী জীবনকথা।

সে-যুগে যেমন হত, আগেই বলেছি—কিশোরকালেই পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন রানীমাতা। বালিকাবধূর নাম মহামায়া। ক্রমে সেও বয়ঃপ্রাপ্তা হল। অনেক কিছু বুঝতে শিখল; বুঝল না শুধু একটি তত্ত্ব—কেন তার স্বামী এমন অশান্ত, অস্থির, অন্যমন। ক্রমে সেকথাও শুনল। বললে, এজন্য তুমি এমন উদাসীন, আনমনা? আমাদের যা আছে তাই তো যথেষ্ট। এই বা কজন পায়?

তরুণ রাজ্যহীন রাজা বলতেন, সে তুমি বুঝবে না বড বউ। তুমি আজ এ-বাড়ির বধূমাত্র, কিন্তু তোমার যে 'রানী মা' হওরার কথা।

পাটরানীকে 'বড বউ' ডাকাই প্রথা। নৃসিংহদেব তাঁর একমাত্র স্ত্রীকে ঐ নামেই ডাকতেন। মহামায়া প্রত্যুত্তর করতেন, কিন্তু সবাই তো আমাকে ঐ নামেই ডাকে—'রানী-মা'।

—সেটা সৌজন্যের খাতিরে। সে-ডাক অন্তঃসারশূন্য। ও তুমি বুঝবে না।

বুঝবে না, বুঝবে না, সবাই বলে—বুঝবে না। সত্যই বুঝতে পারত না মহামায়া। উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, বংশগৌরবে এবং কোষ্ঠী-বিচারের জোরে সে ঢুকে পড়েছে রাজবাড়িতে। যা পেয়েছে, তা যে তার স্বপ্নেরও বেশী। তাই কী পেল না তার হিসাব মেলাতে সে রাজী নয়। কিন্তু ঐ না-পাওয়ার পথ ধরে আরও অনেক কিছু যে হারিয়ে যেতে বসেছে—ও পেল না শান্তি, পেল না তৃপ্তি, পেল না একটি যুবকের অন্তরে নিঃসপত্ন অধিকার। সে বক্ষ-পঞ্জরের আধখানা জুড়ে যে হাহাকার। তার স্বামীর হৃদয়ের সিংহভাগ দখল করে বসে আছে একটা ক্ষোভ, একটা বঞ্চনা, একটা 'বে-আইনসাপী বেদারদী' হাহাকার।

ইতিমধ্যে পালা-বদল হল সুবে-বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে। এল নূতন যুগ, নূতন শাসনকর্তা। ইংরাজ। এল ওয়ারেন হেস্টিংস, ইলাইজা ইম্পে। বিচার কি নেই? একদিন বংশবাটি থেকে নৌকোযোগে যুবক পণ্ডিত এসে উপনীত হলেন প্রাক্তন সুতানটি-গোবিন্দপুরে। শহর কলকাতায়। গঙ্গার উপরেই নূতন কেল্লা। সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন সুবে-বাংলার নূতন ভাগ্যবিধাতা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে। বেনিয়ানের মাধ্যমে যোগাযোগ হল। লাট বাহাদুর দেখা করতে সম্মত হলেন। তখন নৃসিংহদেবের বয়স আটত্রিশ, মহামায়ার ঊনত্রিশ। নেটিভ রাজার দোভাষীর প্রয়োজন নেই শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আরও খুশি হলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে লাট বাহাদুর দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং দয়া-পরবশ হয়ে নয়টি পরগণা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। এর বেশি আমি আর কিছু করতে

পারব না। ইয়াং ম্যান, তোমার সামনে এখন দুটি রাস্তা। হয়—যা পেলে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, ঐ কটা তঙ্কা নাড়াচাড়া করে বাকি জীবনের দু-কুড়ি-সাতের খেলা সাঙ্গ কর, আর না হলে ঐটাকে মূলধন করে লড়ে যাও।

—লড়তে হলে কী করতে হবে?

—মরদ হতে হবে।

নৃসিংহদেব জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পাদপূরণ করেন, লড়তে হলে তোমাকে অর্থসঞ্চয় করতে হবে অন্ততঃ সাত লক্ষ তঙ্কা। বিলাতে গিয়ে দরবার করতে হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সদের এজলাসে বর্ধমান ও নদীয়া রাজের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে হবে।

নৃসিংহদেব জবাব দিতে পারেননি। ফিরে এসেছিলেন নতমস্তকে। মহারাজাধিরাজ বর্ধমান ও নদীয়ারাজ একপক্ষে এবং অপরপক্ষে বংশবাটির রাজ্যহীন রাজা। এ মামলার কথা যে শুনবে সেই হাসবে। তাঁর পিতৃতুল্য দেওয়ানজীও বললেন, ও সব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলে দিন।

রানী মহামায়া জনান্তিকে স্বামীকে বললেন, ওগো, এ যদি অসম্ভবই হয় তবে ও-কথা কেন ভুলে যেতে পারছ না? তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। লোকে পুত্রশোকও ভোলে, আর তুমি ঐ কটা পরগণা হারানোর দুঃখ ভুলতে পারছ না?

নৃসিংহদেব অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এ তুমি বুঝবে না বড় বউ। আর তাছাড়া আমি যে মা-কে কথা দিয়ে রেখেছি!

ততদিনে গোবিন্দদেব রায়ের বিধবা কাশীবাসী হয়েছেন।

তারপর আরও দশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে নৃসিংহদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। স্বয়ম্ভবা মন্দির নির্মাণ করেছেন। আগামীকাল শুভ কার্তিকী অমাবস্যায়, কোজাগরী রাতে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। নৃসিংহদেব স্বয়ং গেলেন কলকাতায় সাহেব-সুবোদের নিমন্ত্রণ করে আসতে।

পাঁচ

মন্দির থেকে রাজবাড়ি দু-শো হাত হয় কি না হয়। তবু এটুকু পথও ছোট রানী-মা পদব্রজে আসতে পারলেন না। রেওয়াজ নেই। কিংখাবে-মোড়া ঘেরাটোপ পাল্‌কিতে চড়ে এসে পৌঁছলেন অন্দর মহলের চিক্-দেওয়া দরজার এপারে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে আয়ী-মা। আর এক টুকরি বোঝাই পদ্মফুল। ছোট রানী-

মার মহালটা দ্বিতলে—পূর্ব দিকে। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়েছে। লাল নীল কাচ বসানো জাফরির কাজ করা ঘেরা বারান্দায় সারি সারি থাশ গেলাস। মোমবাতি জ্বলছে তাতে। আয়ী-মাকে সঙ্গে নিয়ে নূপুর ঝুম্‌ঝুম্ করতে করতে শঙ্করী এসে পৌছলো নিজের ঘরে। সেই দুপুরে মন্দিরে গিয়েছিল মালা গাঁথতে, এতক্ষণে ফিরল। আজ রাত্রে রাজা-মহাশয় তার মহালে সায়মাশে আসবেন। সেজন্য অবশ্য তার চিন্তা নেই। আয়ী-মা পাকঘরে সে-সব আয়োজন করে রেখেছে। ওর কাজ পাখা হাতে রাজা মহাশয়কে ব্যজন করা। কার্তিক মাস, হাওয়া করারও প্রয়োজন নেই। তবে সেটাই নাকি প্রথা।

ঘরের পর্দা সরিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেল শঙ্করী এবং আয়ী-মা। শয়ন-কক্ষের চেহারাখানাই পালটে গেছে এক দুপুরে। ওর প্রকাণ্ড পালঙ্কে থরে থরে ফুলের মালা—গোছা গোছা ফুল। দু-জন কিঙ্করীর সাহায্যে মহামায়া একটা মালা টাঙিয়ে দিচ্ছিলেন—ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন: আয় রে ছুটকি! আমাদের সাজানোও এইমাত্র শেষ হল।

শঙ্করী অবাক হয়ে বলে, এসব কী বড়দি?

সেটা কানে কানে বলব। আয় দেখি, তোকে সাজাতে হবে।

কিঙ্করীদের দিকে ফিরে বলেন, এবার তোরা যা। তোদের ছুটি।

ওদের মধ্যে একজন প্রগল্‌ভা কানাইয়ের-মা ফস্ করে বলে বসে, বলতিছ, যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার আসব ছোট মা। শয্যা তুলুনী আদায় করতে।

শঙ্করী মাথাটা তুলতে পারে না। মহামায়া একটা হাতপাখা নিয়ে ওদের তাড়া করেন।

আয়ী-মা কিন্তু স্থানত্যাগ করেনি। বললে, হ্যাগা বড়রানী! আমার যে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না গো! তোমারে আমরা নেমন্তন্ন করি নাই। আর তুমি অযাচ্‌ এসে ফুলশেয সাজালে!

মহামায়া মুখ টিপে হেসে বলেন, পেৎনি যে! না ডাকলেও আমরা আসি।

আয়ী-মা বড়রানীর হাতখানা তুলে নিয়ে বলে, আমারে মাপ কর বড় বৌমা। আমি তোমারে চিনতে পারি নাই।

মহামায়া কথা ঘোরান। বলেন, ওসব বাজে কথা থুয়ে একটা কাজ কর দিকিনি। শম্ভুকে বল, আমার ঘরে কর্তার গড়গড়াটা আছে, নিয়ে আসতে। আর মিশিরের কাছে ভাল তম্বুরী তামাক আছে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

আয়ী-মা একগাল নিদন্ত হাসি হাসল। বললে, তাহলে ছোট-মারে

সাজানোর ভারটা তুমিই নিচ্ছ তো?

—নেব না? ঐ ত্যাখ না। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আয় ছুটকি, তোর চুলটা পালটে বেঁধে দিই।

ঘরের ও-প্রান্তে বড়মা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন প্রসাধন দ্রব্য।

আয়ী-মা নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নেয়।

শঙ্করীর দু'চোখ জলে ভরে আসে। নত হয়ে বড়দির পদধুলি নেয়। মহামায়া ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলেন। বলেন, আমার জন্যই তোর ভয় ছিল, না রে পাগ্‌লি? কিন্তু আমি তো শুধু তোর বড়দি নই, আমি যে তোর মা!

এক প্রহর রাতে সজ্জাপর্ব সমাপ্ত হল। যাম ঘোষণা করল বংশবাটির শিবাকুল। অনন্ত বাসুদেব মন্দির থেকে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল বাতাসে। ছোটরানীর ঘরে বিলাতী ঘড়িটা সঙ্কেত জানালো রাত নয়টা বাজে। কিছুক্ষণ আগে শম্ভুচরণ গড়গড়া-তামাক, পান-গুবাক সব কিছু সাজিয়ে রেখে গেছে এবং সংবাদ দিয়ে গেছে—রাজা-মশায়ের নৌকা এইমাত্র ফিরে এসেছে শহর কলকাতা থেকে। সাত রাজ্য নিমন্ত্রণ সেরে রাজা-মশাই তাঁর মহালে গিয়েছেন। একটু পরেই তিনি নৈশ-আহারে আসবেন। বড ঠাকুর ইতিমধ্যে রেখে গেছে আহার্যপাত্র—প্রকাণ্ড রূপার থালায়। মহামায়া তাবের জালতি দেওয়া ঢাকনাটা খুলে শঙ্করীকে নির্দেশ দেন: একটু নজর রাখবি ছুটকি, সোনামুগের ডাল দিয়ে যেন গুচ্ছেক না খেয়ে ফেলে। আজকাল ওর খাওয়া কমে গেছে তো! তিন রকম মাছ আছে, আর আছে মহাপ্রসাদ—ঐ জামবাটিতে। ঐ থালায় আছে পাঁচ রকমের ভাজা। এটা পায়েস—আগে যেন এটা একটু মুখে দেয়, ভোগের পায়েস। মিষ্টান্নের থালায় আছে জনাইয়ের মনোহরা, ধনেখালির খইচুর, চন্দননগরের তাল-শাঁস সন্দেশ। আর ঐ বড় মিষ্টিটা—

শঙ্করী বাধা দিয়ে বলে, তুমিও থেকে যাও না বড়দি। খাইয়েদাইয়ে বরং—লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারে না।

ম্লান হাসলেন মহামায়া: দূর পাগ্‌লি! আমাকে এখানে দেখলেই ও লজ্জা পাবে। সুর কেটে যাবে। শোন্, ঐ বড় মিষ্টিগুলো নিশ্চয় খাওয়াবি। ওগুলো শ্রীরামপুরের 'গুঁফো সন্দেশ'। ও খুব ভালবাসে।

হঠাৎ শঙ্করী তার বড়দির হাতটা টেনে নিয়ে বললে, আমার ভয় করছে!

মাটিতে ধপাস করে বসে পড়েন মহামায়া: এই ত্যাখ কাণ্ড! হ্যাঁ রে! ভয় আবার কিসের? ষোলো বছরের ধিঙ্গি মাগী! তোর লজ্জা করে না ওকথা

বলতে ? আমাকে মাত্র তেরো বছর বয়সে ও—

শঙ্করী তার জননীপ্রতিম বড়দির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, থাক।

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠেন মহামায়া।

রাজা-মহাশয় যখন ছোটরানীর শয়নকক্ষে এলেন রাত তখন দশটা।

মহামায়া তার আগেই প্রস্থান করেছেন। আয়ী-মাও নেই। ছোটরানীর খাস-দাসী মোতির-মা আলো ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাঁকে। ঘরে ঢুকল না সে। চৌকাঠের ও-প্রান্তেই দাঁড়িয়ে রইল চিক্‌টা তুলে ধরে।

প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা-মহাশয়। একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন। এমন ফুলে ভরা শয়নকক্ষের এ-টিই অর্ঘ। জীবনে দু-দুবার তিনি প্রবেশ করেছেন এমন কক্ষে। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে তাঁর নজর পড়ল গৃহ-স্বামিনীর উপর। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি দেখতে থাকেন ওকে। যেন ফুলশয্যা রাত্রে আজ প্রথম দেখছেন ঐ অনিন্দ্যকান্তি দেবী প্রতিমাকে।

মুহূর্তের বিহ্বলতাকে জোর করে জয় করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল শঙ্করী। বড়দি যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল ঠিক তেমনি করে বসে পড়ল রাজা-মশায়ের সম্মুখে, হাঁটু গেড়ে। মুক্তার ঝালর-জড়ানো খোঁপাসমেত মাথাটা সে নামিয়ে রাখতে গেল স্বামীর চরণে।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দু পা পিছিয়ে গেলেন রাজা-মহাশয়। বললেন, না। আমাকে প্রণাম করো না।

চমকে উঠল শঙ্করী। রাজা মশায়ের মুখের উপর আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলে, কেন ?

রাজা-মশাই কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

শঙ্করী এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কোন জবাব না পেয়ে আরও অবাক হল। কিন্তু স্বামীর চরণে মাথা নত করার অধিকার যে তার অনস্বীকার্য। পুনরায় সে নত করতে গেল তার মাথা স্বামীর যুগ্মচরণে।

হঠাৎ রাজা-মশাই দু-হাত বাড়িয়ে ওর দুটি কাঁধ ধরে ফেললেন। ধীরে ধীরে বিহ্বল শঙ্করী উঠে দাঁড়ালো। ওর মনে পড়ে গেল—মাত্র তিন ঘণ্টা আগে এই একই ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে। আরও একজন ওর উদ্যত প্রণাম গ্রহণ করেন-নি। কিন্তু তার হেতু তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ?

অনিন্দ্য-তনু ষোড়শীর নিকট-সান্নিধ্যে রাজা-মশায়েরও খেয়াল হল না—এ গন্ধ পদ্মফুলের, না পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌরভ! উনি দেখলেন, শঙ্করী দাঁড়িয়ে আছে ওঁর অতি নিকটে। তার দুটি নয়ন মুদে আছে, সে থরথর করে কাঁপছে।

তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে—যেন অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত পশ্চিম দিগ্‌বলয়। যেন সে জানে, পরমুহূর্তেই অনিবার্যভাবে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য চুম্বন করবে পশ্চিম দিগন্তসীমা।

নিমীলিত নেত্রেই শঙ্করী অনুভব করল পর পর কি ঘটে গেল। রাজা মশায়ের দুটি হাত সরে গেল ওর দুটি বাহু থেকে। যে তপ্ত নিঃশ্বাস স্পর্শ করছিল ওর ললাট সেটা স্তব্ধ হল। ওর অধরোষ্ঠ প্রত্যাশিত স্পর্শ পেল না। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো শঙ্করী। দেখল, রাজা-মশাই বসে আছেন তার পালঙ্কে। যথেষ্ট দূরে।

সংযত করল নিজেকে। কেন এভাবে সুর কেটে গেল জানে না। রাজা-মশাই কি ভুলতে পারছেন না তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে? তাঁর কি ধারণা—অন্তরীক্ষ থেকে সেই বড়রানী লক্ষ্য করছেন ওদের ব্যবহার? প্রণাম তিনি নিলেন না, ওর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উপেক্ষা করে—

—এ কি! এত আহারের আয়োজন করেছ কেন? জান না, আগামীকাল আমাকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে? যজ্ঞ করতে হবে?

বিহ্বল শঙ্করী বললে, তাই কি? তাতে আজ রাত্রে—

—বাঃ! আজ রাত্রে সংযম না করলে কাল যজ্ঞ করব কেমন করে? তুমি ঐ পায়েসের বাটি আর মিষ্টান্নের পাত্রটা বরং ওদিকে সরিয়ে দাও।

সংযম! তাই তো! একথা কারও খেয়াল হল না কেন? ছি-ছি-ছি! শুধু পলান্ন, মৎস্য আর মহাপ্রসাদই তো নয়—ওর পালঙ্কের চারধার ঘিরে ঐ পুষ্পসম্ভারও যে তাহলে একটা নিদারুণ প্রহসন। কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! বিদ্যুৎচমকে একবার মনে হল—বড়দি কি এটা জানত? তাই কি ষড়যন্ত্র করেছে! না না না! এ অসম্ভব! এত বড় নৃশংস সে নয়। হতে পারে না।

পরদিন প্রাতে মোতির-মা যখন বিছানা তুলতে এল তখনও চুপ করে বসে আছে শঙ্করী তার পালঙ্কের উপর। সমস্ত রাত জেগেছে আর কেঁদেছে। ওর কেন যেন মনে হয়েছে—ঐ সংযমের কথাটা একটা অছিলা। সংযম করতে হলে কি প্রণামও নিতে নেই? আর সব চেয়ে যে ব্যথাটা বুকে বিঁধছিল সেটা এই: মহামায়া কি সব কিছু জানত? ওর জীবনের এই দ্বিতীয় ফুলশয্যাও যে শেষ-বেশ প্রহসনে পরিণত হবে সে-কথা জেনেই কি সে এসেছিল সতীনকে সাজাতে? আচ্ছা—ওরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে এটা করেনি তো? একটা নির্মম কৌতুক।

নাঃ, অসম্ভব! বড়দির কথা ও বলতে পারবে না, কিন্তু রাজা-মহাশয় এত বড় পাষণ্ড নন। আর তা ছাড়া সে যে দেখেছে তাঁর মুখচোখে কামনাঘন প্রত্যাশার অনুরণন!

মোতির-মা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। নিষ্পেষিত ফুল ছড়িয়ে আছে সারা ঘরময়—মোতির-মা তো জানে না যে, শঙ্করীই তা টেনে-টেনে ছিঁড়েছে! মুখ টিপে হেসে মোতির-মা বললে, ব্বাস রে! তোমরা দুজনে কি রাতভোর লড়াই করেছিলে নাকি?

শঙ্করী দাঁতে দাঁত টিপে নীরব রইল। স্বীকার করতে পারল না—রাজা-মহাশয় এ ঘরে আদৌ রাত্রিযাপন করেননি। মোতির-মা প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখার দিকে ইঙ্গিত করে আবার বললে, তা হ্যাঁ ছোটরানী মা, পিদিম এখনও জ্বল্‌তিছে কেনে গো! রাতভোর তোমরা ঘুমাওনি নাকি?

সমস্ত রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত শঙ্করী শুধু বললে, যা এখন, দিক্ করিস না।

—ঈস্! বইকি! শয্যা-তুলুনি পাব্বনি নেব না?

একটু পরে এল আয়ী-মা। কানে কানে বললে, ভোর-রেতেই পাইলেছে দেখছি। তোরে বলে-কয়ে গেছে তো? না মধুটুক্ খায়েই ভাগিছে?

শঙ্করী নেমে পড়ে পালঙ্ক থেকে। দিন কারও জন্য বসে থাকবে না। আয়ী-মাকে নির্জলা মিথ্যা বলতে বাধল। সত্যটাও স্বীকার করতে পারল না। বললে, না। যাবার আগে আমাকে বলেই গেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি আয়ী-মার কাছে তবু অত সহজে পার পাওয়া গেল না। শঙ্করীকে ভাল করে দেখে বললে, তা হ্যাঁ রে ছুটকি, তবে অমন উসকু-খুসকু লাগে কেন?

এবারও ত্রিধক সত্যভাষণ করল শঙ্করী: সারারাত ঘুম হয়নি যে!

দন্তহীন হাসি হাসল আয়ী-মা: তাই বল্ কেনে!

তবু ধরা পড়তে হল। যেখানে সব চেয়ে ব্যথা, সব চেয়ে সঙ্কোচ সেখানেই। নির্জন ঘরে ঝড়ের মত ঢুকল মহামায়া। প্রথম আঘাতেই ভেঙে দিল ওর সব ছলনা। শঙ্করীকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, বিশ্বাস কর, ছুটকি! আমার একেবারে খেয়াল ছিল না।

—কী? কি খেয়াল ছিল না?

—আমি জানি রে! আমার কাছে লুকাতে পারবি নে। কিন্তু এক রাতে তো শীত যায় না। ও পালাবে কোথায়? আজ রাত আসবে, কাল আসবে—সারাটা জীবনই তো পড়ে আছে! ও তো আর সন্ন্যাস নেয়নি!

শঙ্করী আর দ্বিধা করেনি। প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু উনি আমার প্রণামটাও

নিলেন না কেন?

—প্রণাম নিল না? মানে?

অকপটে সব কথা খুলে বলেছিল শঙ্করী। সব শুনে মহামায়া বললে, কী জানি বাপু। এ ধাঁধার অর্থ আমিও বুঝছি না। ঠিক আছে, আজ সুযোগ হবে না। আজ মচ্ছব। কাল-পরশু ব্যাপারটা জেনে নেব। তুই কিছু ভাবিস না ছুটকি। আমি তো আছি।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নেপথ্যে যে কী নিদারুণ বজ্র উদ্যত হয়ে প্রহর গুনছিল তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শঙ্করী। আকাশ বিদীর্ণ করে সেই বিনা-মেঘের বজ্র যখন সশব্দে নেমে এল তখন বজ্রাহতই হয়ে গেল বেচারী। বুঝে উঠতে পারল না—এটাও কি পূর্বপরিকল্পিত? মহামায়ার কারসাজি? সে কি সব জেনে বুঝেই শঙ্করীকে নিয়ে ক্রমাগত খেলছে—কজ্জার মধ্যে পাওয়া ইঁদুর-ছানাকে নিয়ে বেড়াল যেমন খেলে! সতীন! কথাটা শুনলেই একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মহামায়া কি এত বড় প্রবঞ্চক! এত নির্মম? এত বড় অভিনেত্রী?

পরদিন সন্ধ্যায় আবার যখন সে শঙ্করীকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, 'ছুটকি! বিশ্বাস কর্—এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই। আমি এ-কথার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না।'—তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শঙ্করী। হ্যাঁ-না কোন কথাই বলতে পারল না।

নিজ বাহুবন্ধ থেকে ওকে মুক্ত করে হঠাৎ মহামায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো।

বললে, তুই বিশ্বাস করেছিস, এটা আমারই ষড়যন্ত্র। নয়?

শঙ্করী শুধু বলেছিল, কী দরকার বড়দি, ও সব অপ্রিয় আলোচনায়? আমি অনাথা। তোমরা আশ্রয় দিয়েছিলে তাই এতদিন প্রাণে বেঁচে আছি। তুমি জোর করে আমার বিয়ে দিলে, তাই সিঁথেয় সিঁদুর পরছি। আজ তাড়িয়ে দিচ্ছ, চলে যাচ্ছি। ব্যস্। ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে, রাজবাড়ির ষড়যন্ত্রের কথা আমি কেন ভাবতে যাই?

ওর কাঁধ থেকে বড়রানী হাত দুটি সরিয়ে নেয়। সাত চড়ে শঙ্করী রা কাটে না। আজ এমন কথা যখন সে বলেছে—মহামায়া বুঝতে পারে—তখন সে বিশ্বাস করেছে এর পিছনে বড়রানীর হাত আছে। গম্ভীর ভাবে বললে, তুই কি যাবার আগে আমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিস ছুটকি?

—না। তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাক। স্বামীসেবার অধিকার পেলাম না,

আশীর্বাদ কর, যেন শাশুড়ীসেবার অধিকারটুকু পাই।

নত হয়ে প্রণাম করেছিল ওব বড়দিকে। মহামায়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েই রইল শুধু। বুঝল, দুরন্ত অভিমানী মেয়েটা স্বীকার করে গেল না কিছুই।

পরদিন নৌকাযোগে রওনা হয়ে পড়ল শঙ্করী—সুদূর কাশীধামে। দুটি বজরায়। একটি ছোট-রানীমার জন্য। সেখানে আছে সশস্ত্র পাহারা। ভৈরব ঘোষকে সঙ্গে দিয়েছেন রাজা-মশাই। দ্বিতীয় বজরায় গুটি তিন-চার বিধবা, আরও কারা সব। তাঁরা এই সুযোগে রাজা-মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় তীর্থ-দর্শনে চলেছেন শঙ্করীর সম্পর্কে এক পিস-শাশুড়ীও যাচ্ছেন—বালবিধবা তিনি। চলেছেন ভাই-বোকে দেখতে। স্বয়ম্ভরা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেই কাশীধাম থেকে সংবাদবহ এসেছে দুঃসংবাদ নিয়ে—রানী হংসেশ্বরী মরণাপন্ন অসুস্থা। তিনি শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন—৺গঙ্গাপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে দেখে যাবেন।

সবচেয়ে অবাক-করা খবর বিদায়মুহূর্তে রাজা-মহাশয়ের অনুপস্থিতি। কী একটা জরুরী কাজে তিনি প্রত্যুষেই অশ্বপৃষ্ঠে কোথায় যেন রওনা হয়ে গেছেন। যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে। শঙ্করী যেন পাষাণ হয়ে গেছে। এ সংবাদেও তিলমাত্র বিচলিত হল না সে। অপরাধবোধ? কিন্তু শঙ্করী তো কোনও অভিযোগ আনেনি। সে তো একবারও বলেনি—অন্তত একটি রাত তাকে এ রাজবাটিতে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক—এমন একটি সার্থক রাত্রি যেটা যজ্ঞারম্ভের পূর্বরাত্রির অজুহাতে নিষ্ফলা হবে না। একবারও বলেনি, দীর্ঘ তীর্থ-যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীর চরণধূলি সীমন্তে তুলে নেবার অধিকার তার অনস্বীকার্য—ভারতীয় হিন্দু সতীসাধ্বী নারীর সে অধিকার কোন রাজা-মহারাজের খেয়ালখুশির উর্ধ্বে। তাহলে এভাবে পালিয়ে যাবার অর্থ কি?

ছয়

অবাক মহামায়াও বড় কম হয়নি। রাজা-মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবহারে। শুধু ছোটরানী নয়, এই কয়দিন তিনি মহামায়ার কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্দর-মহলে আদৌ আসেননি। শঙ্করীর বজরা গঙ্গার বাঁকে মিলিয়ে যাবার পর মহামায়া রাজা-মহাশয়ের খোঁজ করেছিল। কিন্তু তিনি বা'র-মহালেও নেই। বস্তুত তিনদিন তিনি অনুপস্থিত থাকার পর রানী-মা ডেকে পাঠালেন দেওয়ানজীকে।

না, রঘু দত্তকে নয়। দেওয়ান রঘুনাথজী গোবিন্দ দেবরায়ের আমলের লোক। অশীতিপর বৃদ্ধ অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। জমিদারীর যা অবস্থা তাতে নূতন দেওয়ান কেউ নিযুক্ত হননি। তবু দেওয়ানজীর পৌত্র দিলীপ দত্ত রাজবাড়ির কাজকর্ম দেখে। বেতন নেয় না—দেবার ক্ষমতাও নেই রাজসরকারের। তবে নাকি দত্তরা বংশানুক্রমে বংশবাটিরাজকে সেবা করে এসেছে—এখনও নিষ্কর জমি ভোগ করে, তাই দিলীপ নামমাত্র সম্মানমূল্য নিয়ে রাজবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগটা রেখেছে। তাকেই গৌরবে 'দেওয়ানজী' বলা হয় এখন।

রানী-মায়ের আহ্বান পেয়ে দিলীপ দত্ত এল রাজবাড়ির মাঝ-মহালে। চিকের আড়ালে বসে বড়রানীমা প্রশ্ন করলেন, রাজা মহাশয় আজ তিনদিন অনুপস্থিত। তিনি কোথায় গেছেন কেউ জানে না। আপনি কিছু জানেন?

দিলীপ চিকের পর্দার দিকে তাকিয়ে বললে, জানি রানী-মা। রাজা-মহাশয় আমার পিতামহকে বলে গেছেন। তাঁর কাছেই শুনেছি। তিনি শহর কলকাতায় আছেন।

—কেন? কবে ফিরবেন?

—উনি কোম্পানির রাজ-সরকারে চাকুরি নিয়েছেন। আছেন কেল্লার ভিতর। সেখানেই থাকবেন আপাতত। সপ্তাহান্তে বা ছুটিছাটায় বংশবাটিতে আসবেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামায়া: চাকুরি নিয়েছেন! রাজা-মহাশয়! কেন?

দিলীপ সবিনয়ে বলে, আমার ধারণা ছিল রাজা-মহাশয় অন্তত আপনাকে সে-কথা বলে গেছেন। এখন দেখছি, আমার ধারণা ভ্রান্ত। সে যাই হোক—কথাটা আপনার জানা দরকার। এ-কথা বস্তুত আমি রাজা-মহাশয়ের কাছ থেকে স্বকর্ণে শুনিনি। তিনি শুধুমাত্র তাঁর দেওয়ানজী, অর্থাৎ আমার পিতামহকে বলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। সবই বিস্তারিত জানাচ্ছি, তবে সংবাদটা গোপন রাখবেন। বুঝতেই পারছেন, রাজা-মহাশয় চান না এ কথা আপাতত জানাজানি হোক।

—আপনি বলুন।

দিলীপ দত্তের কাছে যে তথ্য পাওয়া গেল তা সংক্ষেপে এই রকম:

রাজা-মহাশয়ের অন্তরের সেই আকৈশোর-লালিত সুপ্ত বাসনা—পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করা, কোনদিনই মরেনি। উনি সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চয়ের জন্য বদ্ধপরিকর। যেমন করেই হোক ঐ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে তিনি কালাপানি পার হবেন। অজানা অচেনা ইংলণ্ডে উপনীত হয়ে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার্স-এর এজলাসে বর্ধমান তথা নদীয়া-রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন। তাঁদেরই

প্ররোচনায় আলিবর্দী খাঁ এরকম 'বে-আইনসাপী এবং বেদায়ত' ফরমান জারি করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর সেই কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। সাত লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করা প্রায় অসম্ভব—তাই দীর্ঘদিন ওটার কথা ভুলে ছিলেন। মহামায়াও ক্রমাগত তাঁকে ঐ চিন্তা থেকে দূরে রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই সুপ্ত বাসনা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বয়ম্ভরা ৺মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে সাহেব-সুবোদের নিমন্ত্রণ করতে তিনি নৌকাযোগে কলকাতায় এসেছিলেন। স্বয়ং লাট-বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটাও ঘটে গেল। কলকাতায় একজন উচ্চতম মহলের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বলে ওঠেন, কী সৌভাগ্য রাজা মহাশয়! আপনি স্বয়ং এসে পড়েছেন। আপনাকেই খুঁজছিলাম আমরা!

কী ব্যাপার? জানা গেল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে একজন আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী তার অন্তিম বাসনা হিসাবে বংশবাটির রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে। সামান্য মানুষ—তবু ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য ওঁরা বংশবাটিতে সংবাদবহ পাঠাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত। অগত্যা কেল্লার ভিতর ফাঁসির আসামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হল।

ঐ সূত্রে লাট-বাহাদুরের সঙ্গে নৃসিংহদেবের পরিচয় হল। সুযোগ বুঝে নৃসিংহদেব তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন।

লাট-বাহাদুর জানালেন, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন বটে, তবে অন্য কাজের জন্য স্বয়ং যেতে পারবেন না। তাঁর তরফে তাঁর কোনও প্রতিভূ নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে যাবে। রাজা-মহাশয়ের সঙ্গে সরাসরি ইংরাজিতে কথা বলে লাট-বাহাদুর অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তিনি অতঃপর একটি প্রস্তাব রাখেন, এবং রাজা-বাহাদুর সে দুর্লভ সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন।

লাট-বাহাদুর বলতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ। ওয়ারেন হেস্টিংস দেশে ফিরে গেছেন। নব নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁর রাজত্বের একটি মানচিত্র প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন। তাতে কোন্ জমিদারের কতটা অংশ আছে তা দেখানো হবে। মানচিত্র আঁকবে ইংরাজ-আমীন ও নকশা-নবীশ—তাদের বলে রাইটার্স। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লেখা দলিল তারা পড়তে পারে না। দলিল-বর্ণিত ভূখণ্ডের সীমা-রেখা বুঝে উঠতে পারে না। তাই আরবী-ফারসী-সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা জানা কোন একজন পণ্ডিতকে খোঁজা হচ্ছিল—যে শুধু

ভাষাবিদ্ নয়, জমিদারী সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বোঝে। এ কাজের জন্য নৃসিংহদেব ছিলেন আদর্শ প্রার্থী। জমিদারী সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ, আইনগঠিত লবজ তাঁর ওষ্ঠাগ্রে, সব কয়টি ভাষাই তাঁর আয়ত্তে। ভূমিরাজস্ব এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ আধ ঘণ্টার মধ্যে বুঝে নিলেন নৃসিংহদেবের মত মানুষই তিনি খুঁজছিলেন। নৃসিংহদেব তাই মন্দির প্রতিষ্ঠা শেষ হতেই চলে গেছেন শহর-কলকাতায়। কেল্লার ভিতরেই আছেন তিনি।

ছুটি-ছাটায় নৃসিংহদেব বংশবাটিতে আসেন। দু একদিন কাটিয়ে ফিরে যান কর্মস্থলে। মহামায়া বেশ অনুভব করেন—আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছেন রাজা-মহাশয়। কেন এই প্রৌঢ় বয়সে তিনি কোম্পানীর চাকুরি গ্রহণ করলেন সে বাহুল্য প্রশ্নটা আর জিজ্ঞাসা করলেন না মহামায়া—সেটা তো জানাই আছে, সেই পিতৃরাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন। কিন্তু আর একটি দুরন্ত কৌতূহল তিনি কেমন করে দমন করেন? তাই প্রশ্ন করেছিলেন, একটা কথা আমাকে সত্যি করে বলবে? কেন অমন করে ছুটকিকে তুমি ত্যাগ করলে?

—ত্যাগ করলাম? সে তো মায়ের কাছে গেল।

এবার মহামায়া এমনভাবে স্বামীর দিকে তাকালেন যে, রাজা-মশাই বুঝতে পারেন তাঁর প্রত্যুত্তরটা নিতান্তই ফাঁকি—তা দুজনকেই বুঝেছেন। বললেন, কী করব বল বড়বৌ। মায়ের মরণাপন্ন অসুখ...

—কিন্তু তুমি তো জানতে, এখান থেকে নৌকায় কাশী যেতে প্রায় দু-মাস লাগবে। মা যদি দু মাস অপেক্ষা করতে পারেন, তবে দু-মাস একদিনও পারতেন? 'সংযম-রাত্রি'র অজুহাতে তুমি সেদিন ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে—কিন্তু তুমি তো জানতে, তার প্রতি তোমারও কর্তব্য আছে। বল, আমি কি কিছু ভুল বলছি?

রাজা-মহাশয় নীরবে অধোবদনে বসেই থাকেন। মহামায়া হেসে বলেন, রাজ্য না থাক, তুমি তো দেশের রাজা। সংসারের মধ্যেই যদি তুমি...

—থাক বড়বৌ। এ আলোচনা বন্ধ কর।

—কেন? তুমি কি বুঝতে পার না—ছুটকি কী ভাবল?, সে এই বিশ্বাস নিয়ে গেছে যে, এ আমার ষড়যন্ত্র। আমি দুঃখ পাব বলেই তুমি তাকে—

—কিন্তু কথাটা তো মিথ্যা নয়। আমি যখন ছোটরানীকে পড়াতাম তুমি বসে পাহারা দিতে।

চিৎকার করে উঠেছিলেন মহামায়া: না! এভাবে আমাকে ঠকাতে পারবে

না। তুমি জানতে, আমার সে মনোভাব শেষ পর্যন্ত ছিল না। না হলে আমি ছুটকিকে ওভাবে সে রাত্রে সাজাতে বসতাম না।

নৃসিংহদেব জবাব দিলেন না। কিন্তু মহামায়া থামতে রাজী নন। বলেন, কী হল? বল, কী তোমার কৈফিয়ৎ?

—কীসের কৈফিয়ৎ বড়বৌ? মা মরণাপন্ন অসুস্থ। ছোটরানীকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এতে কৈফিয়তের কথা উঠছে কোথায়?

মহামায়া স্বামীর অন্তস্তলে একবার দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করলেন। যে হৃদয়টি এতদিন স্ফটিকস্বচ্ছ মনে হত আজ তাকেই মনে হল দুর্ভেদ্য রহস্যময়। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, বেশ, অন্তত এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বল—সে রাত্রে কেন ছুটকির প্রণাম নাওনি? স্পর্শদোষ এড়াতে তুমি ওকে অন্তত দূর থেকে প্রণাম করতে বলতে পারতে।

রাজা মহাশয় অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, বড়বৌ, প্রত্যেকের জীবনেই এমন কোন গোপন কথা থাকে, যা কাউকে বলা যায় না। এ তেমনই একটা কথা।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল মহামায়ার। বললেন, কিন্তু আমি যে তোমার সহধর্মিণী। আমার কাছে তোমার কোনও কথাই তো গোপন থাকতে পারে না!

—পারে। ছোটরানীও আমার সহধর্মিণী। তোমার সব গোপন কথা—যা স্বামী হিসাবে আমি জেনেছি—তা কি তার কাছে বলতে পারি? বল?

মহামায়া চুপ করে যান। বলেন, ঠিক আছে। চল এবার শুতে যাই। রাত অনেক হল।

—তুমি শুয়ে পড় বড়বৌ। আমি আমার ঘরে ফিরে যাব। রাত জেগে কিছু পড়াশুনা করতে হবে। দিবাভাগে তো সময়ই পাই না।

চমকে ওঠেন মহামায়া। বলেন, কাল বুঝি তোমার কোনও যজ্ঞ আছে? আজও সংযমরাত্রি?

রাজা-মহাশয় ফিরে যাবার জন্য দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন। ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, বড়বৌ, একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। ওটা আমার একটা বেদনার স্থান। বারে বারে ওটাকে মাড়িয়ে দিও না।

মহামায়া প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজা-মহাশয় প্রস্থান করেন।

বদলে গেছেন, সম্পূর্ণ বদলে গেছেন নৃসিংহদেব। শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও।

সপ্তাহান্তে বাড়ি আসেন। মহামায়ার সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তা হয়। কিন্তু এতদিনে তাঁর বুঝি বৈরাগ্য এসেছে, বার্ধক্য এসেছে। মহামায়া বুঝতে পারেন —তিনি সব পেয়েও সব কিছু খুইয়েছেন, আর সেই হতভাগী সব কিছু খুইয়েও সব পেয়েছে। কেন, কী বৃত্তান্ত বুঝতে পারেন না—কিন্তু বেশ অনুভব করেন রাজা-মহাশয় কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই বাসরশয্যার প্রত্যাখ্যাতা নায়িকাটিকে।

চার্লস ফার্স্ট মারকুইস অব কর্ণওয়ালিশ নৃসিংহদেবের প্রায় সমবয়সী—মাত্র দু বছরের বড। রাজ্যহীন এই দেশীয় রাজাটির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ-দৃষ্টি বর্ষিত হল। ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্বে একটা রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তিনি ভাবছেন। এ নিয়ে আলোচনা করার মত মানুষ পান না—সবাই যে যার স্বার্থ অনুযায়ী জবাব দেয়, কখনও তাঁকে খুশি করতে অন্যায় জেনেও তাঁর প্রস্তাবে সায় দেয়। এই সমবয়সী বংশবাটির রাজার মধ্যে তিনি একজন খাঁটি মানুষের সন্ধান পেলেন। তাই কাজের অবকাশে মাঝে মাঝে তাকে ডেকে পাঠাতেন। খোস গল্প করতেন। কখনও শোনাতেন ইটন ও কেম্ব্রিজের ছাত্র জীবনের কথা, কখনও বলতেন মার্কিন মুলুকে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী—ক্যামডেন, গিলফোর্ডের রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা। যদিও কর্ণওয়ালিশ আমেরিকান কলোনীবাসীদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ট্যাক্স নির্ধারণের বিপক্ষে ছিলেন, তবু যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠল তখন মেজর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ সাগরপাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায়—প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে অংশ নিতে। সেই সব গল্পই বলতেন। ভারত সাম্রাজ্যের গভর্নর জেনারেল এবং বংশবাটির সিংহাসনহীন রাজার মধ্যে সামাজিক প্রভেদটা ছিল আসমান জমিন, কিন্তু খেয়ালী লাট-বাহাদুর ফরাসী শ্যাম্পেনের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদটা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। অমনই এক খোশমেজাজী অবকাশে নৃসিংহদেব অকপটে খুলে বললেন তাঁর বঞ্চনার ইতিহাস। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। তারপর বললেন, তুমি কী করবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম তবে সর্বস্ব পণ করে আমি পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করতাম।

—কিন্তু তার পূর্বে যে সাত লক্ষ টংকা সঞ্চয় করতে হবে।

—কর। কিন্তু তাহলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমাকে পথে বার হতে হবে। বসতবাড়ির নিশ্চিন্ত চৌহদ্দিতে বসে স্বপ্ন দেখা যায়—জীবনসংগ্রাম করা যায় না। এই দেখ না আমাকে। জন্মেছি লণ্ডনে, লড়েছি আমেরিকায়, শাসন করছি

ভারতবর্ষ।

'তুত্তোর' বলে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহদেব। নাঃ, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখতেই হবে। ইস্তফা দিলেন চাকরি থেকে। সেটা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। বৃদ্ধ দেওয়ানজী, দিলীপ আর নায়েব রতিকান্তকে ডেকে বললেন, আমি ভাগ্যান্বেষণে বিদেশযাত্রা করছি। আপনারা সংসারের দায়িত্ব নিন। যতদূর সম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ করুন। চার লক্ষ তঙ্কা পুঁজি আমি রেখেই যাচ্ছি। এ অর্থ যেদিন সাত লক্ষ হবে তখন আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করব। বৃদ্ধ দেওয়ানজী বললেন, আমি হয়তো ততদিন থাকব না, তবে রতিকান্ত থাকবে, দিলীপ থাকবে।

কিন্তু সম্মত হলেন না রানী মহামায়া। বললেন, কী হবে গো রাজ্য উদ্ধার করে? তুমি যদি এভাবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাও তবে আমি কী নিয়ে বাঁচব? তুমি আজ বাহান্ন বছরের বৃদ্ধ, ধর সারাজীবন লড়াই করে তুমি পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারও করলে, কিন্তু ভোগ করবে কে?

উদাসীনভাবে নৃসিংহদেব বললেন, শাস্ত্র বলছেন—যখন ধর্মসঞ্চয় করবে তখন মনে রেখ, আগামীকালই তোমার মৃত্যু হতে পারে, আর যখন অর্থসঞ্চয় করবে তখন মনে কর—তুমি অজর-অমর।

ইতস্তত করে মহামায়া বলেন, তুমি কোথায় যাবে প্রথমে?

—কাশীতে। এখনও তিনি আছেন। সবার আগে তাঁকে প্রণাম করব। মায়ের আশীর্বাদই যে আমার পাথেয়।

—তারপর? তারপর কি সেখানেই থেকে যাবে?

ম্লান হাসলেন রাজা মহাশয়। বললেন, দুনিয়ায় সব কিছু বদলে গেল বড়বৌ—শুধু তুমি বদলালে না!

মহামায়াও ম্লান হাসলেন। বললেন, ঠিক ঐ কথাটাই আমিও ভাবছি কিন্তু। এ দুনিয়ায় সব কিছু বদলে গেল, শুধু বদলালো না তোমার ভ্রান্ত ধারণাটা। তুমি আজও বিশ্বাস কর—ছুটকি আমার মেয়ে নয়, সে আমার সতীন।

রাজা-মশাই চোখ তুলে দেখলেন। নাঃ! এ কয় বছরে অনেক রোগা হয়ে গেছে বড়রানী। অঙ্কের হিসাবে তার বয়স তেতাল্লিশ, কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্বা বৃদ্ধা বলে তাকে মনে হয়। ওর শীর্ণ হাতটি তুলে নিয়ে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, বড়বৌ, আজ খোলামনে কয়েকটা কথা বলব। তুমিও বল। মা আছেন কাশীতে, সেখানেই যাচ্ছি। ওর সঙ্গে দেখা হবেই। কিন্তু সত্যি করে বল তো—তুমি কী চাও? কী হলে তুমি সব চেয়ে সুখী হও?

মহামায়া বললেন, যা ঘটলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম তা হবার নয়। আমি সবচেয়ে আনন্দ পেতাম যদি ছুটকিকে আবার নিজে হাতে সাজিয়ে তোমার কাছে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন…

—বল? তখন?

মহামায়া বলেন, এতদিন আমি যা চেয়েছি তাই তুমি দিয়েছ। আজ তুমি দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশ যাচ্ছ, কবে ফিরবে তার স্থিরতা নেই। আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছ, হয়তো তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমি থাকব না। এমন দিনে বিদায়-বেলায় তোমার কাছে একটি শেষভিক্ষা চাইব। দেবে?

—এমন করে বলছ কেন বড়বৌ। তুমি তো জান তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

—জানি, সেই দাবীতেই বলছি। তুমি তোমার মনকে যতখানি চেন, তার চেয়ে আমি তাকে বেশি চিনি। কেন তুমি ছুটকির প্রণাম নাওনি, কেন তাকে অমনি করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তা আমি জানি না। তুমি বলনি, আমিও জোর করিনি। কিন্তু তারপর চার বছর কেটে গেছে। আমি এই চার বছর ধরে লক্ষ্য করছি তোমাকে—আমি জানি, তুমি তাকে ভুলতে পারছ না। আর তাই আমাকেও সহ্য করতে পারছ না—না না, আমাকে বাধা দিও না। আমার যা বলার আছে তা আজ বলতে দাও। হয়তো এ সুযোগ আর কোনও দিনই পাব না।

—বেশ বল।

—তাই এই চার বছর ধরে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ। তুমিও তাকে ভুলতে পারছ না, আর সে আবাগীও—তারও তো বিশ বছর বয়স হল, সেও…

বাধা দিয়ে রাজা-মশাই বলেন, কিন্তু তুমি কী যেন একটা চাইবে বলছিলে?

—হ্যাঁ। কথা দাও, বংশবাটির রাজবাড়িতে যেদিন ফিরে আসবে সেদিন বংশধরকে নিয়েই ফিরে আসবে?

রাজা-মহাশয় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীর দিকে—পঁয়ত্রিশ বছর যার সঙ্গে ঘর করেছেন সেই অতিপরিচিতা রহস্যময়ী অপরিচিতার দিকে। তারপর হেসে বললেন, বেশ। কথা দিলাম বড়বৌ। বংশবাটিতে যেদিন ফিরে আসব সেদিন বংশধরকে নিয়েই ফিরব।

সাত

কাহিনীর উজান ঠেলে চার বছর পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

উজান ঠেলে শঙ্করীর নৌকোও চলেছে ভাগীরথী বেয়ে, বংশবাটির ঘাট থেকে বারাণসী ধামের চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে। পার হয়ে গেল—ত্রিবেণী, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া, কর্ণসুবর্ণ, রাজমহল। ভাগীরথী ছেড়ে নৌকো পড়ল মূল গঙ্গায়। পশ্চিমাভিমুখী হল এবার।

শঙ্করী নিশ্চুপ বসে থাকে বজরার ভিতর। জানলা দিয়ে দেখতে থাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল গঙ্গাতীরের দৃশ্য। গ্রামের পর গ্রাম, গঞ্জ, খোলা মাঠ। কোথাও বাঁধানো ঘাট, কোথাও কাঁচা পাড়। সকালবেলা একরকম, দুপুরে অন্যরকম, সন্ধ্যায় রাত্রিতে আবার মা-গঙ্গার অন্যরকম রূপ। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে দেখা যায় দলে দলে স্নানার্থীরা এসে জমায়েত হয়েছে ঘাটে। তৈলমর্দন করছে সর্বাঙ্গে। ছোট ছেলেমেয়েরা ঝাপাই ঝুড়ছে। নাক টিপে টুপ টুপ ডুব দিচ্ছে ঘোমটায় ঢাকা বউ। কেউ উচ্চকণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করছে—'মাতর্গঙ্গে তে যো ভক্তঃ...' আবার কেউ বা পাড়ে বসে হাঁক পাড়ছে—'অরে অ লক্ষি, একা-একা জলে নামিস্‌নে মা! মিনসেরা কেউ ঘাটে নেই! কথা শোন্!'

আর দেখা যায় মৎস্যজীবী পরিবারদের। তারা জাল শুকোয়, জাল ফেলে আর জাল বোনে। রাতভোর লণ্ঠন জ্বেলে মাছ ধরে। মাছরাঙা ঝুপ-ঝুপ করে জলে নামে। শীতালী পাখীর ঝাঁক মাঝে মাঝে আকাশ-বাতাস সচকিত করে দলে দলে উড়ে যায়। কদিন আগে মজা হয়েছিল একটা। বজরা তখন ঘাটের কাছে নোঙর-করা। বড় গঞ্জ একটা। মাঝিরা গেছে হাট থেকে বাজার করে আনতে। শঙ্করী বসেছিল জানলার ধারে। দেখছিল ঘাটের দৃশ্য। মেয়েদের স্নানঘাট। হঠাৎ শুনল একটি বৌ বলছে, দ্যাখ দ্যাখ কী সুন্দর! ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ!

দৃশ্যটা দেখবার জন্য অন্যমনস্ক শঙ্করী ঝুঁকে পড়েছিল। পরক্ষণেই সে লজ্জা পায়। বৌটি ওকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে কোনও পুরুষ-মানুষ না দেখতে পেয়ে শঙ্করী ডাকল—এস না ভেতরে! আলাপ করব তোমাদের সঙ্গে। নৌকোয় আমি একা।

শিশু-কাঁকে বধূ তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলে, যাবি? ডাকছে।

পার্শ্ববর্তিনী বলে, তোর বোনাই জানতে পারলে পিঠে চ্যালা কাট ভাঙবে!

ওরা আসেনি। কেন? ওরা কি তাকে রূপোপজীবিনী ভাবল? এত রূপ দেখে ভুল বুঝল? সে যাই হোক—ওদের সূত্র ধরে শঙ্করী সারাটা দিন কল্পনায় জাল বোনে। ঐ শিশু-কাঁকালে ভাগ্যবতী আর পরুষহস্তের প্রহারে অভ্যস্তা সৌভাগ্যবতীর কথা। ওরা হয়তো দু-বেলা ভরপেট খেতেও পায় না। কিন্তু তবু ওরা সুখী। রাজরানী নয়। আর কিছু না থাক—আহার্য-থালা অভুক্ত প্রিয়জনকে ধরে দেবার যে বঞ্চনা-প্রাপ্তি সেটুকু ওরা পায়।

বয়ে যায় গঙ্গা, বয়ে যায় সময়, আর উজানে বয়ে যায় বজরা। তার গদি-মোড়া ঘেরাটোপ চৌহদ্দির ভিতর বন্দিনী শঙ্করী যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কথা বলতে না পাবার দুঃখে। মোতির মা আছে, পিসিমাও মাঝে মাঝে এসে বসেন, কিন্তু ষোলো বছর বয়সের এক তরুণীর কি তাতে মন ভরে?

মাঝে মাঝে ও-বজরা থেকে ভেসে আসে সঙ্গীত। পদাবলী কীর্তন। কোথায়? মোতির মা আর পিসশাশুড়ীর বক্-বক্তিমে ও নৌকোর সবাই পরিচিত। অনেকেই মাঝে মাঝে এ নৌকোয় এসে ছোটরানীমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যান। যেন অচেনা শাশুড়ীর জন্য উদ্বিগ্ন শঙ্করীর ঘুম হচ্ছে না। শঙ্করী প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে মোতির মা, ও-নৌকোয় গান গায় কে?

—ঠাকুর মশাই গো। আমাদের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পুরুত মশায়ের ছাওয়াল। তিনিও তীর্থদর্শনে চলেছেন যে। কী মিষ্টি গলা। তা তুমিও চল না কেন? গান শুনে আসবেনে?

তথ্যটা জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ সেই নবদূর্বাদলশ্যাম তরুণ পণ্ডিতটির স্মৃতি জেগে ওঠে। অন্তরালের প্রায়ান্ধকারে আয়ী-মায়ের একটা বেফাঁস কথায় যিনি লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন। কাব্যতীর্থ। প্রশ্ন করে, কী নাম রে ওঁর?

—নাম? নাম তো জানি না ছোট-মা। সবাই বলে ঠাকুর মশাই, আমিও বলি ঠাকুর মশাই। শুধায়ে আসব?

—দূর পাগলি! ওঁর নাম না জানলে কি আমার ঘুম হচ্ছে না?

—যাবে গান শুন্তি? ভারি ভাল গান।

—না থাক।

কেন প্রত্যাখ্যান করল? কর্মহীন অবকাশে কয়েক দণ্ড তো কেটে যেত ভালই। ঐ সূত্র ধরে শঙ্করীর কি মনে পড়ে গিয়েছিল তার উদ্ধত-প্রণামের স্মৃতিটুকু—যার পথরেখা ধরে আর একদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা? অথবা আয়ী-মায়ের সেই বেফাঁস কথাটার সঙ্কোচে? কী যেন বলেছিল আয়ী-মা? '৺মায়ের জন্যি আনা পদ্মগুলান শেষবেশ রানীমায়ের চরণেই—' চরণেই না মাথাতেই? আরও

বলেছিল—'অরে দেখ্‌লি মুনিঋষিরও মতিভ্রম হয়ি যায়!' ছি ছি ছি! কথাগুলো যদি এতদিনেও উনি ভুলে না গিয়ে থাকেন? শঙ্করী কোনদিনই পারবে না ঐ তরুণ পণ্ডিতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

কিন্তু দাঁড়াতে হল। পিসিমা একদিন হাত ধরে নিয়ে এলেন পণ্ডিতকে, এই নৌকোয়। বললেন, জোর করে ধরে এনেছি। নে ছুটকি, বসবার ঠাঁই দে।

শঙ্করী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। উনি হয়তো গদীতে বসবেন না। শঙ্করী একটি পশমের আসন পেতে দেয়। তবু পণ্ডিত কিন্তু উপবেশন করলেন না। বললেন, পিসীমা রোজই বলেন আপনাকে গান শোনাতে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার আসা হয় না। তাই খোঁজ নিতে এলাম। গান ভাল লাগে না আপনার?

শঙ্করী সে প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে বললে, তার আগে বলুন, এখানেও কি মা গঙ্গাই একমাত্র প্রণম্য?

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, না। কিন্তু আমি বৈষ্ণব। আমি সচরাচর কারও প্রণাম নিই না! আমার ধর্ম আমাকে বলে, সর্বদা তৃণের মতো সুনীচ হয়ে থাকতে।

—বসুন আপনি।

কাব্যতীর্থ বসেন। বলেন, আমার প্রশ্নটার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। আমি প্রতিদিন এঁদের নাম শোনাই, আপনি শুনতে আসেন না কেন?

শঙ্করী বললে, আপনি তো পদাবলী কীর্তন করেন। জানেন না, আমরা শাক্ত।

পণ্ডিত হাসলেন। বললেন, গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ করতে নেই রানীমা। আপনি এমন গোঁড়া শাক্ত নন যে, কৃষ্ণনাম কানে গেলে কানে আঙুল দেবেন। অনন্ত বাসুদেব মন্দির শাক্ত রাজা-মহাশয় বংশই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শঙ্করী বলে, আপনি বসুন, পিসিমার সঙ্গে গল্প করুন। আমি একটু সরবৎ করে আনি।

পণ্ডিত বলেন, থাক রানীমা। আমার সঙ্গে সৌজন্য করতে হবে না।

—সৌজন্য নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, অতিথি—

—না, আমি অতিথি নই। তিন তিথি যে থাকে না সে-ই অতিথি। আমি বংশবাটি রাজার পোষ্য। ও-নৌকোয় আমি নিত্য যা সেবা করি তার ব্যবস্থা আপনাদেরই। বরং আমাকে কিছু প্রতিদান দেবার সুযোগ আপনি করে দিন।

—প্রতিদান? কী ভাবে?

—আমি আপনাকে নামগান গেয়ে শোনাতে পারি, শাস্ত্রপাঠ করে শোনাতে পারি— কিংবা…

—কিংবা?

—যদি কাব্যপাঠে আপনার অভিরুচি থাকে তাহলে তাও পাঠ করে শোনাতে পারি। কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থ আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

একটু ভেবে নিয়ে শঙ্করী বলল, সে তো ভালই। আজ সন্ধ্যায় যাব আপনার নামগান শুনতে। যদি কাব্যপাঠ করে শোনান তাহলে সময়টাও কাটবে। কী কাব্যগ্রন্থ আছে আপনার সঙ্গে?

পদাবলী কিছু আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এক খণ্ড আছে।

- সংস্কৃত কাব্য কিছু নেই?

একটু চমকে ওঠেন পণ্ডিত। বলেন, আপনার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার আছে রানীমা?

হাসল শঙ্করী। বললে, না। আদৌ না। বাংলা ভাষায় লেখা পুঁথি তো নিজেই পড়তে পারব। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে কোন সংস্কৃত কাব্য আমাকে পড়িয়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

পিসীমা বললেন, বাবার ঠাঁইয়ে পৌঁছাতে এখনও এক মাস। তুমি অনেক দিন ধরে পড়তে পারবে বাবা। শাস্তর শেষ হয়ে যাবে।

পণ্ডিত হেসে বলেন, শাস্ত্র শেষ হয় না পিসিমা। আর শাস্ত্রালোচনা আমরা করবও না। আমার কাছে এক খণ্ড মূল বাল্মীকি-রামায়ণ আছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন…

শঙ্করী বললে, হাতে-লেখা বাংলা পুঁথিতে রামায়ণ আমি পড়েছি। আপনার কাছে কালিদাসের কোনও কাব্য আছে? মহাকবি কালিদাসের শুধু নামই শুনেছি—

—আছে রানীমা। নলোদয়, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্ এবং ঋতুসংহার আছে—

শঙ্করী কৌতূহলী হয়। জানতে চায় কোন্ কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু কী। সব শুনে বলে, আপনি তাহলে কাল থেকে 'কুমারসম্ভবম্' শুরু করুন।

সেদিন সন্ধ্যায় ছোটরানীমা ও বজরায় এলেন নামগান শুনতে। তরুণ পণ্ডিত বসেছিলেন আসরের মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে। এখন শুক্লপক্ষ। সন্ধ্যারাত্রে চাঁদের আলো থাকে। রাত্রেও নৌকো এগিয়ে চলেছে। শীত বেশ আছে। বজরার রুদ্ধদ্বার কক্ষেই বসেছে গানের আসর। শ্রোতার সংখ্যা বেশি নয়—গুটি আট-দশ। অবশ্য মাঝিমাল্লারাও দাঁড় বাইতে বাইতে শুনবে। বজরার ভিতর

বাতিদানে বাতি জ্বলছে। বুড়ীর দল দোলাই জড়িয়ে বসেছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শঙ্করী এসে পণ্ডিতের সম্মুখে নামিয়ে রাখল একটি থালায় এক রেকাবি চাঁপা ফুল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কাব্যতীর্থ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। তাই দূর থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। পণ্ডিত থালাটি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, চম্পকের সময় তো এ নয়। কোথায় পেলেন রানীমা?

শঙ্করী বললে, আজ সকালে এক [illegible] মালাকার ঘাটে ফুল বিক্রি করছিল মোতির মাকে দিয়ে আনিয়েছি।

পিসিমা বলেন, ও ঠাকুর মশাই, আজ তোমার খঞ্জনী কই গো?

পণ্ডিত বলেন, আজ আর পদাবলী গাইব না পিসিমা। তাই খঞ্জনী আনিনি খালি গলাতেই কিছু মায়ের নাম শোনাই।

মায়ের নাম? পিসিমা অবাক হন—তুমি বোষ্টম, মায়ের গান গাইতে পার মনে হল শাক্তবাড়ির বালবিধবা একটু খুশিই হয়েছেন।

পণ্ডিত বললেন, কেন পিসিমা? কালী আর কৃষ্ণ কি আলাদা?

শঙ্করী বুঝতে পারে—এ জবাব তাকেই দেওয়া হল।

পর পর আট-দশখানি কালী-কীর্তন গাইলেন কাব্যতীর্থ। শঙ্করী অবাক হয়ে গেল। এমন অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত সে কখনও শোনেনি। সুরেলা দরাজ কণ্ঠ কাব্যতীর্থের। গঙ্গাবক্ষে তাঁর 'মা—মা' ধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল—জ্যোৎস্নার সঙ্গে যেন এক হয়ে গেল সে গানের রেশ। সঙ্গীত সমাপন করে পণ্ডিত জগজ্জননীর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। সকলেই প্রণাম করলেন।

শঙ্করী আধো ঘোমটার ভিতর থেকে বললে, এ শ্যামাসঙ্গীত আগে কখনও শুনিনি। পদকর্তা কে?

—মহাসাধক ছিলেন তিনি। কবিরঞ্জন সেন। নিজেই শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন, সুর দিতেন, গাইতেন। বছর ষোল-সতের দেহ রেখেছেন।

পিসিমা কৌতূহল দেখান। বলেন, কোথাকার লোক গো?

—আদি নিবাস কুমারহট্ট গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পণ্ডিত ছিলেন তিনি। সংস্কৃত, হিন্দী ছাড়া ফারসী ভাষাও জানতেন। শোনা যায়, শহর কলকাতায় এক ধনীর বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন এবং হিসাবের খাতাতেই নাকি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন। একদিন নাকি তাঁর উপরওয়ালা তা দেখতে পেয়ে তাঁকে স্বয়ং মালিকের কাছে ধরে নিয়ে যায়। ধনী গৃহস্বামী কিন্তু সদাশয় এবং ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। হিসাবের খাতায় লেখা কবিতাটি দেখে বললেন, তোমার কাজ এ নয়। তুমি ৺মায়ের নাম রচনা কর। আমি বৃত্তির ব্যবস্থা

রে দিচ্ছি। তারপর তিনি বাকি জীবন শুধু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, মায়ের াম-কীর্তন করেছেন। তন্ত্রসাধনা করেছেন।

শঙ্করী প্রশ্ন করে, 'কবিরঞ্জন' ওঁর নাম, না উপাধি ?

—উপাধি। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া খেতাব। তিনি একটি কাব্য-ন্থ লিখে মহারাজকে শোনান, তাতেই খুশি হয়ে—

—কী কাব্যগ্রন্থ ? জানতে চায় শঙ্করী।

-'বিদ্যাসুন্দর'।

—বিদ্যাসুন্দর ! সেটা তো রায়গুণাকরের রচনা। তাঁর নাম তো ভারতচন্দ্র।

পণ্ডিত এক মুহূর্ত স্থির হয়ে কী যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, না রানী-া। একই নামে দুজন কবি দুখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর পিতৃদত্ত াম 'রামপ্রসাদ'।

নৌকো ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বড় বড় গঞ্জ আর শহর। াব্যতীর্থ প্রতিদিন সকালে এসে দুই-এক দণ্ড কাব্যপাঠ করে যান। প্রথম প্রথম ার পাঁচ-সাতটি শ্রোতা ছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু যখন হরপার্বতীর মিলন তখন র্মপ্রাণা বিধবার দল সাগ্রহে এসে বসেছিলেন প্রথমটায় ; কিন্তু এ তো আর থকতা নয়। দু-দিনেই ওঁদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। শুধু সৌজন্যের াতিরে পিসিমা এসে বসে থাকতেন। তিনিই পণ্ডিতকে এ বজরায় প্রথম দিন াত ধরে নিয়ে এসেছিলেন। বোধ করি কারণ শুধু সেটাই নয়। শঙ্করী তাঁরই িরিবারের কুলবধূ। যদিচ কাব্যতীর্থ কুলপুরোহিতের সন্তান- গুরুর বংশ, তবু য়সে তরুণ যে। ঘি আর আগুন। একটু সামলে চলতে হয়। মেয়েটারও যে রা যৌবন !

পণ্ডিত তিল তিল করে অগ্রসর হচ্ছেন। মূল পাঠ করে তার অন্বয় আর যাখ্যা করেন। হিমালয়ের বর্ণনা, কিন্নর-কিন্নরীদের কথা, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা হাদেবের প্রথম পক্ষের পত্নী সতীর দেহত্যাগ এবং হিমালয়-দুহিতা পার্বতীরূপে াঁর পুনর্জন্ম। ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে মুঙ্গের, ভাগলপুর, বাঁকিপুর। নব-যৌবনের শুভাগমনে পার্বতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকশনের বর্ণনায় পণ্ডিত ব্যাখ্যাকে ংক্ষেপিত করতে বাধ্য হলেন। পীনোন্নত স্তনযুগল, বিপুল জঘন ও কৃশ মধ্য-দেশের বর্ণনা পর্যন্ত করতে পারলেন কাব্যতীর্থ, কিন্তু হোঁচট খেলেন ব্যাখ্যা করতে —'তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবরোম-রাজি। নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য' ইত্যাদি শ্লোকে। কিংবা 'অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ, স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু

তথা প্রবৃদ্ধম। মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য...'

নিজে থেকেই একদিন বললেন, রানীমা যদি চান তাহলে আমরা বরং কাল থেকে রামায়ণ পাঠ করি—

শঙ্করী অবাক হয়ে বলে, কেন? আমার তো খুব ভাল লাগছে। 'কুমার' কবে আসবেন উমার গর্ভে আমি তো তারই প্রতীক্ষায় আছি।

কাব্যতীর্থ বলেন, তথাস্তু!

শঙ্করী সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, আপনার কি ক্লান্তি আসছে? আমার মত নির্বোধ শ্রোতাকে পাঠ করে শোনাতে?

কাব্যতীর্থ মাথা নেড়ে বলেন, না রানীমা; সেজন্য নয়। আমার সঙ্কোচ অন্য কারণে—

শঙ্করী বুদ্ধিমতী। বলে, বুঝেছি। তা হোক—বাল্মীকি, বেদব্যাসের মহাকাব্যের চেয়ে কালিদাসই শুনতে চাই। রামায়ণ, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আছে কালিদাসের নেই—

কাব্যতীর্থ বলেন, ঠিকই বলেছেন রানীমা। 'প্রসন্ন রাঘব' রচয়িতা কবি জয়দেব বলেছেন,

'বাল্মীকে রজনি প্রকাশিতাগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।'

অর্থাৎ, 'কবিতা মহাকবি বাল্মীকির কন্যা, ভগবান বেদব্যাস তাঁকে পালন করেছিলেন, তিনি তাঁর পালক-পিতা—তাঁরা স্বীয় লীলাবতী কন্যার গুণরাশি জগতে প্রকাশ করেছিলেন। সেই কবিতা-কন্যা বিদর্ভ-রীতির অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে স্বেচ্ছায় শ্রীকালিদাসকে পতিরূপে বরমাল্য পরিয়েছেন।'—নারীজীবনের ভূমিকায় পিতা ও পালক-পিতার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু স্বামীই যে তার সব।

তা কি আর জানে না শঙ্করী? ওর ক্ষেত্রে যে পালক-পিতা আর স্বামী একাকার হয়ে গেছেন। শঙ্করী বলে, আমার মতো অরসিক শ্রোতাকে কাব্যপাঠ করে শোনাতে—

বাধা দিয়ে কাব্যতীর্থ বলেন, তাহলে শুনুন রানীমা। জনশ্রুতি—কবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্যগুলি রচনা করে সর্বপ্রথমেই তা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নিয়ে যেতেন না। সমস্ত রাত্রি ধরে তিনি কাব্য রচনা করেন, প্রত্যুষে তাঁর কুটিরে আসত একজন মালিনী—সে রাজবাটীতে ফুলের যোগান দেয়। ফুল সরবরাহ করে ফেরার পথে সে এসে বসত কবির কুঞ্জ-কুটিরে। বলত, কই কবি, কাল কী লিখেছ, শোনাও। আর মহাকবি কালিদাস সেই নিরক্ষরা মালিনীকে

প্রথম শ্রোতা হিসাবে নিত্য বরণ করে নিতেন। মালিনী নিরক্ষরা ছিল, অরসিক ছিল না। মহাকাব্য শুনতে শুনতে সে কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। সে নিজেকেই আরোপ করত ঐ কাব্যে। কখনও কল্পলোকে সে নিজেকে ভাবত ইন্দুমতী, কখনও যক্ষপ্রিয়া, কখনও বা হিমালয়-দুহিতা উমা!

আশ্চর্য! শঙ্করীরও যে ঠিক ঐ রকম মনে হয়। কাব্যতীর্থ উমার বর্ণনা করেন, আর শঙ্করী মনে মনে নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলিয়ে নেয়। কাব্যতীর্থ পড়েন :

"আত্মানমালোক্যচ শোভমানমাদর্শাবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ॥ ৭/২২"

[প্রসাধন-অন্তে সালঙ্কারা উমা দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আনন্দে মোহে চোখ দুটি মুদিত করেন—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আসন্ন মিলনে তিনি যে উদ্‌গ্রীব! তাই তো হবে—রমণীকুলের বেশভূষা সাজসজ্জায় চরম সার্থকতাই তো প্রিয়তমের মনোহরণে—না হলে প্রসাধনের আর প্রয়োজন কী?]

আর শঙ্করীর মনে পড়ে যায় সেই কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রির কথা। মহামায়া তার সর্বাঙ্গে পরিয়েছেন অলঙ্কার—তনুদেহ ঘিরে বিক্রমপুরী 'খাসা-মস্‌লিন', যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভের উচ্ছ্বাস সংহত করেছেন দৃঢ়নিবদ্ধ কঞ্চুকে, স্তবকিত জলদ-সম্ভারের মত কবরীগুচ্ছে পুষ্পস্তবক, সীমন্তের মধ্যভাগে বালার্ক-রক্তিম চীনা সিন্দুর, কণ্ঠে দিয়েছেন ইন্দ্রনীল শতনরী, গুরুনিতম্বে মূর্ছিত হয়ে আছে স্বর্ণখচিত মণিমেখলা অলক্তকরাগরঞ্জিত ফেনশুভ্র যুগ্ম চরণে কলহংসকণ্ঠ-নিঃস্বনমধুর নূপুর। তারপর মহামায়া শঙ্করীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তমরূপে পালিশ-করা ধাতব দর্পণ, বলেছিলেন, এইবার ত্যাখ ছুটকি! কেমন সাজিয়েছি। কী মনে হয়? বুড়ো বরের মাথা ঘুরে যাবে?

শঙ্করী উমার মতই সলজ্জে চোখ দুটি মুদে বলেছিল, আঃ! বড়দি! কী বকছ যা-তা।

মহামায়া ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ও ব্বাবা! বুড়ো বর বলেছি বলে এত রাগ! দেখিস পতিনিন্দায় বেমক্কা দেহত্যাগ করে বসিস না বাপু। তাহলে রাজা-মশাই তোর বদলে আমাকেই বাহান্ন টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীময়।

শঙ্করীর সে বাসরশয্যা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ও উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চায়—উমার ক্ষেত্রে কী হল? শঙ্করীর কোল জুড়ে 'কুমার' সম্ভাবিত হয়নি, উমার হবে তো?

পণ্ডিত পাঠ করেন :

"ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।

ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে সংন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ॥ ৭/৬৭"

[ক্রোধবশে এই শঙ্কর—এমন অপরূপ শিব, যে মদনকে দগ্ধ করেছিলেন বলে শোনা যায়, সেটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। তাই কি হয়? এত কঠোর কি হতে পারেন তিনি? মনে হয়, এই অপূর্বকান্তি দেবাদিদেবকে দেখে নিজের গর্ব খর্ব হওয়ার লজ্জায় কন্দর্প নিজেই আত্মহত্যা করেছিল।]

কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় বললেই বা শুনছে কে? শঙ্করী যে স্বচক্ষে দেখেছে কন্দর্পের মহামৃত্যুদৃশ্য: এত আয়োজন করেছ কেন? জান না, কাল আমাকে যজ্ঞ করতে হবে? না! ক্রোধবশে মহাদেব মদনকে দগ্ধ করেননি—শঙ্করী যে দেখেছে তাঁর চোখে অপরিসীম করুণার মূর্ছনা। মদনকে দগ্ধ করতে তিনিও ব্যথা কম পাননি। শঙ্করী যে স্পষ্ট দেখেছিল, তাঁর মুগ্ধ চোখের তারায় তাঁর অন্তরের কামনা বাসনার প্রতিবিম্ব। তাহলে হঠাৎ দুই হাতে মদনের কণ্ঠনালী কেন চেপে ধরেছিলেন তিনি?

—রানীমা!

সম্বিৎ ফিরে পায় শঙ্করী। বলে, বলুন?

আমাদের কাব্যপাঠের এখানেই সমাপ্তি। কাল-পরশুর মধ্যেই আমরা কাশীধামে উপনীত হব।

শঙ্করী চমকে ওঠে: সে কি! এত শীঘ্র? কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, এ কাব্যে আছে সপ্তদশ সর্গ। মাত্র সাতটি তো শেষ হল?

তরুণ পণ্ডিত নির্বাক রইলেন। শঙ্করী পুনরায় বলে, কাশীধামে তো আপনি আমাদের ভদ্রাসনেই থাকবেন। বাকিটুকু বরং—

—তা হয় না রানীমা। এই সপ্তম সর্গেই আমাদের কাব্যপাঠ সমাপ্ত হবে—

—কেন ঠাকুর মশাই?

একটু ইতস্তত করে কাব্যতীর্থ কারণটা ব্যক্ত করেন। বলেন, আলঙ্কারিক মম্মথ ভট্ট মহাশয় তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের প্রথম সাতটি সর্গই মহাকবির রচনা। পরবর্তী অংশ প্রক্ষিপ্ত—অর্থাৎ অন্য কারও লেখনীপ্রসূত। মল্লিনাথেরও ঐ একই অভিমত। আমারও তাই বিশ্বাস।

শঙ্করী প্রশ্ন করে, পরবর্তী অংশের কাব্যমাধুর্য কি নিকৃষ্ট স্তরের?

—ঠিক তা বলতে পারি না। অন্তত অষ্টম সর্গের রচনা যথেষ্ট উন্নত মানের।

—তাহলে সপ্তম সর্গেই থামছেন কেন?

কাব্যতীর্থ এক মুহূর্ত নীরব থাকেন। গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ নাকি করতে নেই। শেষবেশ স্বীকারই করেন—সপ্তম সর্গে উমার বিবাহ হল, তা আমরা পড়েছি। অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর দৈহিক মিলনের নিরাবরণ বর্ণনা আছে। আমাকে মার্জনা করবেন রানীমা! সে আমি ব্যাখ্যা করে শোনাতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শঙ্করীর। এই বুঝি ওর নিয়তি! উমা-মহেশ্বরের বিবাহ হবে—উমা সীমন্তে আঁকবে এয়োতির চিহ্ন, হাতে পরবে কালীঘাটের শাঁখা, কামাক্ষ্যা-মায়ের নোয়া; কিন্তু তার কোল জুড়ে সোনার চাঁদ কুমার আসবে না কোনদিন। 'কুমারসম্ভব' শেষ হবে সপ্তম সর্গের 'অসমাপ্ত গানে'।

আট

চার বছর পরের কথায় ফিরে আসা যাক।

আজ প্রায় দেড় মাস হল নৃসিংহদেব ভাগ্যের সন্ধানে বংশবাটি থেকে নৌকো-যোগে যাত্রা করেছেন কাশীধামের উদ্দেশে। উনি রওনা হয়েছিলেন ফাল্গুনের মাঝামাঝি—দোলপূর্ণিমার পরেই; আর এটা বর্ষশেষের শেষ সপ্তাহ। এই দেড় মাসে মহামায়ার শরীর যেন আরও ভেঙে গেছে। চৈতালী অপরাহ্ণে তিনি বসেছিলেন দ্বিতল গৃহের ছাদে—অস্তসূর্যের দিকে মুখ করে। ছাদের উপর থেকে অবশ্য গঙ্গা দেখা যায়। পাল-তোলা মহাজনী নৌকো চলেছে সারি সারি। দুরবীন থাকলে নৌকোর মানুষও সনাক্ত করা যায়। মহামায়া এই সময়টা ছাদে এসে বসেন—বহুদিন পূর্বে রাজা-মহাশয় ওঁকে একটি দুরবীন উপহার দিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে দূর-দূরান্তের দৃশ্য দেখতে ভারি ভাল লাগত। কী মজা! উনি ওদের দেখতে পাচ্ছেন, অথচ তারা সে-কথাই জানেই না। প্রৌঢ়া মহামায়া এখনও যন্ত্রটা হাতে পেলে যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠেন। গাছে গাছে পাখি এসে বসে—তাদের দেখেন। বজরার ছাদে বারবিলাসিনীদের নিয়ে কাপ্তেন-বাবুরা যখন গঙ্গার হাওয়া খেতে বের হয় তখন তারা জানতেও পারে না—ঐ প্রাসাদের শীর্ষ থেকে একজন লক্ষ্য করছে তাদের।

সেদিনও যথারীতি তিনি বসেছেন ছাদে। হঠাৎ মতি এসে বললে, বড় রানীমা, এই লেফাফাটুক্ নায়েব মশাই পাইঠে দেছে। তোমার পত্তর!

—পত্র! পত্র কে লিখবে রে আমাকে?

মহামায়া তাঁর তেতাল্লিশ বছরের জীবনে কখনও চিঠি পাননি। রীতিমত

অবাক হয়ে যান তিনি। বংশবাটির রাজপুরীর বড় রানীমা কেমন করে জানবেন ঘোড়ার ডাকে আজকাল রীতিমত ডাক যাতায়াত করছে শেরশাহের বাঁধানো সড়ক ধরে। আগেও যেত, ইদানীং কোম্পানীর ব্যবস্থায় সেটার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হয়েছে। সীলবদ্ধ লেফাফাটা হাতে নিয়ে বড় রানীমা ভেবে পান না এখন কী করণীয়। তাঁর অক্ষর পরিচয় নেই—ছুটকি থাকলেও না হয় পড়ে দিতে পারত। কে লিখছে, কী লিখছে না জেনে কেমন করে লোক ডাকেন? আর লোক বলতেও তো পুরুষমানুষ কেউ। রাজপুরীতে তেমন কোন ললনার কথা মনে করতে পারলেন না, যে চিঠি পড়তে পারে।

—কী বললে রে নায়েব মশায়? কোথা থেকে আসছে?

—বললে যে রাজা-মশাই পাইঠেছেন। পাটনা থিকে। তেনারও পত্র এয়েছেন যে।

কী আজব কাণ্ড! রাজা-মহাশয় পাটনা পৌঁছলেনই বা কবে আর চিঠিই বা লিখলেন কখন? আর সেটা এত শীঘ্র বংশবাটিতে এসে পৌঁছালোই বা কেমন করে? পাটনা কোথায়? হয়তো কাশী যাবার পথে কোন বড় গঞ্জ। তবে রাজা-মশাই জানেন যে মহামায়া নিরক্ষরা। সুতরাং পত্রে তিনি এমন কিছু লিখবেন না যাতে লজ্জা পেতে হয়। অনেক ভেবেচিন্তে রানীমা এত্তেলা পাঠালেন দেওয়ান দিলীপ দত্তকে। গোপন কথা যদি কিছু থাকে—নিশ্চয়ই থাকবে—না হলে খামকা উচ্ছ্বাস জানাতে রাজা-মশাই তাঁর অক্ষরপরিচয়হীনা সহধর্মিণীকে এভাবে পত্রাঘাত করবেন না।

ডাকতে হল না, দেওয়ান দিলীপ দত্ত নিজেই এত্তেলা পাঠাবেন। সংবাদবহ কিঙ্করী এসে জানালো দেওয়ান মশাই জরুরী কাজে একবার রানীমায়ের দর্শনপ্রার্থী।

মাঝমহালের চিকের এপাশে বড় রানীমা এসে বসলেন, ওপাশে যথারীতি এসে বসেছেন দেওয়ান দিলীপ দত্ত। কিঙ্করী ওপাশে গিয়ে বললে, রানীমা এয়েচেন। কথা কন।

দিলীপ বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পার। আমাদের গোপন কিছু কথা আছে। লক্ষ্য রেখো, এদিকে কেউ যেন আড়ি না পাতে।

কিঙ্করী নিক্রান্ত হলে দিলীপ বললেন, রানীমা, আজই ঘোড়ার ডাকে রাজা-মহাশয়ের একটি পত্র এসেছে। উনি নিরাপদে পাটনায় পৌঁছেছেন গত অমাবস্যায়। আমাকে পত্রে অনেক বৈষয়িক বিষয়ে লিখেছেন—যা বিস্তারিত আপনার না শুনলেও চলবে। ঐ পত্রে তিনি আরও লিখেছেন যে, আপনাকে তিনি নাকি

একটি পৃথক গোপন পত্র পাঠিয়েছেন। রাজা-মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে আদেশ করেছেন, পত্রখানি আপনাকে পাঠ করে শোনাতে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা করে দিতে। এ বিষয়ে আপনার কী নির্দেশ তাই জানতে আমি এখানে এসেছি রানীমা'।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে দেওয়ান-পৌত্র দিলীপ দত্ত অপেক্ষা করতে থাকে। ও-প্রান্ত থেকে কোনও প্রত্যুত্তর ভেসে আসে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পুনরায় বলে, রানীমা! আপনি ও-প্রান্তে আছেন তো?

পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়ায়। সবিস্ময়ে দেখে চিকের পর্দা উত্তোলন করে বংশবাটির প্রধানা মহিষী স্বয়ং এ-প্রান্তে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাঁর মাথায় আধো-ঘোমটা। তবু মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসঙ্কোচে তিনি এগিয়ে এসে একটা গদি মোড়া সোফায় বসে পড়েন। বলেন, দিলীপ, সময়ে আমার সন্তান হলে সে তোমার বয়সীই হত। তোমাকে নাম ধরে ডাকলাম, কিছু মনে করো না। তুমি আমার পুত্রতুল্য।

দিলীপ অগ্রসর হয়ে আসে। নীচু হয়ে সশ্রদ্ধে পদধূলি গ্রহণ করে রাজমহিষীর। বলে, আমি ধন্য হলাম মা।

-আমার শাশুড়ী উপস্থিত থাকলে হয়তো আমার এ-কার্য তিনি অনুমোদন করতেন না। আমাদের সাত পুরুষের ঐতিহ্যে এমন অনাচার নাকি নেই। না থাক, আমার মতো ভাগ্য নিয়েও আসেনি বংশবাটির আর পাঁচজন রানী। আমার স্বামী দেশত্যাগ করে গেছেন। আমার সন্তান নেই, দেবর নেই। আমি নির্বান্ধব। তুমিই তাঁর একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই এ পর্দা আমি মানব না, মানতে পারি না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন রানীমা।

—এবার তুমি চিঠিখানি পড়ে শোনাও—

সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফাখানি খুলে দিলীপ পড়তে থাকে:

"সাবিত্রীসমানাসু শ্রীঅনন্তবাসুদেবপ্রসাদ শ্রীস্বয়ম্বরা জয়তি। অতঃপর আমি নিরাপদে মোকাম পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আগামীকল্য পুনরায় যাত্রা করিব। একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে এই পত্র দিতেছি। গত এক মাস কাল নৌকাযোগে আগমনকালে আমি নিরন্তর মনোবেদনায় ভুগিয়াছি। আমার সর্বদা মনে হইতেছে তোমার নিকট সত্য গোপন করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। তোমার নিকট আমি সত্যবদ্ধ আছি, একটি বিশেষ দ্রব্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করিতে না পারিলে আমি কোনদিন বংশবাটিতে প্রত্যাগমন করিব

না। কিন্তু এক্ষণে মনে হইতেছে তাহা তো কেবলমাত্র পুরুষকারে প্রাপ্তব্য নহে, তাহার জন্য যে দৈবের দাক্ষিণ্যও অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তদ্ভিন্নও বাধা আছে। সে বাধা অনতিক্রম্য না হইলেও দুরতিক্রম্য। অবধান কর: স্বয়ম্ভরা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের পূর্বদিনে আমি যখন শহর কলিকাতায় গিয়াছিলাম তৎকালে কেল্লায় একজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হতভাগ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একথা পরম কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপ অবগত আছে। কোম্পানির আইনে ব্যবস্থা আছে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী কোনও শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে সাধ্যমত তাহা পরিপূরণ করা হয়। ঐ হতভাগ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল মাত্র। সে-কারণ আমাকে কেল্লায় ঐ বধ্যভূমে যাইতে হয়। যে তথ্য শ্রীমান দিলীপ জানে না তাহা এই—সেই হতভাগ্য মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী হইতেছে ছোট রানীমায়ের জনক—যে ষড়বর্ষীয়া বালিকাকে আমার পদপ্রান্তে রাখিয়া একদিন গঙ্গাবক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে সেই হতভাগ্য ছোট রানীমায়ের বিষয়ে আমাকে কিছু গুহ্যবার্তা জ্ঞাপন করিয়া নিজেকে পাপমুক্ত করে। সকল কথা পত্রে লিপিবদ্ধ করার যোগ্য নহে। সাক্ষাতে বলিব। এ-সংবাদ তুমি ও শ্রীমান দিলীপ ভিন্ন যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয়। এত কথা তোমাকে পত্রযোগে জানাইলাম শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি প্রণিধান করিবে আমার সত্যরক্ষার বাধা কোথায়। এমতাবস্থায় আমার কর্তব্য কী? তোমার অভিমত কাশীধামের ঠিকানায় জানাইও। ইতি—"

চিঠি শেষ হয়ে গেল। শ্রোতা ও পাঠক দুজনেই নির্বাক। দিলীপই প্রথম কথা বললে। একটু ইতস্তত করে বললে, বড় রানীমা, জানি এ আমার অশোভন প্রশ্ন। তবু পুত্র বলে আমাকে সম্বোধন করেছেন, সেই অধিকারে জানতে চাইছি—আপনি রাজা-মশাইকে এমন কী জিনিস নিয়ে আসতে বলেছেন ফেরার সময়?

ম্লান হাসলেন মহামায়া। বললেন, তোমাকে পুত্র সম্বোধন করেছি বাবা, তাই তা আজ আর তোমাকে জানাতে পারি না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল দিলীপ। তারপর বললে, আপনি যদি এ পত্রের উত্তর দিতে চান, তাহলে বলুন। আমি লিখে নিই।

—না বাবা। আমি আবার কী লিখব? তুমি শুধু তাঁকে জানিও যে, তোমার বড় রানীমা শুধু বলেছিলেন, 'রাজা-মহাশয়ের ধর্ম এবং বিবেক যা বলে, তিনি যেন তাই করেন।'

—তাই লিখব বড়মা।

—তোমার ছোটমা সম্বন্ধে পত্রে যা লেখা আছে—

বাধা দিয়ে দিলীপ বলে ওঠে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত কেমন করে থাকবেন মহামায়া নিজে? ছুটকির সম্বন্ধে কী এমন গুহ্যতথ্য জানিয়ে গেল তার বাপ? ফাঁসিকাঠে চড়ার আগে? ছয় বছরের মেয়ের তো আর অতীত ইতিহাস বলে কিছু নেই। তবে কি তার জন্মরহস্য বিষয়ে? তার মায়ের কোনও কলঙ্কের কথা?

মহামায়া ছট্‌ফট করতে থাকেন। আরও ভেঙে পড়ে তাঁর শরীর।

ওর দুদিন পরেই ঘটল আর একটা অকল্পনীয় ঘটনা। মো'ত ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, মা আসিছে! ও বড় রানীমা, দেখসে—কে এয়েছেন দেখ!

মোতির মা ফিরে এসেছে কাশী থেকে? এমন হঠাৎ যে? মহামায়া ছুটে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে এবং এসেই তিনি যেন ভূত দেখলেন। দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করী আর মোতির মা।

—এ কি রে! তোরা! কী করে এলি? কেন? হঠাৎ?

সংবাদ নিদারুণ। প্রায় দু মাস পূর্বে, অর্থাৎ নৃসিংহদেব যে সময়ে যাত্রা করেছেন তার আগেই তাঁর জননী রানী হংসেশ্বরীর ৺কাশীলাভ ঘটে। শঙ্করীই তাঁর শ্রাদ্ধ করেছে। তারপর ভৈরব সর্দারের ব্যবস্থাপনায় ওরা ফিরে এসেছে বংশবাটিতে। আশ্চর্য! পথে নিশ্চয় উজান-ভাঁটি দুটি বজরা পরস্পরকে অতিক্রম করেছে—অথচ কেউই জানতে পারেনি বিপরীতমুখী বজরায় বসেছিলেন তাঁদের অতি-আপন-জন।

সতীনকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন মহামায়া: উঃ! কী কাঠ বরাত করে জন্মেছিলি হতভাগী। তোর জন্যে লোকটা দেশান্তরী হয়ে গেল, আর তুই···

শঙ্করী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই রইল শুধু।

নয়

সেই বংশবাটি রাজপুরীর বৈচিত্র্যবিহীন ছককাটা জীবন—সূর্যোদয়ে যার সূচনা, সূর্যাস্তে সমাপ্তি। এ জীবনের সঙ্গে শঙ্করীর আবাল্য পরিচয়। সেই সব চেনা মুখ—মোতি, মোতির মা, নৃত্যকালী, কানাই, কানাইয়ের মা, বংশী, শ্রীধর, গোবর্ধন। ঘেরাটোপ খাঁচায় সারি সারি কোকিল ওর জীবনের আর দশ-বিশটা বসন্তের মত এই চৈত্রশেষেও অন্ধ আর্তি জানায়—কুহু-কুহু-কুহু। অনন্ত বাসুদেব

মন্দিরে প্রহরে প্রহরে বেজে ওঠে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, সন্ধ্যা বন্দনা, শয়নারতি। ক্লান্ত মধ্যাহ্নে ঘুঘুর একটানা ঘুমপাড়ানিয়া তান। কখনও বা রাজপথ-দিয়ে-চলা পালকিবাহকদের শ্রান্ত ধ্বনি,—হুম্-ব্রো, হুম্-ব্রো, হুম্ ব্রো! ভেনিশীয় খড়খড়ির পাল্লা তুলে শঙ্করী শয়নকক্ষ থেকে দেখে মা গঙ্গাকে। জল দেখা যায় না—খাড়া পাড়ের ওপাশ থেকে দেখা যায় মহাজনী নৌকোর পালের মিছিল। ওর মনে হয়, ওরাও বুঝি একসার রাজান্তঃপুরিকা! ফাঁকা হাওয়ায় অন্তঃসারশূন্য উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠেছে ঐ লাল-নীল-গেরুয়া নৌকোর পাল। সার বেঁধে চলেছে অচেনা উজান থেকে অজানা ভাঁটার দিকে—জন্ম থেকে মৃত্যুর রাজ্যে। কিঙ্কর-কিঙ্করীর দল প্রথামত কাজ করে যায়—নিত্যকর্মপদ্ধতি—বংশী ঝারিতে করে বাগানের চারাগাছে জলসেচন করে—বেল, জুঁই, গাঁদা, দণ্ড-কলস ফোটে আর ঝরে। শ্রীধর মাঝে মাঝে ঝাড়পোঁছ করতে বসে বারান্দা আর সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলচিত্রগুলি। ফাঁকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা নৌকোর পালের সারির মত ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকে তেলরঙের রাজা-রাজড়ার দল—রামেশ্বর, রঘুদেব, গোবিন্দদেব। যেদিকেই যাও, মনে হবে তোমারই দিকে তাকিয়ে আছে—মরা পাবদা মাছের ঝাঁক যেন! গোবর্ধন ময়লা ন্যাকড়ায় মুছতে থাকে খাপ গেলাসের কালিমা—তার কি শেষ আছে? ওরা আলো ছড়ায় যতটা কালি মাখে তার চেয়েও বেশী। তারপর সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে। কামিনী, গন্ধরাজ আর কাঞ্চনের ঝোপেঝাড়ে জলতে থাকে লাখ লাখ জোনাকি। হাসনু-হানার তীব্র মদির গন্ধ মিশে যায় দেউড়ি-থেকে-ভেসে-আসা মিশিরজীর তুলসী-দাসী রামায়ণের গানের রেশের সঙ্গে—'অশোকবনের একান্তে নর-সিংহ রাঘবের ধর্মপত্নী করলগ্নকপোলে ভাবছেন—তিনি কেমন করে আজও আমাকে ভুলে আছেন?' আসে মালাকর—জুঁই-বেলের মালা নিয়ে। শঙ্করীকে নিতে হয় —না হলে রাগ করবেন মহামায়া। দুঃখ পাবেন। মহামায়া তো আর কুমার-সম্ভব পাঠ করেননি, জানেন না 'স্ত্রীণাংপ্রিয়-লোকফলা হি বেশঃ।'

এই ছককাটা জীবনের পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে শঙ্করীর প্রায় আবাল্য পরিচয়, কিন্তু এবার যেন তা দুঃসহ লাগছে। ও যে ইতিমধ্যে আভাস পেয়েছে নিষিদ্ধ ফলের—দেখে এসেছে রাজপুরীর পাঁচিল-ঘেরা এই চতুঃসীমার বাইরের দুনিয়াকে। দেখেছে বিস্তীর্ণ গঙ্গার বালি-চিক-চিক জলে বালিহাঁসের মিছিল, শুনেছে তাদের দুঃসাহসী পাখায় দিগন্ত-উত্তরণী নিঃস্বন; দেখেছে বিশ্বনাথের শয়নারতি, শুনেছে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে লক্ষ যাত্রীর উচ্ছল আবেগের হর-হর ব্যোম-ব্যোম! আজ তাই এই ঘেরাটোপ খাঁচায় শঙ্করীর অন্তর ঐ অন্ধ কোকিলের মত ব্যর্থ

বসন্তের আর্তি জানাতে চায় কুহু, কুহু,—উহু! উহু!

বেশ ছিল কাশীতে। চার-চারটে বছর। সেই চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে হাতি-ফট্‌কার বাড়িতে। শাশুড়ী তো ওকে দেখে হাতে স্বর্গ পেলেন। পুত্রবধূর রূপের সুখ্যাতি লোকমুখে শুনেছিলেন—কিন্তু সে যে এমন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী এ তত্ত্বটার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। আর কী তার সেবা-যত্ন! বধূমাতাকে পাঁজর-সর্বস্ব বুকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা বলতেন, এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে পাগলি?

বৃদ্ধা তখন চলৎশক্তিহীনা। তবু বধূমাতাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। আহা, বেচারি ওঁর জন্যেই স্বামী ছেড়ে, সংসার ছেড়ে এতদূরে এসেছে। কীই-বা বয়স ওর? সখ-আহ্লাদের সময়। মোতির মা আর ভৈরব কিংবা কাব্যতীর্থকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কাশীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট; এমন কি একদিন কাব্যতীর্থ ওকে টাঙ্গায় করে দেখিয়ে এনেছেন ধামেকস্তূপ। ঘন অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অতীত যুগের সাক্ষী। কাছে যাওয়া যায় না, দেখবার কিছু নেই। গহন অরণ্যের মাঝখানে পরিত্যক্ত সে বিস্মৃত অতীতকে দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। টাঙ্গায় যেতে যেতে শুনল শাক্যমুনির জীবনকথা। মোতির মা আর ভৈরবও ছিল টাঙ্গায়। কাব্যতীর্থ মুখে মুখে বলতে থাকেন সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনী—সারনাথ মৃগদাবে তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন কাহিনী। মোতির মা দেখল ঊর্ধ্বগ্রীব উটের সারি—ভৈরব দেখল গাছে গাছে কত বেওয়ারিশ ফল ফলেছে, আর শঙ্করী লীন হয়ে গেল দু-আড়াই হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষে। কাব্যতীর্থের কাহিনী শুনতে শুনতে আবার সে যেন হারিয়ে গেল কাহিনী-বর্ণিত নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাত্রে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন—রাজবধূ যশোধরা অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। সুপ্রবুদ্ধ-তনয়ার প্রেম বেঁধে রাখতে পারল না উদাসীন শাক্যসিংহকে। শুনতে শুনতে মনে হয়—ওর যে বেদনা, যে বঞ্চনা তা তো নতুন নয়। এই তো চিরদিনের ভারতীয় নারীর নিয়তি। তবু যশোধরার একটা সান্ত্বনা ছিল। অন্তত জীবনের কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্তের সার্থকতা সে সাজিয়ে রাখতে পেরেছিল স্মৃতির মঞ্জুষায়। না হলে তার জীবনে 'কুমারসম্ভব' সার্থক হত না—কোল জুড়ে আসত না সোনার চাঁদ রাহুল!

কব্যতীর্থ মায়ের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। অমন সুরেলা অথচ দরাজকণ্ঠে ৺মায়ের নাম শুনলে কে না মুগ্ধ হয়? বৃদ্ধা বলেছিলেন, তুমি তাহলে আমাদের ন্যায়রত্ন মশায়ের পুত্র? তবে তো আমাদের ঘরের লোক। তুমি এ বাড়িতেই থাকবে। সিধের ব্যবস্থা করে দেব—তুমি স্বপাক আয়োজন করে নিও

আর রোজ সন্ধ্যায় এসে আমাকে ৺মায়ের নাম শুনিয়ে যাবে।

মোতির মা উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, ঠাকুর মশাই তো রোজ ছোট রানীমাকে শাস্তর পড়ে শোনাতেন—নৌকোয় আসবার কালে।

—তাই নাকি! তা বেশ তো। এখানেই থাক। ছোট বৌমাকে শাস্তর পাঠ করে শুনিও। কী নাম তোমার?

কাব্যতীর্থ করুণভাবে শঙ্করীর দিকে তাকিয়েছিলেন। আধো-ঘোমটা মাথায় শঙ্করী দাঁড়িয়েছিল অদূরে—মায়ের ঘর-জোড়া পালঙ্কের বাজু ধরে। মিটিমিটি হাসছিল সে। আচ্ছা জব্দ হয়েছেন এবার ঠাকুর মশাই। কারণ ছিল। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার'পর শঙ্করী নাম জানতে চেয়েছিল কাব্যতীর্থের। কিন্তু তিনি ক্রমাগত জবাবটা এড়িয়ে গেছেন। শঙ্করীর ধারণা হয়েছিল—পিতৃদত্ত নামের বিষয়ে কাব্যতীর্থের নিশ্চয় কোনও সঙ্কোচ আছে। হয়তো হাস্যকর কোন নাম। না হলে এতদিন সেটা তিনি জানাননি কেন?

হংসেশ্বরী তাগাদা দেন, কী নাম গো তোমার, হ্যাঁ ছেলে? কী বলে ডাকব?

কাব্যতীর্থ কোনক্রমে বলেন, এঁরা আমাকে 'ঠাকুর মশাই' বলে ডাকেন।

—ওরা ডাকুক। আমি বাপু তা পারব না। তুমি আমার নাতির বয়সী। তোমার ঠাকুরকে একদিন আমি ঐ নামে ডাকতাম। বাপ-মায়ের দেওয়া নাম তো একটা আছে। সেটা কী?

এবার কাব্যতীর্থ সসজ্জে বলেন, শঙ্করদেব।

চমকে ওঠে শঙ্করী। ওমা -এই জন্য! ছি ছি ছি! কোন মানে হয়? এত কাণ্ড যদি না হত, প্রথম দিনই সরল ভঙ্গিমায় যদি কাব্যতীর্থ নামটা বলে দিতেন তাহলে সঙ্কোচের কিছু থাকত না। নাম নামই। ওর নাম শঙ্করী বলে আর কারও নাম শঙ্কর হতে পারবে না?

এ নিয়ে পরে কিন্তু কোনও কথা হয়নি। শঙ্করদেব প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতেন, গান শোনাতেন, রামায়ণ অথবা চৈতন্যভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। হংসেশ্বরী ঘুমিয়ে পড়লে কখনও কখনও সংস্কৃত কাব্যপাঠ করেও শোনাতেন শঙ্করীকে। মেজেয় আঁচল বিছিয়ে ঘুমোত মোতির মা—আর ঘৃতপ্রদীপ-জ্বলা আধো-অন্ধকারে পাঠক এবং শ্রোতা বিচরণ করতেন অতীত যুগের ভারতবর্ষে—কাদম্বরী, বিক্রমোর্বশী, মেঘদূত-এর রাজ্যে। দীর্ঘ চার বছরে শঙ্করীর শব্দজ্ঞানও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। অন্বয়-ব্যাখ্যা ছাড়াই অনেক শ্লোকের অর্থ গ্রহণ হত তার।

সে একটা নতুন জীবন। অনাস্বাদিতপূর্ব।...

একদিন মহামায়া ওকে কাছে ডেকে বললেন, ছুট্‌কি, একটা কথা রাখবি ?

—কী ?

—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই আবার কাশী চলে যা।

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে শঙ্করী শুধু বলেছিল : না না !

—না কেন ? কিসের মিথ্যা অভিমান ? আমি জানি, সে শুধু তোর জন্যেই কাশীতে গেছিল এবার। আমার কাছে সে স্বীকার করেছে—সে অনুতপ্ত। বিশ্বাস কর্। তাছাড়া কাশীর মোকামে এখন কে আছে বল্ ? কে ওর্ দেখা-শোনা করে ? হয়তো সময়ে খায় না, নায় না, ঘুমোয় না। এতটা বয়স পর্যন্ত কখনও তো এমন নির্বান্ধব একা থাকেনি। তুই যা—মোতির মা আর ভৈরবকে সঙ্গে দিচ্ছি।

কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না শঙ্করী। কেন হবে ? শঙ্করী জানে, দেওয়ানজীর সঙ্গে বৈষয়িক প্রয়োজনে রাজা-মহাশয় যথারীতি পত্রালাপ করে থাকেন। এ কথাও শুনেছে, তিনি কাশী যাবার পথে পাটনা থেকে বড়রানীকে কী একটা গোপন পত্র পাঠিয়েছিলেন মাঝমহালে দেওয়ানজী সে পত্রের পাঠোদ্ধার করে শুনিয়েছিলেন বড়দিকে। তাহলে ? রাজা মহাশয় ইচ্ছে করলে তো তাকেও পত্র লিখতে পারতেন। তিনি তো জানেন—শঙ্করী মহামায়ার মত নিরক্ষরা নয় ; গোপন পত্র সে নিজেই পড়তে পারবে। তিনি যদি চান শঙ্করী পুনরায় কাশী যাত্রা করুক তাহলে অনায়াসে সেই মর্মে নির্দেশ পাঠাতে পারেন—তাকে, বড়দিকে অথবা দেওয়ানজীকে। যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ !

নাঃ ! ভুল হল। রাজা-মহাশয় 'অধম' নন, অধিগুণের অধিকারীই। এ শুধু ওর কপাল।

কিছুদিন পরে শঙ্করীই আবার এল বড়দির কাছে। বললে, একটা কথা ছিল বড়দি। ভাবছি সংস্কৃতটা শিখব।

—সংস্কৃত শিখবি ? সে তো বেশ কথা। কিন্তু তুই নিজেই তো অ-রাজী হয়েছিলি যখন রাজা-মশাই ব্যবস্থা করতে চাইলেন।

—সে তো পাঁচ বছর আগের কথা। এখন আমার মন বদলেছে। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। পড়াশুনাই শুরু করি।

—তা বেশ তো। দিলীপকে বলি একজন পণ্ডিতের সন্ধান করুক।

—সন্ধান করতে হবে না। তুমি ৺বাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত্ কাব্যতীর্থ মশাইকে সংবাদ দাও। তিনি রোজ সকালে দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায়—যখন তাঁর সুবিধে হয়, আমাকে পড়িয়ে যাবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত হল মহামায়ার। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মশাই দেহ রেখেছেন। তাঁর উপযুক্ত পুত্র কাব্যতীর্থ এখন পূজারী। একটি টোলও তিনি চালান—তাঁর পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী। মহামায়ার ভ্রূকুঞ্চন সেজন্য নয়—কিছু কানাঘুষা তাঁর কানে এসেছে। ঐ নবীন পণ্ডিত নাকি শঙ্করীর সঙ্গেই তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। হংসেশ্বরীর প্রিয়পাত্রও হয়েছিলেন। তাঁর শেষ কাজের ব্যবস্থা তিনিই করে দেন। ঐ প্রসঙ্গে মহামায়া শুনেছিলেন—কাব্যতীর্থ নাকি প্রতিদিন সন্ধ্যায় শঙ্করীকে কাব্যপাঠ করে শোনাতেন। মোতির মা মিথ্যা বলবে না তাঁর কাছে। নবীন পণ্ডিতের যে রূপবর্ণনা সে দিয়েছিল তাতে সন্দেহটা আরও বাড়ে। তবে পিসিমা এবং মায়ের সম্মতিক্রমেই যখন এ ব্যবস্থা হয়েছিল তখন মহামায়ার বলার কিছু নেই। বিশেষ—ওঁরা গুরুকুলের বংশ।

তবু মহামায়া ইতস্তত করে বলেছিলেন, তাঁর কত কাজ। ৺বাসুদেবের নিত্য সেবা আছে, চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আছে। তার চেয়ে আমি বরং অন্য কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে দিই। পড়াশুনা করতে চাস, এ তো ভাল কথাই।

শঙ্করী বলেছিল, না, অন্য কোন পণ্ডিতের কাছে আমি পড়ব না। ওঁর যদি সময় বা সুবিধে না হয় তাহলে তিনি নিজেই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। তুমি খবর পাঠিয়েই দেখ না?

মহামায়া গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তোর ভালর জন্যই বলছি। উনি বয়সে নবীন তো—

শঙ্করীও গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আজ আর আমি তের বছরের ছোট্ট খুকিটি নই বড়দি। নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

—বেশ। যা ভাল বুঝিস কর্।

দশ

সাত বছর পরের কথা। টিপু সুলতানের মৃত্যু-বৎসর। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হচ্ছে। মহামায়া এখন পঞ্চাশোর্ধ্বা বৃদ্ধা, শঙ্করীর বয়স সপ্তবিংশতি বর্ষ। এ সাত বছরে যেমন তিল তিল করে ভেঙে পড়েছে বড়রানীমার স্বাস্থ্য, ঠিক তেমনি ভাবে বিকশিত হয়েছে নিঃসন্তানা সীমন্তিনী শঙ্করীদেবীর তনুদেহ। পরিপক্ক ফলভারে আনম্র আঙুরলতার মত। আজ সাত বৎসর নৃসিংহদেব প্রবাসী। একবারও আসেননি স্বদেশে। তিনি কী করেন কেউ খবর রাখে না। তবে

কাশীতেই আছেন। নিয়মিত পত্র আসে দেওয়ান দিলীপ দত্তর কাছে। সংসারে বীতরাগ হননি নিশ্চয়—না হলে এত খুঁটিনাটি বৈষয়িক নির্দেশ আসত না তাঁর পত্রে। শোনা যায়, তিনি ভূকৈলাশের রাজার অর্থানুকূল্যে 'কাশীখণ্ড' রচনা করছেন। সেইটাই তাঁর উপার্জনের রাজপথ। আরও কী সব করেন। প্রতি পত্রেই দেওয়ানজীকে তাগাদা দেন—জানতে, রাজকোষে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত। সাত লক্ষ তঙ্কার তহবিল পূর্ণ হতে আর কত বাকি? প্রায় ষাট বৎসর বয়স হল তাঁর—জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। তবু সংকল্পচ্যুত হননি। পিতৃরাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন তাহলে তিনি আজও দেখেন।

ইতিমধ্যে বংশবাটির রাজান্তঃপুরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যাতে আর স্থির থাকতে পারলেন না মহামায়া। তিনি এবার নিশ্চিত বুঝেছেন—তাঁর কাল ঘনিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য তাঁর চিরকালই খারাপ। সাহেব ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসায় পুনর্জীবন লাভ না করলে বহুদিন পূর্বেই তাঁর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার কথা। বেঁচে গেছেন, কিন্তু তিল তিল করে শরীর ভেঙে যাচ্ছে। বর্তমানে তিনি বস্তুত শয্যালীন। মহামায়া বুঝলেন, অনতিবিলম্বে রাজা-মহাশয় যদি বংশবাটিতে প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহলে ইহজন্মে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আশা নেই।

তাছাড়া আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাতে আর বিলম্ব করা কোনমতেই উচিত হবে না। মহামায়া ডেকে পাঠালেন দেওয়ানকে। এখন আর মাঝ-মহাল নয়, দিলীপ ঘরের ছেলেই হয়ে গেছেন। কানাইয়ের মা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বড়রানীমার মহালে।

—বস দিলীপ। তোমার সঙ্গে কথা আছে। জরুরী এবং গোপন।

দিলীপ বড়রানীমার পদধূলি নিয়ে একটি গদিমোড়া কেদারায় বসেন। বলেন, জরুরী এবং গোপন পরামর্শের প্রয়োজন না হলে তো, আপনি আমাকে ডাকেন না বড়মা। বলুন? কিন্তু তার আগে বলুন—আপনার শরীর কেমন আছে? কবিরাজ মশাই কি বলছেন?

—কবিরাজ মশাই যাই বলুন, আমি বুঝতে পারছি দিলীপ—আমার সময় আর বেশী বাকি নেই···না না, আমাকে বাধা দিও না। জরুরী কথাগুলো বলে নিতে দাও। রাজা-মহাশয় যদি মাস তিন-চারের মধ্যে ফিরে না আসেন তাহলে খুব সম্ভব তাঁকে আর দেখতেই পাব না। তা ছাড়াও এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে—সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি—যেজন্য অনতিবিলম্বে তাঁর বংশবাটিতে ফিরে আসার প্রয়োজন। এখন বল, কী ব্যবস্থা করা যায়?

দিলীপ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি যতদূর জানি—রাজা-মহাশয়ের প্রত্যাবর্তনের পথে দুটি বাধা। প্রথম বাধাটা কী, তা আমি জানি না; কিন্তু আপনি জানেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় মহামায়ার। বলেন, বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ তুমি?

—সাত বছর পূর্বেকার কথা স্মরণ করুন বউমা। পাটনা থেকে লেখা পত্রে রাজা-মহাশয় বলেছিলেন, তিনি আপনার কাছে সত্যবদ্ধ—কী একটা জিনিস না নিয়ে তিনি ফিরবেন না।

মহামায়া বলেন, বুঝেছি। না, সেটা আদৌ বাধা নয়। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয় অন্তরায়—রাজা-মহাশয় প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন—রাজকোষে সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত না হলে তিনি রাজবাটিতে প্রত্যাবর্তন করবেন না।

—জানি। কত তঙ্কা সঞ্চয় হয়েছে ইতিমধ্যে?

—ছ লক্ষ।

—ঠিক আছে। তুমি তাহলে রাজা-মশাইকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাও যে সাত লক্ষ তঙ্কা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। তিনি যেন পত্রপাঠ প্রত্যাবর্তন করেন। আমার স্বাস্থ্যের কথাও জানাবে এবং লিখবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে না পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

দিলীপ দত্ত অধোবদনে বসে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত।

—না মিথ্যা লিখতে আমি বলিনি। তার আগে তুমি নীলমণি স্যাকরাকে সংবাদ দাও। তাকে নিয়ে নিজেই এস। আগামীকাল সকালে। সে যেন নিক্তি-পাল্লা এবং নগদ এক লক্ষ তঙ্কা নিয়ে আসে। আমি আমার সমস্ত যৌতুক অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে দেব। তার মূল্য এক লক্ষ তঙ্কার বেশি বই কম নয়।

দিলীপ অবাক হয়ে বলেন, কী বলছেন মা! আপনি সব কিছু বিক্রয় করে দেবেন? নিঃস্ব হয়ে যাবেন?

হাসলেন মহামায়া। বললেন, নিঃস্ব কেন হব দিলীপ? বিনিময়ে নিঃসন্তানা সীমন্তিনী পাবে স্বামীর চরণধূলি। মৃত্যুপথযাত্রিনীর সেটাই তো একমাত্র পাথেয়। একরাশ গহনা আঁকড়ে থাকলে তো আমি স্বর্গে যাব না? আমার কে আছে, যাকে দিয়ে যাব? মেয়ে নেই, পুত্রবধূ নেই। বংশে বাতি দিতে আর কে রইল?

দিলীপ উঠবার উপক্রম করেন। বলেন, তবে তাই হোক। যেরকম আপনার অভিরুচি।

—না। বস; আরও কথা আছে। এ কাজটা আরও গোপন এবং গুরুতর।

তুমি ৺অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের জন্য একজন ভালো পুরোহিতের ব্যবস্থা কর। অবিলম্বেই।

—কেন রানীমা? আমাদের কাব্যতীর্থ মহাশয়—

—হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে জানিয়ে দাও—বড়রানীমার ইচ্ছা তিনি কাশী; হরিদ্বার, বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে গিয়ে নতুন টোল খুলে বসুন। এ-জন্য রাজ-তহবিল থেকে তাঁকে সহস্র তঙ্কা প্রণামী দিও।

দিলীপ অবাক হয়ে যান। একটা কানাঘুষা তাঁর কানেও এসেছে। বিশ্বাস করেননি। এখন সন্দেহ হল, তাহলে তার কিছু বাস্তব বনিয়াদ আছে। না হলে সহস্র রজতখণ্ডের বিনিময়ে বড়রানী ঘৃতকুম্ভ এবং অগ্নির মাঝখানে এভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইবেন কেন? একটু ভেবে বলেন, আর কাব্যতীর্থ মশাই যদি জানতে চান, বড়রানীমার এমন অদ্ভুত ইচ্ছা হল কেন? কী বলব?

—প্রস্তাবটা তোমার কাছে যতটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে, ঠাকুর মশায়ের কাছে অতটা অপ্রত্যাশিত হবে বলে মনে হয় না। তবু তিনি যদি প্রশ্ন করেন, তখন ব'ল, কারণটা তিনি যেন আমার কাছ থেকে জেনে নেন। আর কথাটা যেন গোপন থাকে।

কথাটা গোপন থাকেনি। ওদের দুজনের কেউই জানতেন না, দেওয়ান দিলীপ দত্ত দ্বার রুদ্ধ করার পর কানাইয়ের মা সচকিত হয়ে উঠেছিল। এ পথে কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়ে রুদ্ধদ্বারে সে কান চেপে ধরেছিল। প্রথমাংশটা না-হলেও কথোপকথনের শেষ দিকটা শুনেছে। হাজার দু হাজার বছরের ঐতিহ্য। রাজবাড়ির কিঙ্করীরা জানে—রাজমহিষী যখন রুদ্ধদ্বার কক্ষে দেওয়ানজীর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেন, তখন দধিভক্ষণমানসে ঠিকমত কান পাততে পারলে 'নেপো'র ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। ঐ জাতীয় গুহ্য-তথ্য কখনও কখনও অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা যায়। তার একটা বাজার-দর আছে। তুঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে তার মূল্য হতে পারে রাজপুত্রের হাতের হীরক-খচিত অঙ্গুরীয় অথবা রাজমহিষীর কণ্ঠের শতনরী।

দেওয়ান দিলীপ দত্তকে পথ দেখিয়ে অন্দরমহলটা পার করিয়েই কানাইয়ের মা নাচতে নাচতে ফিরে আসে ছোটরানীমার মহালে। সবার আগে বন্ধ করে দেয় দ্বার। শঙ্করী চমকে উঠে বলে, ও কি করছিস রে?

হাত দুটি কচলে কানাই-জননী বলে, একটা কথা কইতে এনু ছোটরানীমা। এখন বল—ভয়ে বলব, না নিভ্‌ভয়ে বলব?

শঙ্করী দীর্ঘদিন আছে রাজাবরোধে—আবাল্য। তবু এজাতীয় খানদানী

সবজে তার অধিকার নেই। বললে, ও আবার কি ঢং! কি বলবি বল্ না।

—কতাটা শুনে আমার গর্দ্দানা নেবে না তো?

—গর্দানা নেবার মত কথা বললে ছেড়েই বা দেব কেন!

—অ্যাই ছাখো! তবে থাক বাপু! আমি যাই।—ঠিক প্রস্থানোদ্যতা নয়, প্রস্থানের একটি ভঙ্গি করে ত্রিভঙ্গ ঠামে প্রতীক্ষা করতে থাকে। শঙ্করী ধমক দেয়, ন্যাকামি করিস না। কী বলতে এসেছিস বল্।

কানাইয়ের মা মুখটা ওর কানের কাছে এনে বললে, তোমার ঠাকুর মশায়ের জবাব হই গেল যে! বড়রানীমা দেওয়ানজীরে ডাক্যে বললে, তে-রাত্তিরের ভিৎরি তাঁরে বংশবাটি থিকে খেইদে দিতে হবে। নতুন পূজারী বহাল হচ্ছে বাসুদেব মন্দিরের জন্যি।

চমকপ্রদ সংবাদ বটে। এমন একটা আঘাত আশঙ্কাতীত নয়, তবে এমন অতর্কিতে তা আসবে এটা ভাবেনি। শঙ্করী বলে, তুই কেমন করে জানলি?

—আই ছাখো! আমি নিজের কানে শুনেছু যে! তবে হ্যাঁ, মাথা মুইড়ে ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চইড়ে তেনারে খ্যাদাতে বলেনি। বরং হাজার তঙ্কা খেশারদের হুকুম হয়েল!

—কী বলছিস যা-তা? একবর্ণ বুঝছি না!

কানাইয়ের মা তখন সমস্ত কথোপকথনটা ব্যক্ত করে। বড়রানীমার সঙ্গে দেওয়ানজীর প্রথম দিকে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা সে শোনেনি। তখন সে ব্যস্ত ছিল তার আড়িপাতার ব্যাপারটার নিরাপত্তা বিষয়ে। তাই রাজা-মশাইয়ের প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ এবং বড়রানীমার গহনা বিক্রি করার কথা সে জানে না। কিন্তু শেষাংশটুকু ঠিকই শুনেছে।

সবটা শুনে শঙ্করী বলে, অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না। অকারণে বড়দি কেন ওঁকে বরখাস্ত করবেন?

—অকারণ কি গো? বড়মা যে সব বিত্তান্ত জান্তে পেরেছে।

—সব বৃত্তান্ত, মানে? কী বলতে চাইছিস?

মিশিমাখা কালো হাসি হাসল প্রৌঢ়া। নেহাৎ না-বিইয়ে সে কানাইয়ের মা হয়নি। বড় ঘরের বহু কেচ্ছা তার জ্ঞানসীমায়। অনেক অনেক রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি, বামুনবাড়ির গোপন কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রাজার তিন রানী। রাজা পড়ে থাকেন বিলাসকুঞ্জে রক্ষিতাকে নিয়ে, রানীরা যথেচ্ছ অভিসার চালায়। অশীতিপর কুলীন ব্রাহ্মণ এক পিঁড়িতে বসেই একসঙ্গে পিসী-ভাইঝির জাত বাঁচান; তারপর পিসে আর ভাই-ঝি-জামাইয়ের বকলম কখন কে হয় কে

তার খবর রাখে। ঘরে ঘরে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'—ঠিক যেমনটি ঘটেছে নৃসিংহদেব আর শঙ্করীর মধ্যে। না, এতে দোষ নেই কিছু। অন্তত কানাইয়ের মা এতে দোষের কিছু দেখে না। ষাট বছরের বুড়ো পড়ে রইল কাশীতে আর বিশ বছরের রানীমা যদি ছাব্বিশ বছরের জোয়ান বামুনঠাকুরকে নিয়ে—

—কী হল? বল্? কী বলতে চাইছিস তুই?

ফিক্ করে হেসে কানাইয়ের মা বললে, আমার কাছে খামকা লুকোচ্ছেন ছোটরানীমা। আমি সব জানি। আর সে জন্যি দোষও ধরি না কিছু। আমারও তো একদিন ঐ বয়স ছেল। তোমার ভরা যৌবন, অমন রূপ—

চাপা গর্জন করে ওঠে শঙ্করী: চুপ কর্! হতচ্ছাড়ি!

—বেশ চুপ গেনু! আমার ছোট মুখে বড় কথা না হয় নাই বলনু!

উত্তেজনায় শঙ্করী ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে, কই চল্ তো দেখি আমার সঙ্গে বড়দির কাছে। তাঁকে তোর সামনেই জিজ্ঞাসা করব আমি।

আকাশ থেকে পড়ে কানাইয়ের মা: ওমা, আমি কনে যাব! হ্যাঁ, ছোটরানীমা, এ কথা কি যাচিয়ে দেখার? পেত্যয় না হয় তে-রাত্তির সবুর কর, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। শুধাতে গেলে বড়রানীমা আমার কী হেনস্তা করবে কও দিনি। সেই যারে বলে 'হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা', তাই করবে না?

শঙ্করীর মুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। ঠিক কথা। কানাইয়ের মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারে—এর সত্যতা ওভাবে যাচাই করা যাবে না। কিন্তু সব শুনে ওর মনে হল—কথাটা মিথ্যে নয়। বললে, ঠিক আছে। তুই যা এখন আমার সামনে থেকে।

—'যা' কী গো? আমার বখ্‌শিশ?

—বকশিশ! বকশিশ কিসের?

—ওমা আমি ক'নে যাব! খবর বেচনু কড়ি মিলবে না?

হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল শঙ্করী: তুই যা করেছিস তাতে আমারই ইচ্ছে করছে তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে। শোন্, এর পর যদি কোনদিন জানতে পারি কারও ঘরে আড়ি পেতেছিস তাহলে জ্যান্ত তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব। যা!

কানাইয়ের মা অভিজ্ঞ। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, এটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। মনে মনে ছোটরানীমায়ের মুণ্ডপাত করতে করতে পালিয়ে বাঁচে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বড়রানীমা ডেকে পাঠালেন শঙ্করীকে। শঙ্করী বুঝতে

পারে, এবার একটা চরম বোঝাপড়ার সময় এসেছে। ব্যাপারটা গ্লানিকর, তবু উপায় নেই, মনকে শক্ত করে সে এসে দাঁড়ায় বড়রানীর শয়নকক্ষে। মহামায়া শুয়েই ছিলেন—আজকাল তিনি সারাক্ষণই শয্যাশায়ী, পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় রয়েছেন। একটি দাসী তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। তাকে ছুটি দিয়ে শঙ্করীকে বললেন, আয় রে ছুট্‌কি। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বিনা বাক্যব্যয়ে শঙ্করী দ্বার রুদ্ধ করে তার বড়দির মুখোমুখি দাঁড়ায়। অপ্রিয় আলোচনাটা অনিবার্য—মনকে আবার শক্ত করে। মহামায়া বলেন, এবার সিন্দুকটা খোল্ দিকিন। তোর আর আমার গয়নাগুলো আলাদা আলাদা প্যাটরায় আছে, নিয়ে আয়।

রীতিমত অবাক হল শঙ্করী। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অলঙ্কারের কি সম্পর্ক? দুই রানীমার যাবতীয় মূল্যবান অলঙ্কার সুরক্ষিত আছে বড়রানীমার শয়নকক্ষে, দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুকে। তার অবস্থান সম্বন্ধে শুধু ওঁরা দুজনেই অবহিত। একটি তৈলচিত্রের অন্তরালে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা আছে সিন্দুকের পাল্লাটা। চাবি এতদিন ছিল বড়রানীমার কাছে—এখন থাকে শঙ্করীর আঁচলে। আদেশমত শঙ্করী তৈলচিত্রটা অপসারিত করল; সিন্দুক খুলে দুটি মণি-মঞ্জুষা নিয়ে এসে রাখলো পালঙ্কের উপর। বললে, হঠাৎ কি হল?

হাসলেন মহামায়া: গয়নাই মেয়েমানুষের প্রাণ! তাই প্রাণটা বেরুবার আগে একটু নাড়াচাড়া করতে চাই। আয় বস্ দেখি!

শঙ্করী নিঃশব্দে বসল পালঙ্কের একান্তে। মহামায়া একটি একটি করে গহনা বার করে দেখলেন। দুটি বাক্সেই দুটি তালিকা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, কি বলিস?

—আমি আবার কী বলব? বন্ধ আলমারিতে যা ছিল তাই আছে।

—তা তো বটেই। এবার এগুলো তুলে রাখ্। সিন্দুক বন্ধ করে চাবিটা আমার কাছেই রেখে যা।

শঙ্করী আদেশ পালন করল। তারপর তৈলচিত্রটি যথাস্থানে টাঙিয়ে এসে বসল বড়দির কাছে। অনেক খোশগল্প হল। পুরানো দিনের রোমন্থন; কিন্তু মহামায়া কাব্যতীর্থের কোন প্রসঙ্গই তুললেন না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে শঙ্করী ভাবতে বসল—এমন করার অর্থ কী? অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর একটা সমাধানের ক্ষীণ আভাস পেল—কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। এত দূর? ধরা যাক, বড়দির মনে সন্দেহ

জেগেছে—ছোটরানীর সঙ্গে একজন পরপুরুষের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার মানে কি এতদূর বড়দি চিন্তা করতে পারল যে, তুই রানীর গহনা যাচাই হওয়া দরকার? শঙ্করী কি তলে তলে তার গহনা সরাচ্ছে? অথবা আরও কদর্য চিন্তা—লালসার বশে সে বড়রানীর অলঙ্কারে হাত দিয়েছে। আগুন ধরে গেল শঙ্করীর মাথায়। ছি ছি ছি। এতদূর ভাবতে পারল বড়দি? না হলে এমন হঠাৎ রুদ্ধদ্বারকক্ষে তালিকা মিলি[illegible] গহনা যাচাই করার প্রয়োজন হল কেন? কেন চাবিকাঠিখানা এতদিনের মতো শঙ্করীর আঁচলেই বাঁধা হল না তাহলে তো কানাইয়ের মা মিথ্যা বলেনি। কাব্যতীর্থকে বিতাড়নের আয়োজন নিশ্চয় করেছে বড়দি।

বার-কয়েক পায়চারি করল ঘরময়। মনস্থির করল। তারপর ডেকে পাঠালো মোতির মাকে। বললে, মোতির মা, তোকে একটা কাজ করতে হবে। কেন, কি বৃত্তান্ত জানতে চাইবি না, আর ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখা চাই। পারবি

অবাক দুটি চোখ মেলে মোতির মা বলে, বল?

—তুই এখনই বাসুদেবের মন্দিরে চলে যা। তাঁকে গোপনে বলবি, আজ শয়নারতির পর তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সদর দিয়ে নয়, খিড়কির দরজা দিয়ে। আনতে পারবি তাঁকে? আমার শোবার ঘরে?

আদেশটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবু বিশ্বাসও যে হতে চায় না। সব জেনে বুঝেও একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য মোতির মা বললে, কার কথা বলছ গো? ঠাকুর মশাই? শোবার ঘরে।

—হ্যাঁ, কাব্যতীর্থ মশাই। পারবি? কেউ যেন না টের পায় বড়দিও না।

মোতির মায়ের চোখ দুটি হঠাৎ ছলছল করে ওঠে। বেচারী সত্যিই ভালবাসে তার ছোটরানীমাকে। আয়ী-মায়ের দেহান্তর হবার পর সেই বোধ করি রাজবাড়ির মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ধরা গলায় শুধু বললে, পারব। কিন্তু কিছু মনে করনি ছোটমা। কথাটা নিজের কানে শুনেও আমার পেত্যয় হচ্ছেনি!

শঙ্করী ওর হাতটা তুলে নিয়ে বলে, মোতির মা, তুই আমাকে যতটা দেখেছিস, যতটা চিনিস আর কেউ তা জানে না, চেনে না। বল্ তুই—আমি কোন অন্যায় কাজ কখনও করেছি? করতে পারি?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মোতির মা বললে, তাই তো বলছি গো ছোটমা।

—আমার কথা ছেড়ে দে। আমি সামান্য মেয়েমানুষ। মতিভ্রম হতে কতক্ষণ? কিন্তু তাঁকে তো দেখেছিস—বছরের পর বছর! তিনি কোনও অন্যায় কাজ করতে পারেন? বিশ্বাস কর্ মোতির মা—এর ভিতর অন্যায় ব্যভিচার কিছুই নেই। তাঁকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। তাঁর একটা বিপদ হয়েছে। যে কথা সবার সামনে বলা যায় না। তাই তাঁকে ডাকছি। বলিস, আমার বড় বিপদ!

—তা কাল দিনমানে ডেক না বাপু!

—না। আজ রাত্রেই সেটা সারতে হবে। বল্, পারবি নে? তুই কী পুরস্কার চাস বল্।

মোতির মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, আমি দাসীবাঁদী, যা পাব্বনী দেবে মাথা পেতে নেব। তবে এ কাজের জন্যে কিছু নিতে পারবনি বাপু। তুমি হুকুম দেছ, আমি তামিল করব। তারপর তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই, আমার ধম্ম আমার ঠাঁই!

মোতির মা চলে যায়। শঙ্করী বুঝতে পারে—মোতির মার শ্রদ্ধাও সে হারালো। উপায় নেই। এ তাকে করতেই হবে। শঙ্করী এবার বড়দির দাবার চালের উল্টো চাল দেবে। এজাতীয় রাজনীতি তার ভাল লাগে না; কিন্তু তাকে যে বাধ্য করা হচ্ছে।

কাব্যতীর্থ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মোতির মায়ের মুখ-বার্তাটা শুনে। বললেন, তুমি কিছু ভুল করছ না তো মোতির-মা? আমাকেই ডেকেছেন তিনি?

—হ্যাঁ গো। তোমারেই। ৺বাসুদেব মন্দিরের পুরুত আবার ক'জন আছে? তার উপর বললেন, 'কাব্যতীর্থ'। তোমারেই।

—এবং স্থানটা তাঁর শয়নকক্ষ? সময়টা শয়নারতির পর?

—এক কথা তোমায় কতবার বলব বামুন ঠাকুর?

—কাল সকালে গেলে হয় না?

—না, হয় না। বলেছে তাঁর বড় বিপদ। আজ রেতেই আপনারে বলতে হবে।

কাব্যতীর্থ দীর্ঘ সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মোতির মায়ের পক্ষে সেই নিবাত প্রদীপশিখার মত স্থির মানুষটা কী ভাবছিলেন তা বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয়। অনেকক্ষণ পর বললেন, তথাস্তু। আমি স্বীকৃত। কিন্তু কীভাবে যাব?

—আমি এসে তোমারে নে যাব। চাঁদনি রাত, আলো লাগবেনি। খিড়কি দুয়ার দিয়ে যেতে হবে নে। তাঁর ঘরের দোর পর্যন্ত পৌছে দেব—তারপর তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই, আমার ধম্ম আমার ঠাঁই!

কাব্যতীর্থের মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাস্যরেখা। বললেন, বড় দার্শনিক উক্তি করেছ মোতির মা। তিনি ডেকেছেন; বলেছেন তাঁর বিপদ। আজ রাত্রেই সে কথা বলতে হবে! বেশ আমি যাব—তারপর তাঁর ধর্ম তাঁর এবং আমার ধর্ম আমার।

এক প্রহর রাতে মোতির মা এসে নিয়ে গেল কাব্যতীর্থকে। সমস্ত বংশবাটি তখন নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা-রাত্রেই মানুষজন শয্যা নেয়। রাজবাড়ির দেউড়িতে নটার ঘণ্টা বাজার অর্থ বংশবাটি গ্রামের নিষুতি রাত। জেগে আছে শুধু লাখ লাখ জোনাকি—আর জেগে আছে আকাশের অগুন্তি কৌতূহলী তারা। না, আরও কেউ কেউ জেগে আছে। খোলা গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসছে বিনিদ্র কোন মাঝির লোকায়ত সঙ্গীত। প্রাকৃত ভাষায় রচিত দেশওয়ালী গান, যার ভাবার্থ—'ওরে ভোলা মন! পাঁচ শত্রু তোকে পিছন থেকে টানছে, কিন্তু ভুলিস না—তোর মিত্র তোর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন!' না, ভুলবেন না কাব্যতীর্থ। কিছুতেই ভুলবেন না পঞ্চেন্দ্রিয়ের কুহেলিকায়! স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু!

রাজবাড়ির খিড়কির দরজা খুলে রেখেই গিয়েছিল মোতির মা। বংশবাটির রাজবাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশে কোনও বাধা হল না। নিরাপদেই মোতির মা অতিথিকে নিয়ে আসতে পারল ছোটরানীর মহালে—মেথর-খাটার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। ছোটরানীমার ঘরে আলো জ্বলছিল না। পায়ের সাড়া পেয়ে তিনি প্রদীপ জ্বাললেন; পিছনের দ্বার খুলে দিয়ে শুধু বললেন, আসুন। মোতির মা, তুই বাইরেই অপেক্ষা কর্। আধঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুর মশাই ফিরে যাবেন। তাঁকে রাজবাড়ির বার করে দিলেই তোর ছুটি।

ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মোতির মায়ের মুখখানা করুণ দেখালো। যেন বিসর্জনের পূর্বমুহূর্তে ঢাকীর মুখ।

কাব্যতীর্থ বললেন, প্রথমটায় আমার বিশ্বাসই হয়নি রানীমা। এখন বুঝছি, আপনি সত্যিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন? কী হয়েছে? কি বিপদ আপনার?

—বলছি। বসুন।

যথারীতি পশমের আসন পাতাই আছে। কাব্যতীর্থ খড়ম পরে আসেন-

নি—আসতে আসতে তাঁর মনেও হয়েছিল সেকথা—কালিদাসের বর্ণনা। অভিসারিকা যখন নৈশ অভিযানে যায় তখন নূপুর খুলে রেখেই যায়। রাধা-মাধব! রাধামাধব!

কাব্যতীর্থ ধুলোপায়েই বসলেন আসনে। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ভূশয্যাতেই বসল শঙ্করী। কাব্যতীর্থ লক্ষ্য করে দেখলেন--ছোটরানীমা আজ তিলমাত্র প্রসাধন করেননি। অন্যদিন যেটুকু সাজসজ্জা থাকে আজ তাও নেই। লাল-পাড় একটি কার্পাসের বস্ত্র তাঁর অঙ্গে। আভরণ কি জানি কেন, সব খুলে রেখেছেন। শুধু দুই হাতে এয়োতির চিহ্ন দুগ্ধধবল শঙ্খ, আর কামাক্ষ্যা মায়ের নোয়া। ছোটমায়ের এমন নিরাভরণা রূপ কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না কাব্যতীর্থ। বলেন, এবার বলুন?

এগারো

মোতির মার ধারণা সে সম্পূর্ণ গোপনে কাব্যতীর্থকে পৌঁছে দিতে পেরেছে ছোটরানীমায়ের শয়নকক্ষে। কাব্যতীর্থ এবং শঙ্করীও সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই নিশ্চিন্তে নিভৃত আলাপে রত হলেন। ওঁরা কেউই জানতে পারেননি—ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল একজন—কানাইয়ের মা।

কানাই বালকমাত্র; তার বাপ গঙ্গালাভ করেছে আজ বছর পাঁচেক। তাই শয়নারতির পর—রাজবাড়ি নিঝুম হলে—কানাই-জননী মাঝে মাঝে বংশীর ঘরে যায়। বংশী উৎকলদেশীয়। বার-মহালের ভৃত্য। স্ত্রীপুত্র সে দেশে রেখে এসেছে। তাই কানাই-জননীর অনিয়মিত আবির্ভাবে তার আপত্তি ছিল না কিছু, আগ্রহ ছিল। আজকের রাতটি ঘটনাচক্রে কানাই-জননীর তেমনি একটি চিহ্নিত অভিসার-রাত্রি। কাজকর্ম সেরে, শাড়ি পালটিয়ে, কপালে কাঁচপোকার টিপ, গালে পান ও পায়ে আল্‌তা দিয়ে সে খোশ-মেজাজে খিড়কির দরজায় এসে দেখে সেটি অর্গলমুক্ত। এমন তো হবার কথা নয়। কার কাণ্ড? কেন? হঠাৎ তার মনে হয় কারা যেন আসছে। কানাইয়ের মা তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করে। কাব্যতীর্থকে নিয়ে মোতির মা ছোটরানীমার মহালের দিকে সঙ্গোপনে এগিয়ে যেতেই সে আহ্লাদে আটখানা হবার উপক্রম করে। একবার দাঁও ফসকেছে, এবার কিছুতেই ফস্‌কাবে না। ছোটরানীমায়ের উপর তার প্রচণ্ড রাগও হয়েছিল—ভালো করলে মন্দ হয়! উনি করবেন লুকিয়ে পীরিত—তা

কর না পাপু—কিন্তু সেকথা দাসীবাঁদীর মুখে শুনলেই অমনি কুলোপানা চক্কর। ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো, পিঠের চামড়া তুলে নেবো। এবার কানাইয়ের মা দেখে নেবে কে কার পিঠের চামড়া তোলে! ঐ ফোঁটা-কাটা বামুন ঠাকুরকে হাতেনাতে ধরতে পারলে তার পুরস্কার বাঁধা। বড়রানীমা তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে সতীনকে। কাল শহরগঞ্জে ঢি ঢি পড়ে যাবে। বড়ঘরের কেচ্চা ফিরবে মুখে মুখে।

আনন্দে ডগমগ কানাইয়ের মা বকের মত পা ফেলে ফেলে এসে হাজির হল বড়রানীর মহালে। বড়রানী বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। হায় আমার পোড়া কপাল—মনে মনে বললে কানাইয়ের মা—পাশের মহালে তোর সতীন পীরিত করছে, আর তুই নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিস!

—বড়রানীমা, ও বড়-রানী-মা!

—কে? কি হয়েছে? কে তুই? কী চাস্?

—আমি কানাইয়ের মা—একবার উঠতে হবেনে তোমারে।

—উঠতে হবে! কেন? আলো জ্বালিসনি কেন? অন্ধকারে মাঝরাতে—

—আলো জ্বাললে পাখি পালাবে। শোন কেন—

কানে কানে গুহ্যবার্তাটি সে নিবেদন করে। এবার আর জানতে চায় না—ভয়ে বলবে না নির্ভয়ে বলবে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে উঠে বসলেন মহামায়া। এ যে অবিশ্বাস্য। এত বড় সাহস হবে ছুট্‌কির? নিজের শয়নকক্ষে পরপুরুষ ঢুকিয়ে—

—তুই ঠিক দেখেছিস? আমার গা ছুঁয়ে বল্।

—ওমা আমি কোথায় যাব। মিথ্যে বললে আমার জিভ খসে যাবে না! তবে একটু তড়িঘাড় করতে হবে বাপু—যদি হাতে-নাতে ধরতে চাও।

অনেকদিন খাট থেকে নামেননি। দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে ওঠে; কিন্তু আজ তাঁর মর্মান্তিক প্রয়োজন। বললেন, আমাকে ধর্। তোর কাঁধে ভর দিয়ে যাব। শোন্, ওর ঘরের সামনে পৌছে দিয়ে দূরে সরে যাবি। আড়ি পেতেছিস জানতে পারলে—

—সে আর বলতি হবেনি বড়রানীমা। এস কেনে—

কানাইয়ের মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল শরীরে টলতে টলতে নির্জন বারান্দা পার হয়ে পুব-মহালে এসে পৌছলেন। নির্দেশ দেওয়াই ছিল। ছোট-রানীমার দরজার সামনে ওঁকে বসিয়ে দিয়ে কানাইয়ের মা সরে গেল শ্রুতিসীমার বাইরে। দারুণ ইচ্ছা করছিল তার আড়ি পাততে। বড় ঘরের বড় মানুষরা কী

জাতের পীরিত করে জানবার কৌতূহল প্রবল ; কিন্তু তার সাহস হল না। মহামায়াকে সে যমের মত ভয় পায়।

ক্লান্ত অবসন্ন মহামায়া বসে থাকতে পারলেন না, মার্বেল পাথরের চৌখুপী কাটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। কর্ণমূল প্রবিষ্ট করে দিলেন ভেনিশীয় পাল্লার ফাঁকে, দরজার গায়ে। হ্যাঁ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। দুজনে অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলছে—অভিসার-রাত্রে অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকা যেভাবে কথা বলে। একটি পুরুষ কণ্ঠ, একটি নারীর। দুটি কণ্ঠস্বরই সনাক্ত করা যায়। শঙ্করী তাঁর কন্যার মত—তার এই মর্মান্তিক অধঃপতনে বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল মহামায়ার। ইতিপূর্বে কী কথাবার্তা হয়েছে জানা নেই। কান পেতে উনি শুনলেন কাব্যতীর্থ বলছেন, আমাকে মার্জনা করবেন ছোটরানীমা। আমি আপনার অনুরোধ রাখতে অশক্ত।

চমকে ওঠেন মহামায়া। ছোটরানীমা! মা! এ আবার কোন্ জাতের সম্বোধন? সীমিত সাহিত্যজ্ঞানেও নিরক্ষরা মহামায়ার এটুকু জ্ঞান ছিল—এ ভাষা পীরিতের নয়। অবৈধ প্রণয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাহলে?

শঙ্করীর কণ্ঠস্বর এবার শোনা গেল, কিন্তু কেন? আপনি আমাদের কুল-গুরুর বংশধর। বহু মুমুক্ষুকে আপনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। তাহলে আমাকেই বা এভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন কেন?

—হেতু একটা ছেড়ে আমি দশটা দেখাতে পারি রানীমা। প্রথমতঃ আমার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে আপনাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমার স্বর্গত পিতৃদেব ন্যায়রত্ন মহাশয় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন ; কিন্তু আমি—

বাধা দিয়ে শঙ্করী বললে, স্বামীর অনুমতি আমি নিশ্চয় আনিয়ে নেব। আর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেব একথা তো আমি বলিনি—

শঙ্কর বলেন, আমার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ হয়নি রানীমা। আমি বলছিলাম—হেতু আমি দশটা দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে মিথ্যাচার। মূল বাধা যেটি আছে তা অনতিক্রম্য এবং সেটা যে কী, তা আমি আপনাকে জানাতে পারব না।

—কেন পারবেন না? আমাকে কেন প্রত্যাখ্যান করছেন জানাবেন না?

অনেকক্ষণ নীরব রইলেন শঙ্করদেব। তারপর বললেন, আমি সজ্ঞানে অনৃতভাষণ করি না। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমি অব্যাহতি পেতে চাই না। কিন্তু সত্য কথাটাও আপনার কাছে স্বীকার করতে পারব না। বাধা আছে। সামাজিক এবং নৈতিক।

এবার জবাব দিতে শঙ্করীই দেরি করল। তারপর বলল, অন্তত একটা কথা বলে যান। সে বাধা কি আমার ভিতর? আমি কি কোন কৃচ্ছ্রসাধনায় নিজেকে

ক্লেদমুক্ত করে—

এবার রীতিমত আর্ত শোনাল কাব্যতীর্থের কণ্ঠস্বর : না। না। না! তাহলে আরও স্বীকার করি। আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, আমার স্নেহের পাত্রীই হওয়ার কথা। কিন্তু একদিক থেকে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। এমন মতিময়ী নারী আমি আমার জীবনে দেখিনি। এ বাধা আপনার কোন চরিত্রগত ত্রুটির জন্য নয়। আমিই হতভাগ্য—এ অসম্পূর্ণতা শুধু আমার, একান্তই আমার।

এর পর দুজনেই নীরব। কেউই ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। ওঁদের দুজনের কেউই জানেন না—রুদ্ধদ্বারের ওপারে ভূশয্যালীন অসুস্থা একটি প্রৌঢ়া নারী চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিলেন। শঙ্করী বুঝতে পারুক, না পারুক—সেই সংসারাভিজ্ঞা প্রায়-বৃদ্ধা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন—বাধা কোথায়। দুঃখে বেদনায় এবং হ্যাঁ, আত্মগ্লানিতে তিনি চোখের জলে অন্তরের সব ক্লেদ, সব মালিন্য ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। আবার শোনা গেল শঙ্করদেবের কণ্ঠস্বর, এত কথাই যখন বললাম, তখন আরও বলি—আপনার দুঃখের কথা আমি সবই জানি। আমি জানি, পিতৃকুলে আপনার কেউ নেই। শৈশবে জননীকে হারিয়েছেন, বাল্যে পিতাকে এবং হ্যাঁ, কৈশোরের প্রারম্ভেই স্বামীকে। আমার কাছে লজ্জা করবেন না রানীমা—আমি তো জানি কী অসময়ে আপনাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে এনেছি। সারা জীবনই আপনি দুঃখ পেয়েছেন—তবু ভেঙে পড়েননি। আপনার জ্ঞানস্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় এবং মুমুক্ষা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন রানীমা—সব আশা জলাঞ্জলি দেবার কোন কারণ ঘটেনি। সাধুদেবের আশীর্বাদে হয়তো অচিরেই আপনার স্বামী প্রত্যাগমন করবেন, হয়তো আপনি সন্তানবতী হবেন—

বাধা দিয়ে শঙ্করী শুধু বললে, ঠাকুর মশাই, আমার স্বামীর বয়স ষাট বৎসর।

—জানি, রানীমা, জানি। তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতামহ তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের কথা বলি। সারা ভারতবর্ষে অত বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত আছেন কি না সন্দেহ—

শঙ্করী বলে, শুনেছি তাঁর নাম—ত্রিবেণীর শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঠাকুর। সেই যিনি ইংরেজী না জেনেও শ্রুতিধরের মত আদালতে দুই গোরা সাহেবের কথোপকথন অনর্গল বলে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। তাঁর কথাই বলছি। তিনি আজও জীবিত। এখন তাঁর বয়স একশ সাত। তাঁর যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশের বয়ঃক্রম ছিল ছয়ষট্টি। কথিত আছে, একজন দিক্‌পাল জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রুদ্রদেবের একটি অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্রসন্তান হবে। সেই কথা শ্রবণ করে

বাসুদেব ব্রহ্মচারী নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ষাট বৎসর বয়সের জরাজীর্ণ অপুত্রক বৃদ্ধ রুদ্রদেবের সঙ্গে স্বীয় বালিকাকন্যার বিবাহ দেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় বাসুদেব জগন্নাথধামে গিয়ে কঠিন তপস্যা করেন। তখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়—"তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্যরত্ন পুত্রসন্তান আবির্ভূত হবে। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। জগন্নাথ ধামে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হল, তাই দৌহিত্রের নামকরণ কর—জগন্নাথ।"...রানীমা, ঈশ্বরের কী অপার লীলা দেখুন। সেই বৃদ্ধের ঔরসে কিশোরী কন্যার গর্ভে সত্যই আবির্ভূত হলেন ক্ষণজন্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। একশ সাত বছর বয়সে আজও তিনি ভারত-ভূখণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত। তাই বলছিলাম—আপনার হতাশ হবার তো কিছু নেই। যাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে তাঁরই আশীর্বাদে আপনার ক্রোড়েও আসতে পারে অমন ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষ।

মহামায়া স্পষ্ট শুনলেন—ছুটকি কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রত্যাশায়, আনন্দে, ব্রাহ্মণের শুভাশীর্বাদে।

কাব্যতীর্থ পুনরায় বলেন, আমি প্রণিধান করেছি, আমার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নেবার জন্য আপনি কী পরিমাণে ব্যাকুল। না হলে লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমাকে এভাবে গভীর রাত্রে ডেকে পাঠাতেন না। আপনার সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না বলে আমিও একই পরিমাণে মর্মাহত। রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা করব—তিনি আমাকে উপযুক্ত করে তুলুন। একদিন যেন এসে আপনার কানে বীজমন্ত্র দিয়ে যেতে পারি।

শঙ্করী কী বুঝল তা সে-ই জানে। বললে, আর একটি ভিক্ষা আছে। আমি কোনদিন আপনার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করিনি। আজ আমার একটি প্রণাম নেবেন?

একটু শব্দ হল। বোধহয় গাত্রোত্থান করলেন শঙ্করদেব। প্রস্থানের প্রস্তুতি। বললেন, নেব। অন্য সময় হলে আপত্তি করতাম। আজ করব না। কারণ, কে বলতে পারে এই হয়তো আপনার শেষ সুযোগ।

—শেষ সুযোগ। মানে?

একটু যেন ইতস্তত করলেন শঙ্করদেব। তারপর মনস্থির করে বললেন, না, সব কথা স্বীকার করে যাই। শুনুন—আপনার-আমার মধ্যে যে স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে এটা ইতরজনে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। আপনি তা জানেন না; কিন্তু কিছু অপ্রিয় কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তাই আমি স্থির করেছি দেশত্যাগ করব। দু-চারদিনের মধ্যেই।

—দেশত্যাগ। কোথায়? আপনার মন্দির? চতুষ্পাঠী?

—সব ব্যবস্থাই করে যাব। স্বর্গতঃ নসীরাম সাণ্ডেল মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান রামজীবন লাহিড়ী আমার মন্ত্রশিষ্য—তাকেই পূজারী নিযুক্ত করে যাব। চতুষ্পাঠীর দায়িত্বও সে নেবে।

শঙ্করী বললে, একটা কথা বলুন। দেওয়ানজীর সঙ্গে আপনার শেষ করে দেখা হয়েছে?

—দেওয়ানজী। কেন?

—কারণ যাই হোক, বলুন?

—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক পূর্বে তিনি মন্দিরে এসেছিলেন।

শঙ্করীর ম্লান হাসিটা দেখতে পেলেন না মহামায়া। শুধু শুনলেন, মিথ্যাকথা আমিও সজ্ঞানে বলি না ঠাকুর-মশাই, কিন্তু সত্যটাও স্বীকার করতে পারছি না। বাধা আছে। শুধু একটি অনুরোধ। কাল প্রাতে হয়তো তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। হয়তো তিনি উপযাচক হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তা যদি আসেন, তাহলে তিনি কোনও কথা বলার পূর্বেই আপনি তাঁকে আপনার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবেন।

—আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু হেতুটা তো ঠিক বুঝলাম না।

—আপনি কেন আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারলেন না' তার হেতুটাও তো আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেননি!

এরপর অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না মহামায়া। সন্তর্পণে খড়খড়ি তুলে ভিতরে দৃক্‌পাত করলেন। দেখলেন, সমভঙ্গ বিষ্ণুমূর্তির মত শঙ্করদেব দাঁড়িয়ে আছেন যুক্তকরে এবং তাঁর যুগ্মচরণের উপর এক হতভাগিনী নারী নামিয়ে রেখেছে তার নিরবগুণ্ঠন মস্তক।

শঙ্করদেব যুক্তকরে শুধু বললেন, ওঁ। নমঃ নারায়ণায়।

অর্থাৎ ঐ সীমন্তিনীর ঐকান্তিক প্রণামটি তিনি ৺নারায়ণকেই নিবেদন করলেন।

বারো

—ঠাকুরমশয়! ও ঠাকুরমশয়! মোকামকে আসেন না'কি?

—কে? রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে কাব্যতীর্থ সাড়া দেন।

—হামি দোবেজী আছি। আরামসে বাহিরে আসবেন?

দ্বার খুলে বাইরে আসেন পণ্ডিত। রামাওতার দোবে তাঁকে প্রণাম করে বললে, মহাবীরজীর কিরপা হোলে আজ আপনার হিচ্ছা পূরণ হইয়ে যাবে মনে লাগছে। হমার সাথে আসেন। ঘাটে এক নতুন নৌকা লেগেসে। বড়া ভারি জমিন্দার। কাশী যাইতেসেন। আসেন, বাৎচিৎ করেন—

কাব্যতীর্থ দোবেজীকে তাঁর মনোবাসনার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। দোবেজী রাজসরকার থেকে ঘাট জমা নিয়েছে। দ্বারভাঙা অঞ্চলের মানুষ। ওর বাপ এসেছিল বর্ধমান রাজসরকারে ফৌজের কাজ নিয়ে। দোবেজী যদিচ মহাবীরের ভক্ত, তবু লড়াই কাজিয়া তার পোষায়নি। সে এই গঙ্গার ঘাট জমা নিয়েছে। ওখানেই ছাপরা বেঁধে দিবারাত্র পড়ে থাকে। শঙ্করদেব তাকে জানিয়েছিলেন তিনি কাশীধামে যেতে ইচ্ছুক—কিন্তু পাথেয় নেই। কোন জমিদার রাজা-মহারাজা বা বণিক বজরা নিয়ে কাশী যাচ্ছেন এই খবর পেলে দোবেজী যেন তাঁকে সংবাদ দেয়। রামাওতার তাই সাতসকালে এসেছে সংবাদ দিতে। একজন বাঙালী জমিদার সস্ত্রীক কাশীধামে যাচ্ছেন—বড় বজরা—স্থানাভাব হবার কথা নয়। এখন শঙ্করদেবের ভাগ্য!

পণ্ডিত উড়ুনীটি গায়ে চড়িয়ে, খড়মজোড়া পায়ে গলিয়ে রামাওতারের পিছু-পিছু ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। সত্যিই বড় বজরা। খানদানি ব্যবস্থা। স্থানাভাব হওয়ার আশঙ্কা নেই। কাল রাত্রে তিনি এ ঘাটে বজরা ভিড়িয়েছেন। দোবেজী ভূম্যধিকারীর সঙ্গে আলাপ করে ঠাকুরমশায়ের কথা মোটামুটি বলে রেখেছে। কাব্যতীর্থকে ঘাটে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই ভিতরে গেল এত্তেলা দিতে। অল্প পরে এসে বললে, বাবুমশায় সেলাম দিয়েছেন। আসুন। মহাবীর-জীর কিরপায় বন্দোবস্ত্ হইয়ে যাবে মনে লাগে।

বজরার সামনের কামরাটি সুসজ্জিত। অহেতুক আড়ম্বর নেই—কিন্তু পার-পাটি। সবার প্রথমে কাব্যতীর্থের নজর পড়ল পিছনে একটি র‍্যাকের উপর। তাতে অনেক পুঁথি এবং যাবনিক গ্রন্থ থাক দেওয়া। নিঃসন্দেহে বাবুমহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তি। ভূস্বামীর বয়স বেশী নয়, শঙ্করদেবের সমবয়সীই—সাতাশ-আটাশ। অর্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলা সেবন করছিলেন। শঙ্করদেবকে দেখেই যুক্তকরে নমস্কার করলেন। বললেন, আসুন পণ্ডিতমশাই। উপবেশন করুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই।

শঙ্করদেব প্রতিনমস্কার করে বসলেন। দোবেজী বললে, আব্ আপ্ দোনো বাৎচিৎ করিয়ে। তারপর বাবুমশায়ের দিকে ফিরে বললে, বরাহ্মণ! বহুৎ ইমানদার আদমী!

বাবুমশাই বললেন, আপনার সুপারিশের প্রয়োজন নেই। উনি যে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব তার বিজ্ঞপ্তি ওঁর সর্বদেহে প্রকট। আচ্ছা আসুন আপনি।

দোবেজী প্রস্থান করলে কাব্যতীর্থ বলেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দোবেজী নিশ্চয় বলেছেন—

—হ্যাঁ। আপনি ৺কাশীধামে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু কেন তা বলেননি। তীর্থ করতে না অধ্যয়ন করতে?

—উভয়তই। আপনারা?

বাবুমশাই বললেন, ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী শ্রেণীর। উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে। ঠাকুরের নাম ৺রামকান্ত রায়।

কাব্যতীর্থ শুধু বললেন, রায়?

—হ্যাঁ। আমার প্রপিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেছিলেন। বাবা মহাশয় 'রায়' উপাধিই ব্যবহার করতেন। আপনারা?

—আমার নাম শ্রীশঙ্করদেব কাব্যতীর্থ। রাঢ়ী শ্রেণীর। উপাধি ভট্টাচার্য। পাঁচ পুরুষে বংশবাটিতেই বাস। ঠাকুরের নাম ৺ত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ। তিনি ছিলেন বংশবাটির ৺অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর স্বর্গারোহণে আমিই ঐ মন্দিরের পুরোহিত।

—অনন্ত বাসুদেব মন্দির! শুনেছি রামেশ্বর রায় প্রতিষ্ঠিত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি সে মন্দির দেখেছেন?

—না, দেখিনি। আজ যখন এসে পড়েছি, নিশ্চয় দেখব। শুনেছি অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য আছে।

—তা আছে। চলুন না এখনই দেখিয়ে আনি।

হাসলেন রায় মহাশয়। বললেন, আপনার ব্রাহ্মণী কজন?

এ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অর্থ গ্রহণ হল না কাব্যতীর্থের। বললেন, আমি দার-পরিগ্রহ করি নাই। কেন?

—আগেই তা আন্দাজ করেছি। আপনি কি কুলীন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

—প্রথমত জানাই—আমার দুজন সহধর্মিণী। জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী দেবী, কনিষ্ঠা উমা দেবী। উভয়েই এ বজরায় উপস্থিত। ফলে, একাকী এখনই দেবদর্শনে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। পালকির আয়োজন করতে হবে। দ্বিতীয়ত

জানাই—আপনি যখন কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে এই বয়সেও অনূঢ় তখন আপনি আমার সঙ্গে নিশ্চয় কাশীধামে যাচ্ছেন।

কাব্যতীর্থ বলেন, আপনার প্রথম বক্তব্যের অর্থ গ্রহণ হল, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের—

বাধা দিয়ে রায় মহাশয় বললেন, বুঝলেন না? আপনি একজন দুর্লভ ব্যতিক্রম। এমন কাব্যতীর্থকে বয়স্য করায় আমারও যথেষ্ট আগ্রহ।

কাব্যতীর্থর মনে হল—উনিও একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। সদ্যপরিচিত কোন যুবকের কাছে স্বীয় পত্নীর নাম এভাবে ব্যক্ত করতে তিনি কখনও শোনেননি। ওঁর স্বগ্রামবাসী এমন বহু ভদ্রলোককে উনি ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, যাঁরা সস্ত্রীক মন্দিরে পূজা দিয়ে যাচ্ছেন দশ-বিশ বছর ধরে,—তাঁদের ধর্মপত্নীদের প্রসারিত অঞ্জলিতে বছরের পর বছর চরণামৃত ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু তাদের কারও নাম জানেন না, মুখ দেখেননি।

অচিরেই দুজন দুজনের বয়স্য হয়ে উঠলেন। পালকির ব্যবস্থা হল। ওঁর দুই স্ত্রী এসে শঙ্করদেবকে প্রণাম করল। একজন—তিনি বড় না ছোট ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না শঙ্করদেব—প্রায় শঙ্করীরই বয়সী, মাথায় আধো-অবগুণ্ঠন টেনে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে কাশীধামে যাচ্ছেন শুনলাম। খুব আনন্দের কথা।

অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কোন পুরললনা এভাবে কথা বলতে পারে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি শঙ্করদেব। বললেন, হ্যাঁ মা। বাবুমশায়ের অশেষ করুণা।

বাবুমশাই ওপ্রান্ত থেকে প্রতিবাদ করেন, বাবুমশায় নয়, কাব্যতীর্থ। রায়মশায়। তোমাকে আমি যাবৎকাশী বয়স্য পদে বরণ করেছি।

শঙ্করদেব বললেন, যাবৎকাশী। তারপর কি বন্ধুত্বের ছেদ?

—সেটা নির্ভর করছে যদি তুমি…এরপর যাবনিক ভাষায় তিনি কি বললেন তা বোঝা গেল না। রায়মশাই নিজেই নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে বললেন, অর্থাৎ শৃগাল যদি লাঙ্গুলহীন হতে স্বীকৃত হয় তাহলেই বন্ধুত্ব বজায় থাকবে, যেহেতু আমি স্বয়ং নির্লাঙ্গুল।

অস্যার্থ?

—আমি তিনবার লাঙ্গুলহীন হয়েছি। একজন স্বর্গে গেছেন। দুজন এখানে সশরীরে বর্তমান। এখন 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান!'

ইংরাজী পড়া না থাকলেও রায়গুণাকরের কাব্য পড়া ছিল কাব্যতীর্থের। হেসে উঠলেন তিনি।

নৌকো ছাড়ল। অনতিবিলম্বেই কাব্যতীর্থ অনুভব করলেন রায়মহাশয় প্রগাঢ় পণ্ডিত। আরবী, ফারসী, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অদ্ভুত অধিকার। ঐ চারটি ভাষার ভিতর শুধু শেষোক্তটাই জানা ছিল কাব্যতীর্থের। সেটুকুই তির্যক পদ্ধতিতে পরিমাপ করতে চাইলেন—কিন্তু দেখা গেল সংস্কৃতেও রায়মশায়ের জ্ঞান অতলান্তিক। বোধ করি সমস্ত সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ, উপনিষদ আয়ত্ত করেছেন এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শুধু তাই নয়, আরবী ফারসী এবং ইংরাজী ভাষা জানা থাকায় তিনি ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় যেভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ এবং সুফীধর্মের বিশ্লেষণ করছিলেন তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, আপনি তো জ্ঞানের আকর।

সৌজন্য বলে—এ কথায় সবিনয়ে প্রতিবাদ করাই প্রথা। কিন্তু রায়মহাশয়ের সব কথাই রহস্যঘন। বললেন, একেবারে মূর্খ নই। একটি জ্ঞান আমার হয়েছে—'আমি জানি যে, আমি জানি না।' কথাটা কার জানেন? সক্রেটিস্-এর।

ঐ যাবনিক পণ্ডিতের নামও জানতেন না কাব্যতীর্থ।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর রায় মহাশয় একটি পাণ্ডুলিপি বার করে বললেন, আসুন আপনাকে পড়ে শোনাই। আমারই রচনা। ষোড়শবর্ষ বয়সে এটি আমার প্রথম রচনা। প্রকাশ করিনি যদিচ।

—কেন? আপনার তো অর্থাভাব নাই?

—গ্রন্থটির নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী'। বস্তুত এটি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ মন্তব্যে পূর্ণ। অমুদ্রিত অবস্থাতেই পাণ্ডুলিপিটি যে পরিমাণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তাতে ওটি আর প্রকাশ করতে সাহসী হইনি। আপনাকে পড়ে শোনাই। যুক্তি দিয়ে আমার যুক্তিকে খণ্ডন করুন।

নৌকো চলেছে উজানে। কর্মহীন অবসর। রায়মহাশয় তাই এই অবকাশে তাঁর অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিটি একজন উপযুক্ত শ্রোতাকে শোনাতে চাইলেন। কাব্যতীর্থ বললেন, পাণ্ডুলিপিতে কী জাতীয় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

—আমার একান্ত আত্মীয়গণের সঙ্গে মনান্তর। আমার স্বর্গতঃ পিতৃদেব সে সময়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন কিনা চিন্তা করতে বসলেন। বেগতিক বুঝে আমি দেশত্যাগ করি এবং সমস্ত উত্তরখণ্ড পর্যটন করি। আমি তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছিলাম—মহাযান ও বজ্রযান-তন্ত্রের মূলকথা জানতে।

কাব্যতীর্থ বুঝতে পারেন দৈবকৃপায় তিনি এক দুর্লভ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বললেন, বেশ আসুন, আলোচনা করা যাক।

বজরার ভিতর দুজন তন্ময় হয়ে রইলেন শাস্ত্রালোচনায়। কাব্যতীর্থ লক্ষ্য

করলেন, রায় মহাশয়ের দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ—অদ্ভুত তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা। নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে তিনি প্রচলিত সংস্কারের মূলে পরুষহস্তে কুঠারাঘাত করেছেন। কোথাও কোনও শাস্ত্রোক্ত আপ্তবাক্যের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য নেই—প্রতিটি তথ্য যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার চেষ্টা। যেখানে ভ্রান্তি সেখানেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কাব্যতীর্থের বুকে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। বংশানুক্রমে তিনি মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত। আজন্ম সংস্কারের মূলে আঘাত লাগছে—যা বিশ্বাস করতে মন চায় না, ক্ষুরধার যুক্তির বেড়াজালে তা যেন বারে বারে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, রায় মশায়, স্বীকার করছি আপনার গ্রন্থটি অপূর্ব। অদ্ভুত। কিন্তু আপনার মত আমি মানি না।

—কেন মানেন না? বুঝিয়ে বলুন? কোথায় আমার ভ্রান্তি?

—স্বীকার করছি—তাও আমি প্রদর্শন করতে পারছি না। আমি কাব্যতীর্থ মাত্র—ন্যায় ও দর্শনে আমার চর্চা সামান্যই। কিন্তু এর বিরুদ্ধ যুক্তি নিশ্চয় আছে। এখনও ভারতবর্ষে এমন পণ্ডিত আছেন যিনি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করতে পারেন। এ কি হয়? হাজার হাজার বছর ধরে পূর্বাচার্যরা যা বলে গেছেন—

—ঐখানেই ভ্রান্তি হচ্ছে আপনার! আর্য ঋষিরা ও-কথা বলেননি—বলেছেন কিন্তু স্বার্থসন্ধানী টুলো পণ্ডিত। যাঁরা ধর্মের নামে ব্যবসা করেন। কিন্তু থাক। আপনি নৈয়ায়িক নন, কাব্যতীর্থ। কাব্যালোচনাই করা যাক। বলুন কোন্ কাব্য বার করব?

কাব্যতীর্থ বলেন, আসছি সে প্রসঙ্গে। তার পূর্বে আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দিন। আমার এক সতীর্থ প্রশ্নটি আমাকে করেছিল। সদুত্তর জানা না থাকায় আমি তার প্রতর্কের মীমাংসা করতে সক্ষম হইনি। আপনি প্রগাঢ় পণ্ডিত, বেদজ্ঞ—পরন্তু যাবনিক দর্শনেও আপনার অধিকার আছে। আপনি এ সমস্যার সমাধান কী ভাবে করবেন?

—বলুন? সমস্যাটি কী?

—আমার সেই সতীর্থ আমারই বয়সী এ কথা বলাই বাহুল্য। সে আমার মত পৌরোহিত্য করে না—গুরুগিরি তার ব্যবসা। যজমানদের সে মন্ত্রদীক্ষা দেয়। তার একজন বান্ধবী আছে—না, বান্ধবী নয়, শিষ্যাস্থানীয়া। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং অপূর্ব সুন্দরী। মেয়েটি জানে না কিন্তু আমার বয়স্যের মনে ইতোমধ্যে তার প্রতি কিছু গোপন অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে।

রায়মহাশয় বাধা দিয়ে বলেন, বিবাহে কি বাধা আছে? জাতিগত, বর্ণগত

অথবা—

—আছে। বাধা অনতিক্রম্য! কারণ স্ত্রীলোকটি বিবাহিতা।

—তারপর?

—মহিলাটি আমার সতীর্থের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আবেদন জানায়। আমার বন্ধুর মতে সে সত্যই মুমুক্ষু, তার মন নিষ্পাপ এবং আমার বন্ধুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের সংবাদ মেয়েটি বিন্দুমাত্র জানে না, কখনও সন্দেহ করেনি। এক্ষেত্রে আমার বয়স্যের কী করণীয়? মেয়েটিকে দীক্ষাদান কি শাস্ত্রসম্মত কাজ হবে?

রায়মহাশয় বলেন, আপনার হাইপথেসিস্ পরস্পর-বিরোধী।

—হাইপথেসিস্। অস্যার্থ?

—পূর্বস্বীকৃত অভ্যুপগম। আপনি বলেছেন, স্ত্রীলোকটি বিবাহিতা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পুনরায় বলেছেন সে জানে না—আপনার বয়স্যের মনে তার প্রতি গোপন অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। এই দুটি পূর্বসিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী। হয় স্বীকার করুন স্ত্রীলোকটি নিতান্ত মূঢ়মতী, নচেৎ স্বীকার করুন সে আপনার বন্ধুর গোপন অনুরাগ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, যদিচ লোকলজ্জায় সে কথা কখনও আপনার বন্ধুর কাছে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ মূর্খ আপনার বন্ধুই। কোন্‌টা স্বীকার করবেন?

কাব্যতীর্থ কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েন। কোনটাই স্বীকার করতে পারেন না।

রায়মশাই বলেন, আচ্ছা প্রথমে আমার দু-একটি প্রশ্নের জবাব দিন। মহিলাটির বয়ঃক্রম বিশ থেকে পঁচিশ! কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এবং তাঁর স্বামীর বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন?

—না। ষাট।

—এবং আপনার বন্ধু অতি সুদর্শন?

—আজ্ঞে না। এই আমারই মত দেখতে।

রায়মশাই হেসে বলেন, তাহলে সমাধান হয়ে গেছে। সেই মহিলাটিও মূঢ়মতী নন, আপনার বন্ধুও মূর্খ নন। তবু এ সমস্যার সমাধানে মূর্খ তো একজনকে হতেই হবে—কী বলেন? অবৈধ প্রণয় মানেই মূর্খামি!

আরও বিহ্বল হয়ে কাব্যতীর্থ বলেন, মার্জনা করবেন, আমি আপনার বক্তব্যটা ঠিকমত প্রণিধান করতে পারছি না।

—এখনও পারছ না বন্ধু? তাহলে আমাকেই মার্জনা করতে হবে। আমাকে

স্পষ্টভাষণে বলতে হচ্ছে—তুমিই সেই হস্তিমূর্খ—যেহেতু গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ করে নিজের জীবনের বাস্তব সমস্যা কল্পিত বন্ধুর স্কন্ধে অর্পণ করতে চাইছ! কুলীন ব্রাহ্মণ তুমি—এতটা বয়সে দার-পরিগ্রহ করনি—কোথায় একাধিক ব্রাহ্মণীর সেবায় তোফা মৌজ করবে—তা নয়, দেশান্তরী হয়ে কাশী চলেছ!

কাব্যতীর্থ বজ্রাহত। অট্টহাস্য করে ওঠেন রহস্যপ্রিয় রায়মহাশয়।

আলোচনায় বাধা পড়ল। বড় মাঝি এসে মস্ত সেলাম করে বললে, হুজুর, একবার বাইরে আসুন। ঘাটে সতীদাহ হচ্ছে।

—সতীদাহ! কই, কোথায়? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে ওঠেন রায়মশাই। ছুটে বেরিয়ে আসেন বাইরে। চোখে দুরবীন লাগিয়ে দেখলেন, পার্শ্ববর্তী ঘাট লোকে লোকারণ্য। একটি প্রকাণ্ড চিতা সাজানো রয়েছে। সতীকে দেখা যাচ্ছে না। রায়মশাই বললেন, বজরা ঘাটে ভেড়াও বড় মাঝি।

কাব্যতীর্থও বের হয়ে এসেছিলেন। বললেন, কী প্রয়োজন? ক্রিয়াকলাপটা শাস্ত্রসম্মত বটে, কিন্তু বড় নৃশংস! ও না দেখাই ভাল। বিশেষ মায়েরা আছেন বজরায়।

বড় মাঝি ইতস্তত করে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? বজরা ঘাটে ভিড়বে, না সোজা যাবে? বজ্রগম্ভীর স্বরে রায়মশাই হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: এই বেওকুফ্! শুনতে পাচ্ছ না! বজরা ঘাটে ভেড়াও!

বজরা দিক পরিবর্তন করল। ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কাব্যতীর্থ বলেন, এটি একটি বিখ্যাত ঘাট—ত্রিবেণীর জগন্নাথ ঘাট।

রায়মশাই দুরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, জানি, সময় থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম।

—কার সঙ্গে? কার কথা বলছেন?

—যাঁর নামে এই ঘাট—শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। আপনি এখনই বলছিলেন না, 'ভারতভূখণ্ডে আজও এমন পণ্ডিত আছেন যিনি আমার ঐ গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারেন।' আমি তো মনে করি—তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন ঐ উনি। শুনেছি এখনও তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং মেধা অক্ষুণ্ণ; যদিও শতাধিকবর্ষ বয়স হয়েছে তাঁর!

—একশো সাত। তিনি সম্পর্কে আমার প্রপিতামহ। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার। বংশবাটিতেই তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। তর্কপঞ্চাননের জ্যেষ্ঠতাত তিনি। তাঁর চতুষ্পাঠীতেই তর্কপঞ্চানন ঠাকুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বজরা ঘাটে এসে ভিড়ল। গঙ্গার ঘাট জনারণ্যে পরিণত। গাছের উপর পর্যন্ত উঠেছে মানুষ। মাঝখানে একটি চিতা সাজানো। তার উপর এক বৃদ্ধের শব শায়িত। সতী অনুপস্থিত। শোনা গেল—তাঁকে স্ত্রীলোকদের ঘাটে স্নান করানো হচ্ছে। শবদাহ হতে বিলম্ব আছে। কাব্যতীর্থ বললেন, এ নৃশংস দৃশ্য দেখা কি নিতান্তই প্রয়োজন?

বজরার ছাদে দুটি কেদারা নিয়ে দুজনে অপেক্ষা করছিলেন। রায়মশাই উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, দরকার। আমি জেনে যেতে চাই সতীর প্রকৃত মনোভাব। কেন সে স্বীকৃতি দিল এ আচারে? এ কি শুধুই লোকাচার? ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অথবা—

কাব্যতীর্থ বলেন, লোকাচার কেন বলছেন? এই তো শাস্ত্রীয় বিধান।

সোজা হয়ে বসলেন তরুণ জমিদার: বটে। শাস্ত্রীয় বিধান? কোন্ শাস্ত্রের?

—ধরুন, ঋষি অঙ্গিরা বলেছেন, "মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতী-সমাচারা স্বর্গলোক মহীয়তে।" [স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী ঐ জলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে বশিষ্ঠজায়া অরুন্ধতীর মত অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারিণী হয়।] আরও বলছেন, "নান্যোহি ধর্ম বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ততি কর্হিচিৎ।" [স্বামীর মৃত্যুতে সাধ্বী স্ত্রীগণের পক্ষে অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই।]

রায়মশাই বলেন, মনু কিন্তু অন্য সুরে গাইছেন। ঐ যদি একমাত্র নির্দেশ হয় তাহলে মনু-সংহিতায় কেন বলা হল, "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্ণীযাৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্তু।" [পতির মৃত্যুর পর পবিত্র ফলমূল ভক্ষণে বিধবা শরীরকে কৃশ করবে এবং অন্য পুরুষের নামোচ্চারণও করবে না।]

কাব্যতীর্থ বলেন, এ নির্দেশ সে যাবৎকাল চিতারোহণ না করছে ততক্ষণের জন্য।

রায়মশাই প্রচণ্ড ধমকে ওঠেন, বি সেন্‌সিব্‌ল কাব্যতীর্থ। স্বামীর মৃত্যু এবং তার দাহকার্যের মধ্যে সময়ের কতটা ব্যবধান? তিন চার ঘণ্টা? বড জোর চব্বিশ ঘণ্টা? তার জন্য ঐ নির্দেশ? ফলমূল খেয়ে 'শরীরকে কৃশ করা'? তোমাদের মনুর কি ধারণা? ঐটুকু সময়ের মধ্যে সদ্যোবিধবা দধি-দুগ্ধ-মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করে স্থূলাঙ্গী হয়ে যাবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পরপুরুষের ভজনায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে?

—তা নয়! মানে—

—মানে ঐ একটাই! আর্য ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না! সতীদাহ প্রথার শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত! এ কখনই সনাতন হিন্দুধর্মের নির্দেশ নয়!

কাব্যতীর্থ দেখেন রায়মশাই রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বলেন, থাক এ আলোচনা।

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেন তরুণ জমিদার। বলেন, তুমি যাই বল কাব্যতীর্থ, এ ব্যবস্থায় আমার সায় নেই। তাই আমার উইলে এই শর্ত করেছি—যদি আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ধর্মপত্নীর মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে সহমরণে যায় তবে সে আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা হবে!

কাব্যতীর্থ অর্কফলাসমেত শিরশ্চালন করেন। পরমুহূর্তেই চমকে ওঠেন তিনি। রসিকতাটার মর্মোদ্ধার করেন। রহস্যপ্রিয় রায়মহাশয় এমন গুরুতর বিষয়েও কৌতুক করছেন! তিনি হেসে ওঠার পূর্বেই ঘাটে একটি সোরগোল উঠল। দেখা গেল, স্নানান্তে সতী এসেছেন চিতার কাছে। রায়মশায় বললেন, চলুন, এবার ওখানে যাই।

—মায়েরা?

—ওরা বজরাতেই থাকবে। দুরবীন দিয়ে দেখবে, যদি দেখবার অভিরুচি হয়।

ভীড় ঠেলে ওঁরা অগ্রসর হয়ে আসেন। সদ্যোবিধবার বয়ঃক্রম ত্রিংশতি বর্ষ হবে। তাঁর পরিধানে একটি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র। শুধু সীমন্তে নয়, সমস্ত মূর্ধায় সিন্দুর-চর্চিত। ললাটে রক্তচন্দনের আলিম্পন। সর্বাঙ্গে কোন আভরণ নাই, শুধু কণ্ঠে সারি সারি পুষ্পমাল্য। ওঁর চরণদ্বয় অলক্তকরাগরক্তিম—দুই করতলেও অলক্তক লেপন করা হয়েছে। সতীর উর্ধ্বাঙ্গে কোনও কঞ্চুলিকা নেই—একবস্ত্রা তিনি। স্থির অচঞ্চল পদক্ষেপে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন চিতাকে। তাঁর পুত্র ও কন্যা এসে তাঁর চরণধূলি নিল। একটি শিশু সবলে আলিঙ্গন করে রইল তাঁর বাম জানু। সম্ভবত সে সর্বকনিষ্ঠ। একজন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে। সতী দু হাতে কর্ণমূল রুদ্ধ করে রইলেন—যতক্ষণ সেই শিশুর 'মা-মাগো' শব্দ ভেসে এল। তারপর দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল সেই সন্তানের আর্তকণ্ঠ। সতী স্বাভাবিক হলেন। অচঞ্চল পদক্ষেপে উঠে বসলেন চিতায়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কী যেন সব মন্ত্রোচ্চারণ করল, পুনরুক্তি করলেন সদ্যোবিধবা। সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠল—'সতী মাঈকী জয়!' শঙ্খ-ঘণ্টা ও তূর্যধ্বনি মিলিত হল সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে।

কাব্যতীর্থের লক্ষ্য হল জনতার ভিতর একজন গোরা-সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। বছর চল্লিশ বয়স। তাঁর পরিধানে একটি আলখাল্লা, মাজার কাছে ফাঁস দিয়ে আটকানো। হাতে একটি বাঁধানো বই। গলায় একটি চেন—তা থেকে একটি লকেট ঝুলছে। সংখ্যাতত্ত্বের যোগচিহ্নের মত। হঠাৎ তিনি এগিয়ে এসে যাবনিক

ভাষায় কী যেন বললেন। জনমণ্ডলীর কেউই জবাব দিতে পারল না। একপদ অগ্রসর হয়ে এলেন রায়মশাই। সাহেবের সঙ্গে তাঁর কিছু কথোপকথন হল।

রায়মশাই ফিরে এলে কাব্যতীর্থ বলেন, উনি কে? কি জানতে চাইছিলেন?

—উনি একজন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। ত্রিবেণীর ঘাটে সতীদাহ হচ্ছে সংবাদ পেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে এসেছেন সতীদাহ দেখতে। উনি জানতে চাইলেন—স্ত্রীলোকটি কি স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছে? আমি বল[illegible]ম—আপনার কি মনে হচ্ছে? ওঁর প্রতি কোন জোর জবরদস্তি হতে দেখছেন?

এই সময় সতী পুরোহিতকে কি যেন বললেন। বোঝা গেল, তিনি স্বামীর মস্তকটি স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নেবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। কয়েকজন শববাহী আত্মীয় মৃতের মস্তকটি ওঁর কোলে উঠিয়ে দিল। সতী বললেন, তোমরা আমাকে ওঁর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করে দাও।

ওঁর অনুরোধটুকুর অর্থগ্রহণ হয়নি পাদরী সাহেবের, কিন্তু দড়ি-দড়া এনে যখন সতীকে বাঁধবার আয়োজন হল তখন তিনি প্রতিবাদ করলেন। রায়মশাইকে ইংরাজীতে বললেন, এ কী। ওঁকে বাঁধা হচ্ছে কেন?

—কারণ, উনি নিজেই সেই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন।

—আহ্। তার মানে উনি ভয় পাচ্ছেন। আগুনের উত্তাপে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত হতে পারে।

তরুণ জমিদার বলেন, ঠিক তাই। সেটাই স্বাভাবিক। নয় কি? উনি হয়তো 'জোয়ানের' কথা জানেন।

– 'জোয়ান'। জোয়ান মানে?

—আমি জোয়ান অব আর্কের কথা বলছি, যাঁকে আপনারা এই কিছুদিন আগে পুড়িয়ে মেরেছেন। ডাইনি বলে।

সাহেবের মুখ কালো হয়ে ওঠে। বলেন, 'জোয়ান অব আর্ক' ডাইনি ছিলেন না, তিনি প্রায় সেইণ্ট।

—সেদিন তা আপনারা বোঝেননি। তা সেই প্রায় সেইণ্টও কিন্তু প্রথমবার আগুনের উত্তাপে চিতা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলেন। তাই নয়?

পাদরী আপাদমস্তক দেখে নিলেন ভারতীয় জমিদারটিকে। বললেন, ঐটুকুই তাঁর কলঙ্ক। তিনি অন্যথায় দেবী। ঐটুকুতেই প্রমাণ হয় তিনি সেইণ্ট নন, মানুষ। আপনাদের যুধিষ্ঠির যেমন! 'ইতিগজ'টুকুতেই তিনি মানুষ।

রায়মশাই বলেন, দেহধারীকে দৈহিক কার্যকারণ সম্পর্কের অনুবর্তী হতেই হবে। শুধু জোয়ান এবং যুধিষ্ঠির কেন, স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র যীশুও তো—

সাহেব রুখে ওঠেন—কী বলতে চাইছেন আপনি? ঈশ্বরপুত্র যীশু কোনদিন দেহের দাসত্ব স্বীকার করেননি।

রায়মশাই বলেন, আমি দুঃখিত সাহেব। বাইবেলটা তাহলে আপনাকে আবার ভাল করে পড়তে হবে। ঐ তো আপনার হাতেই আছে—দিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায়। ক্রুশবিদ্ধ যীশু আর্তনাদ করে উঠেছিলেন—"Eli, Eli, lama Sabactani?" ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমাকে কেন তুমি ত্যাগ করলে? চিরদিন যাঁকে 'ফাদার' বলেছেন, মৃত্যুযন্ত্রণার অভিমানে তাঁকে বললেন 'গড'। দৈহিক যন্ত্রণায় তাঁরও ক্ষণিক ভ্রম হয়েছিল—করুণাময় ঈশ্বর বুঝি তাঁকে ত্যাগ করেছেন।

পাদরী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন ঐ অপরিচিত হিন্দু যুবকটিকে। রায়মশাই পুনরায় বলেন, তাই বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন। আমি যীশাস্‌কে ছোট করছি না। তিনি মহামানব। আমি শুধু বলতে চাই, দেহধারীকে দেহের ধর্ম মানতেই হবে। আপনিও যেন ছোট করবেন না ঐ মহিলাকে—উনি তাঁর দেহ রজ্জুবদ্ধ করতে চাইছেন বলে।

সাহেব প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই মত্ত কোলাহলে সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সতী স্থির হয়ে বসে আছেন পদ্মাসনে। তাঁর দুই চক্ষু মুদ্রিত। যুক্তকরে তিনি ধ্যানস্থ—বাহ্যজ্ঞান নেই তাঁর। বোধ করি এই তুমুল কোলাহল, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি তাঁর শ্রবণে প্রবেশই করছে না। দুই-তিন-চার সেকেণ্ড। চিতার তলদেশ থেকে অগ্নি তার লেলিহান শিখায় অগ্রসর হয়ে এল ঐ ধ্যানমগ্না নারীর দিকে। কাব্যতীর্থ আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন খণ্ড মুহূর্তের জন্য—পদ্মাসনার ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। দুরন্ত আতঙ্কে তাঁর দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। সর্বভুক অগ্নি সর্বপ্রথমেই দগ্ধ করল ওঁর পট্টবস্ত্র। বীভৎস দৃশ্য। উনি উঠে দাঁড়াতে চাইলেন—ছুটে পালাতে চাইলেন—মুহূর্তে মহিমময়ী সতী প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর পূর্ণজ্ঞান আছে। উলঙ্গ রমণী গগনবিদারী আর্তনাদ করে উঠলেন—বাঁচাও! বাঁচাও!!

পাদরী ছুটে এসে চেপে ধরল রায়মশায়ের দুটি হাত: ফর গডস্ সেক্! সেভ্ হার্!

রায়মহাশয় যেন প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে—দেখছেন! না, সতীকে নয়, বিবস্ত্রা রমণীকে নয়, মানুষকে। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। যদিও সেই চোখে তাঁর অজ্ঞাতে নেমেছে দুটি জলের ধারা। কাব্যতীর্থ দু হাতে কান বন্ধ করে মুদ্রিত নেত্রে বসে পড়েছেন ভূতলে।

—বাঁচাও! বাঁচাও! হায় ভগবান!

ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠেন রায়মশাই: ভগবান। ভগবান নেই।

কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত। তারপরে মূলোৎপাটিত কদলীবৃক্ষের মত লুটিয়ে পড়ল একটা নিরাবরণ নারীদেহ তার স্বামীর দেহের উপর। পরম করুণাময় অগ্নিদেব গ্রহণ করলেন হতভাগ্য বিধবার প্রাণাঞ্জলি। বিবস্ত্রা নারীর লজ্জা আবৃত করলেন ঘন ধূম্রজালে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে। ধীরপদে শ্রান্ত খিন্ন রায়মশায় ফিরে আসছিলেন বজরায়। পিছন পিছন কাব্যতীর্থ। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তাঁদের ডাকল। রায়-মশাই ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন সেই ধর্মযাজক এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি বললেন, বাবু, আমি দুঃখিত। হয়তো উত্তেজনার মুহূর্তে তোমাকে আঘাত দিয়েছি। তোমার ধর্মে।

রায় বলেন, সেটা উভয়তই। আমিও দুঃখিত। আমিও তোমাকে ফিরে আঘাত করেছি।

দুজনে করমর্দন করলেন। সাহেব বলেন, কিন্তু এখন তো আমরা কেউই উত্তেজিত নই। এবার বল—তুমি কি মনে কর—এই ব্যবস্থা ভাল? তুমি জোয়ান অব আর্কের কথা তুলেছিলে। হ্যাঁ, আমরা আজ স্বীকার করি—আমরা ভুল করেছিলাম, অন্যায় করেছিলাম, পাপ করেছিলাম। এখন বল, এই সতীদাহ প্রথাটা কি তুমি অন্তর থেকে ভাল বলে মান?

হাতটা ধরাই ছিল। রায়মশাই বলেন, না। এবং সেইজন্যেই এসেছিলাম এই সহমরণ দেখতে। আমি তথ্য সংগ্রহ করছি। যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করছি। সংগ্রাম অনিবার্য। আশা করি, লড়াই যখন বাধবে তোমাকে আমার দলে পাব।

—লড়াই? কিসের লড়াই?

—সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের লড়াই। টুলো পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে।

সাহেব ওঁর হাতটা ঝাঁকি দিতে দিতে বললে, নিশ্চয় পাবে বন্ধু! তুমি বিদ্বান, পণ্ডিত এবং বয়সে তরুণ। আন্দোলন শুরু কর। আমি আছি। আমাকে সংবাদ দিও। আমি নিশ্চয় এসে দাঁড়াব তোমার পাশে। আমাকে পাবে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চে। এই বৎসরই ঐ চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমিই তার প্রথম ধর্মযাজক। আমার নাম উইলিয়াম কেরী।

রায়মশাই বললেন, ডিলাইটেড টু মিট য়ু ফাদার কেরী। আমার নাম রামমোহন রায়!

তেরো

প্রায় চার মাস পরের কথা।

বংশবাটির রাজবংশের ইতিহাসে একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল। ত্রিবেণী থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী এসে সংবাদ পৌছে দিয়েছে আজ সন্ধ্যাকালের মধ্যেই রাজা-মহাশয়ের নৌকো বংশবাটির ঘাটে ভিড়বে। ত্রিবেণীর ঘাটে ওঁরা নৌকো ভেড়াননি; কিন্তু ঘাট থেকেই রাজা-মহাশয়ের ধ্বজা-সমন্বিত বজরাটি নজর হয়েছে। সংবাদবহ জানিয়েছে রাজা-মহাশয়ের বজরার পিছু পিছু আসছে পণ্যসম্ভারপূর্ণ সপ্তডিঙা! কী আছে ওতে?

এই চার মাসে বংশবাটির জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরে বহাল হয়েছেন নূতন পুরোহিত—রামজীবন লাহিড়ী। কাব্য-তীর্থের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নামে কানাঘুষাটা বন্ধ হয়েছে। রাজবাটির ভিতরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ কানাইয়ের মায়ের চাকরি গেছে।

এই চার মাস সবচেয়ে কষ্ট গেছে শঙ্করীর। মন খারাপ হলেই সে পুঁথি নিয়ে বসত: অথচ এখন তাও বসতে পারে না। ভাল লাগে না। নিয়মমাফিক কাজ করে যায়। মহামায়ার ঘরে আসে। তাঁর খোঁজখবর নেয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ আলাপ কোনদিন হয়নি। মহামায়াই শেষে একদিন অভিমানিনী ছুটকির হাতখানা চেপে ধরলেন: শোন্! বস্ এখানে।

—কী, বল না?

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

শঙ্করী ফস করে বলে, কেন? আজ আবার গয়না মেলাবে নাকি?

—ঠিক তাই। এই নে চাবি। দোরটা বন্ধ করে বার কর্।

শঙ্করী রুখে ওঠে, আবার আমাকে কেন? চাবি তোমার কাছে আছে, তাই থাক। আমি মোতির মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই-ই গহনার পুঁটলি বার করে দেবে এখন।

মহামায়ার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। বললেন, অভিমান তুই করতে পারিস। সে হক তোর আছে। কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ্ দেখি ছুটকি! আর বেশিদিন তোকে জ্বালাব না, কি বলিস?

শঙ্করী চোখ তুলে দেখল। সত্যিই রোগপাণ্ডুর মহামায়া একেবারে শয্যালীন হয়ে গেছেন। যে-কোনদিন মৃত্যু হতে পারে তাঁর। শঙ্করী আর রাগ করে

থাকতে পারল না। দ্বার রুদ্ধ করে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। কিন্তু এ কী? বড়দির গয়নার বাক্স কোথায়? চাপা আর্তনাদ করে ওঠে শঙ্করী: বড়দি! তোমার গয়না।

—আছে রে বাপু, আছে। হারায়নি। তোর পুঁটলিটা শুধু নিয়ে আয়।

—হারায়নি তো কোথায় গেল? চাবি বরাবর তোমার কাছেই ছিল তো।

—ছিল। বলছি। অনেক কথা বলার আছে। তুই ঐ পুঁটলিটা নিযে এসে বস্ দিকিনি। সব অপরাধ আজ কবুল করব তোর কাছে। তারপর তুই রাখিস আর মারিস।

চিরদিন যেমন হয়েছে, আজও তাই হল। বড়দির ইচ্ছার স্রোতে শঙ্করী গা ভাসালো। কাছে এসে বসল। মহামায়া তাকে একটি একটি করে অলঙ্কার পরাতে পরাতে বললেন, সবার আগে কবুল করি—হ্যাঁ, ঠাকুর মশাইকে তাডাবার পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। কানাইয়ের মা তোকে মিথ্যা বলেনি।

শঙ্করী জবাব দিল না।

—কই তুই তো কোন তিরস্কার করলি না? জানতে চাইলি না—কেন?

—সেটা আমি অনুমান করেছি।

—তাই তো করবি। তুই বুদ্ধিমতী। দোষ আমি তোকেও দিই না, তাঁকেও দিই না।

অপ্রিয় আলোচনাটার মোড ফেরাতে শঙ্করী বলল, আসল কথাটা বল। তোমার গয়না কোথায়?

—আমি বেচে দিয়েছি।

—বেচে দিয়েছ। তোমার অত-অত গয়না। বিয়ের সব যৌতুক। কেন? কি জন্যে?

—আমারও যে একজনের সঙ্গে পীরিত হয়েছে!

—বাজে কথা বললে উঠে যাব কিন্তু—

মহামায়া ওর হাতটা চেপে ধরেন—তুই তো জানিস, রাজা-মশাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত না হলে তিনি ফিরে আসবেন না। তাই—

—তাই তুমি তোমার সব গয়না বেচে দিলে?

—দেব না। বিনিময়ে কি পেলাম দ্যাখ্। তিনি আসছেন! খবর পেয়েছি। দিন সাতেকের মধ্যেই।

মহামায়ার লক্ষ্য হল—এ কথায় এই বয়সেও শঙ্করীর মুখে একটা লজ্জারুণ আভা ফুটে উঠল। অত্যন্ত তৃপ্তিভরে তিনি সেই সাতাশ বছরের প্রোষিতভর্তৃকার

ভাবান্তরটুকু উপভোগ করলেন। বললেন, গত মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় রওনা হয়েছেন। দিলীপ বলেছে, জোর হাওয়া থাকলে আজকালের মধ্যেও এসে পড়তে পারেন। তাইতো আজ তোকে সাজাতে বসেছি। কখন ছুট করে এসে পড়েন, কে বলতে পারে!

ঠোঁট ফুলিয়ে শঙ্করী বলল, ন্-না!

মহামায়াও অভিমান করেন, বারে! সেই জন্যেই গহনাগুলো বিসর্জন দিলাম। তোর না থাক, আমার একটা সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? আমি কলকাতা থেকে আতসবাজির বায়না দিয়েছি। রাজবাড়ি প্রদীপ দিয়ে সাজানো হবে। রসুনচৌকি বসবে। তোরণ তৈরী হবে—

—সে সব হোক। সে তো রাজা-মশায়ের প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষ্যে। আমি বলছি—ঐ খাট-পালঙ্ক সাজাতে পারবে না কিন্তু!

মহামায়া প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, একটা খট্‌কা লেগে আছে। উনি এক লাখ টাকা পাঠাতে বললেন কেন?

—তার মানে?

মহামায়া বুঝিয়ে বলেন, দেওয়ান দিলীপ দত্ত যেই কাশীতে সংবাদ পাঠাসেন এতদিনে রাজকোষে সাত-লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত হয়েছে অমনি রাজা-মহাশয় আদেশ করলেন—তা থেকে এক লক্ষ তঙ্কা কাশীতে পাঠাতে। কেন, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানাননি। সম্ভবত তিনি কিছু সওদা করেছেন সস্তা দরে, যা কলকাতায় বেশী দরে বিক্রয় করবেন। অর্থাৎ বাণিজ্য। সে যাই হোক, আদেশ পালিত হয়েছে এবং রাজা-মহাশয়ও জানিয়েছেন তিনি অবিলম্বে রওনা হচ্ছেন। বস্তুতঃ তিনি এতক্ষণে রাজমহল অতিক্রম করেছেন।

হঠাৎ ওকে কাছে টেনে মহামায়া বলেন, হ্যাঁরে ছুটকি, ষোল বছর বয়সে তুই বলেছিলি ভয় করছে। এখনও কি তাই বলবি নাকি?

শঙ্করী উত্তেজনায় আবেগে জড়িয়ে ধরল তার বড়দিকে। এমন মাতৃসমা বড়দিকে সে কেন এতদিন ভুল বুঝে দূরে সরে ছিল? অথচ বড়দি তলে-তলে ওকে স্বামীর হাতে তুলে দেবেন বলে তাঁর সব যৌতুক, সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করে দিয়েছেন। মহামায়া ওকে তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকে চেপে ধরে বললেন, আমি বিশ্বাস করি, তোর কোলেও আসবে ঐ রকম ক্ষণজন্মা পুরুষ—পঞ্চানন-ঠাকুরের মত!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত সোজা হয়ে বসে শঙ্করী। তৎক্ষণাৎ ভুলটা বুঝতে পারে। বড়দি নিশ্চয় সে রাত্রের কথোপকথনের কথা জানে না। কেমন করে জানবে?

হয়তো অন্য কারও মুখে শুনেছে—মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জননী ছিলেন কিশোরী, জনক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। তবু বাজিয়ে নিতে বললে, পঞ্চানন ঠাকুর মানে ?

আবার ওকে বুকে টেনে নিয়ে মহামায়া বলেন, রাগ করিস না ছুট্‌কি। আমি তোদের মত বলতে পারব না—'সজ্ঞানে কখনও মিছে কথা বলি না,' কিন্তু আজ তা বলে সত্যিই পারব না মিছে কথা বলতে। আমি সব জানি রে। তোর মন্তর নিতে চাওয়ার কথা—ওঁর অরাজী হওয়া! তোর প্রণাম আর ওঁর আশীর্বাদ! আমি সে রাত্রে আড়ি পেতে সব শুনেছিলাম!

শঙ্করী মুখটা আর তুলতে পারে না।

—তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে হতভাগী ? লজ্জা তো পাব আমি! কারণ আমিই তোকে মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম। তুই বরং আমাকে বাঁচিয়েছিস লোক-লজ্জা থেকে। আগে থেকে সাবধান করে দিয়ে তুই অতবড় মানুষটার মাথা হেঁট হতে দিসনি!

শঙ্করী তার অশ্রু-আর্দ্র মুখখানা অকপটে মেলে ধরে মাতৃসমা বড়দির দিকে। বলে, কিন্তু কেন তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন না ?

মহামায়া ওর চোখের দিকে তাকালেন। অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, ছুট্‌কি, তুই কি কিছুই আন্দাজ করতে পারিস না ?

শঙ্করী নয়ন নত করল।

—তাকিয়ে দেখ্‌! আমার চোখে চোখে তাকিয়ে ত্যাখ্‌ দিনি।

শঙ্করী পারল না। মাথা নাড়ল।

—তবে! তাহলে তো তুইও জানিস হতভাগী!

হু হু করে কেঁদে উঠল শঙ্করী। লজ্জা! এ কী লজ্জা! ছি ছি ছি! কেন তাকে এত রূপ দিয়েছিলেন ভগবান, কেন যৌবন দিয়েছিলেন ? তারই জন্য তাঁকে দেশান্তরী হতে হল!

এ ঘটনা তিনদিন পূর্বেকার।

আজ সংবাদ এল রাজা-মশায়ের বজরা ত্রিবেণীর ঘাট ছেড়েছে। যে-কোন মুহূর্তে বংশবাটির ঘাটে বজরা ভিড়তে পারে।

মহামায়া আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেননি। রাজবাড়ির সিংহদ্বারটি সজ্জিত হয়েছে দেবদারু পাতায়। নিশান আর ধ্বজা উড়ছে প্রাসাদ-শীর্ষে। কলি ফিরিয়েছেন রাজবাটির। কার্নিশে সারি-সারি মৃৎপ্রদীপ—সন্ধ্যায় জ্বালানো হবে। আতসবাজিও এসেছে কলকাতা থেকে। এসেছে গোরার বাদ্যি। আর তাঁর

গোপন বাসনাটিও চরিতার্থ করেছেন গোপনে। শুধু শঙ্করীই সে খবর জানে। ছোটরানীমার শয়নকক্ষে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিছু মালা আর ফুল। পালঙ্ক সাজানো হয়নি—হয়তো লজ্জা পাবেন রাজা-মশাই। কিন্তু অর্গলবদ্ধ ঘরে সেগুলি বার করে শঙ্করীই সেগুলি মেলে দেবে পালঙ্কে। মহামায়া নিশ্চিত ছিলেন—রাজা-মহাশয় দীর্ঘদিন পূর্বে শঙ্করীর জন্ম সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সে বাধা এতদিন পরে নিশ্চয় তিনি মানবেন না। মানতে দেবেন না মহামায়া।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল—বজরার এখনও দেখা নেই। মানুষজন ভীড় করে আছে বংশবাটির ঘাটে। নাপতিনী-বৌ এসে শঙ্করীর চরণে আলতা পরালো, নিম্নকণ্ঠে বলল, নতুন কাপড় নে যাব কাল ছোটরানীমা।

মোতির মা এসে বললে, বড়মা তোমারে ডাক্‌তিছে।

আবার কী হল? সেই একই ব্যাপার। কোন্ শাড়িটা শঙ্করী পরবে। বেনারসী না মস্‌লিন, নাকি মুর্শিদাবাদী। শঙ্করী বললে, তুমি যা বলবে তাই পরব। আজ তো তোমার জন্যেই সাজছি!

—বেশি ন্যাকামি করিস না ছুট্‌কি! ওরে আমার রে! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! সতীনের কাছ থেকে সোয়ামী কেড়ে নিচ্ছেন আবার কাঁদুনি গাওয়া হচ্ছে!

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হল মোতির মা। এসে গেছে!

শঙ্করীর বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

গঙ্গার দিক থেকে ভেসে এল তূর্যধ্বনি। পটকার শব্দ। শঙ্খধ্বনি।

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত হল মহামায়ার। মোতির মা লুটিয়ে পড়েছে মেজেয়। ও কি! ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন?

—কিরে মোতির মা! তোর কি হল? শঙ্করী ওকে ধরে তুলতে গেল। মোতির মা শঙ্করীর চরণজোড়া জড়িয়ে ধরে বললে, রাজা-মশাই কই গো? এ কে এল! এরে চিনি না!

—তার মানে!

—কে একজন বললে, রাজা-মশাই সাত নাও বোঝাই পাথর এনেছেন!

—পাথর! সাত নৌকো বোঝাই পাথর! কী বলছিস যা-তা!

—যা-তা কেন গো! স্বচখ্যে দেখনু যে!

মোতির মা তখনও মাথা খুঁড়ছে—ও রাজা-মশাই নয় গো! ও অন্য কেউ!

মহামায়া বিহ্বল হয়ে পড়েন। শঙ্করী বিমূঢ়। হঠাৎ বিনা এত্তেলাতেই ছুটে এলেন দেওয়ান দিলীপ দত্ত। বললেন, ভীড় হঠাও! তোমরা চলে যাও সবাই।

রানীমাদের সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

সবাই ছুটে পালালো। মহামায়া বলেন, কী হয়েছে দিলীপ? এরা কী বলছে?

দিলীপ বলে, মনকে শক্ত করুন বড়মা। অত্যন্ত দুঃসংবাদ আছে।

শঙ্করী মাথার ঘোমটা কমিয়ে দিয়ে বললে, বলুন। বড়দি প্রস্তুত। বড়দির মাথাটা সে কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসে। বলে, বলুন।

দিলীপ নতনেত্রে ধীরে ধীরে যে তথ্য নিবেদন করলেন তা অচিন্তাপূর্ব।

হ্যাঁ, রাজা-মহাশয় সাত-নৌকো-বোঝাই চুনার পাথর এনেছেন, লক্ষ তঙ্কা ব্যয়ে। সেটা কোন খবর নয়, আসল সংবাদ রাজা-মহাশয় সন্ন্যাস নিয়েছেন। তিনি আর সংসারে প্রবেশ করবেন না। বস্তুত রাজবাটিতে প্রবেশ করতেই তিনি অস্বীকৃত হয়েছেন। তিনি উঠেছেন তাঁর প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠিত ৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দির-সংলগ্ন অতিথিশালায়!

দিলীপ বলেন, বড়মা, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি পালকির ব্যবস্থা করি? ৺বাসুদেব মন্দিরে যেতে হবে।

মহামায়া জবাব দিতে পারলেন না। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে তিনি কেমন যেন পাথর হয়ে গেছেন। জবাব দিল শঙ্করী। স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, না! রাজা-মহাশয়কে বলবেন, হ্যাঁ আমি বলেছি বলেই বলবেন—তাঁর প্রস্তুতির জন্য বড়-রানীমা যদি সাত বছর প্রতীক্ষা করতে পেরে থাকেন, তবে বড়রানীমার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে সাতদিন প্রতীক্ষা করতে হবে। বড়দিকে স্থির হতে দিন। রাজা-মহাশয়ের এবং আপনাদেরও বোঝা উচিত, এ রকম একটা সংবাদে রোগপাণ্ডুর বড়রানীমা কতদূর মর্মাহত হয়েছেন।

দিলীপ বললেন, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন ছোটমা। আর কোন আদেশ?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকে যে বাজনদার এসেছে তাদের পাওনা মিটিয়ে বিদায় দিন। সন্ন্যাসীর জন্য গৃহসজ্জা বেমানান। ওগুলো সরিয়ে ফেলুন। আপনাদের রাজা-মহাশয় যদি আর এই নাটকীয় প্রবেশের পরিবর্তে সংবাদটা পূর্বে জানাতেন, আমাদের এভাবে লোকলজ্জায় পড়তে হত না।

দিলীপ পুনরায় বলেন, আমি আপনারই পক্ষে রানীমা! আমিও মর্মাহত!

—তৃতীয়তঃ রাজা-মশাইকে জিজ্ঞাসা করবেন—তিনি কি অতিথিশালার ভোগ গ্রহণ করবেন, না স্বপাক খাবেন, অথবা রাজবাড়ির অন্ন গ্রহণ করবেন।

—স্বপাক আহার করলে কি সিধা পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

—সে কথার জবাব আমি কেন দেব? আপনাদের সন্ন্যাসীরাজা জানেন তিনি সাত লক্ষ টাকার মালিক। তাঁর যা অভিরুচি! আমি শুধু জানতে চাই আমার হেঁসেলে তাঁর জন্য চাউল মাপা হবে কি না! সেটুকুই আমার এক্তিয়ারে।

দিলীপ এবার প্রণাম করলেন শঙ্করীকে।

গোরার বাদ্যি ফিরে গেল। নামিয়ে ফেলা হল প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে নিশান আর ধ্বজা। প্রদীপগুলি জ্বালা হল৷—ফিরে গেল মালগুদামে। আতসবাজির কি হল খবর নেই।

৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরে যথারীতি সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল।

শয়নারতি সমাপ্ত হলে নৃসিংহদেব তাঁর কম্বলটি বিছিয়ে দিলেন অতিথিশালার পাষাণ-চত্বরে। নৈশ আহারের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি একাহারী সন্ন্যাসী।

চোদ্দ

ক্রমে সমস্ত তথ্যটাই জানতে পারল শঙ্করী। দিলীপের মাধ্যমে। রাজা-রানীর সাক্ষাৎ হল না। না বড়রানীর, না ছোটরানীর। বড়রানীমা এ শোকের আঘাতে কেমন যেন হয়ে গেছেন। যেন তাঁর কোন বোধই নেই। হাসেন না, কাঁদেন না, কথা বলেন না। তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। কবিরাজ বলেন, বদ্ধ উন্মাদ তিনি হননি—হয়তো ক্রমে ক্রমে বোধের বিকাশ হবে, যদি দেহযন্ত্র ইতিমধ্যে বিকল না হয়ে যায়। আর ছোটরানীমা রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আর্জিই পেশ করেননি। রাজা-মহাশয়ও কোন ঔৎসুক্য দেখাননি। তিনি আছেন নতুন মন্দিরের জমিতে। একটি ছাপরা তুলে সেখানেই থাকেন তিনি। স্বপাক আহার করেন। কম্বলের শয্যা, ত্রিশূল, কমণ্ডলু—এই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাদবাকি সবই নাকি মায়ের। চোখে দেখেনি শঙ্করী, তবে মোতির মায়ের কাছে বর্ণনা শুনেছে—রাজা-মশাই একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কুঁজো হয়ে হাঁটেন। তাঁর মাথায় একমাথা পাকা চুল। একমুখ দাড়ি। কপালে যজ্ঞভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক।

শোনা গেল তাঁর কাশীবাসের ইতিকথা।

নৃসিংহদেবের সঙ্গে কাশীতে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের আলাপ হয়। রাজা-মহাশয় তাঁকে 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেন। ঐটাই ছিল তাঁর উপার্জনের রাজপথ। এছাড়া জোনাথান ডানকান নামে একজন সাহেব ঐ সময়ে কাশীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে

অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাচর্চা ছাড়া তিনি ধর্মালোচনার দিকেও ঝুঁকে ছিলেন। এক তান্ত্রিক সাধুর প্রভাবে কিছুদিন যোগাভ্যাসও করেছিলেন।

পাছে সংকল্পচ্যুত হন, তাই প্রতিদিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে যোগাসনে বসে জননী হংসেশ্বরীকে তিনি স্মরণ করতেন। মনে মনে বলতেন, মাগো—তুমি আমাকে বল দাও! তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমি ভুলিনি মা! নবাব আলিবর্দী তোমাকে অপমান করেছিল—সে আজ নির্বংশ। তবু স্বীকার করছি, তোমাকে আমি সসম্মানে বংশবাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। অভিমানে তুমি দেশত্যাগ করেছিলে, কাশীবাসী হয়েছিলে। অভিমানেই তুমি আমাকে শেষ দেখা না দিয়ে চলে গেলে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—পিতৃসম্পত্তি আমি উদ্ধার করবই। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। সসম্মানে তোমার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত করব আমার রাজ্যে।

তারপর এক রাত্রে। মাতৃস্মরণ করে যথারীতি শয্যাগ্রহণ করেছেন নৃসিংহদেব। কম্বলের শয্যায়, পাষাণচত্বরে। রাত্রি গভীর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাজা-মশায়ের। দেখলেন এক অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিচ্ছটা। সমস্ত শয়নকক্ষে পদ্মগন্ধ। ক্রমে সেই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর মাকে—হংসেশ্বরীকে। মা সশরীরে আবির্ভূতা হয়েছেন। অথচ কী আশ্চর্য! তিনি মাকে ঠিক চিনতে পারছেন না। ওঁর গর্ভধারিণী ছিলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা—অথচ প্রত্যাদেশে যাঁকে দেখলেন তিনি মসীকৃষ্ণা। চিৎকার করে উঠলেন নৃসিংহদেব—মা গো! এ তোর কী রূপ! তুই যে শোকে-দুঃখে মসীবর্ণা হয়ে গেছিস।

পরমুহূর্তেই মনে হল, না—যাঁকে দেখছেন তাঁর মুখের আদলটা তাঁর জননীর মত হলেও তিনি বস্তুতঃ জগজ্জননী। তাঁর একার জননী নন। প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মের উপর ললিতাসনে মা বসে আছেন—তাঁর কোন শোক নেই, ক্লেশ নেই, ক্ষেদ নেই—তিনি সদাহাস্যময়ী। বাম-চরণখানি দক্ষিণ-জঙ্ঘার উপর উত্তোলন করে হংসেশ্বরী মা তাঁকে বরাভয়-মুদ্রায় আশীর্বাদ করছেন। উজ্জ্বল আলোয় প্রথমটা চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ লক্ষ্য হল—মা যে-পদ্মের উপর উপবিষ্টা সেটি প্রস্ফুটিত হয়েছে যে-মৃণালদণ্ডে, তা শায়িত-মহাদেবের নাভিমূল থেকে বহির্গত। শিব এক ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রের উপর শায়িত। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর বামদিকের উপরস্থ হাতে খড়্গ এবং নীচে নরমুণ্ড এবং দক্ষিণাংশে উপরে অভয়মুদ্রা ও নীচে শঙ্খ।

ঠিক তখনই যেন অন্তরীক্ষে দৈববাণী হল: অহমিতি বীজম স ইতি শক্তিঃ। সোঽহম্ ইতি কীলকম্॥

হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হল। স্বপ্নভঙ্গ? স্বপ্ন দেখছিলেন এতক্ষণ—এত প্রত্যক্ষ? এত সজ্ঞানে? মোটকথা বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। দেখলেন—জ্যোতিঃপুঞ্জ অন্তর্হিত হয়েছে, পদ্মগন্ধ বিলীন হয়ে গেছে বাতাসে এবং তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে স্বেদে।

আশ্চর্য ঘটনাচক্র! পরদিন সকালেই বংশবাটি থেকে সংবাদ এল দেওয়ান দিলীপ দত্ত জানিয়েছেন—গত সাত বৎসরে রাজকোষে সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত হয়েছে। কেমন করে হয়? তিল তিল করে বর্ধিত হয়েছিল সঞ্চয়ের অঙ্ক পাঁচ থেকে ছয় লক্ষে। সঞ্চয়ের হার অপরিবর্তিত থাকলে আরও পাঁচ-সাত বছর লেগে যাওয়ার কথা—ঐ ছয় অঙ্কটা সাতে পরিবর্তিত হতে। তাহলে কোন্ মন্ত্রবলে দিলীপ রাতারাতি এক লক্ষ তঙ্কা সংগ্রহ করল? সে কথা দিলীপ লেখেনি। একটু ক্ষুব্ধ হলেন রাজা-মহাশয়। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠালেন, অবিলম্বে তাঁকে এক লক্ষ তঙ্কা প্রেরণ করতে। কেন—তা জানালেন না। জানালেন না—ইতিমধ্যে তাঁর অন্তররাজ্যে এক ভূমিকম্পে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। না, মামলা নয়, পিতৃরাজ্য উদ্ধার নয়—ঐ সাত লক্ষ তঙ্কায় তিনি বংশবাটিতে নির্মাণ করে যাবেন অপরূপ এক মায়ের মন্দির। মা হংসেশ্বরীর মন্দির। এই তাঁর মায়ের আদেশ। একদিন তিনি থাকবেন না, তাঁর রাজ্য থাকবে না—হয়তো রাজবাটির গরিমা ধূলার সঙ্গে মিশে যাবে মহাকালের শাসনে। যাক, তবু সেই উন্নতশীর্ষ মন্দির থাকবে। আর শাশ্বতকাল থাকবে মায়ের নাম। তাঁর গর্ভধারিণী মা, হংসেশ্বরীর—তাঁর ইষ্ট-জননী মা, হংসেশ্বরীর।

লক্ষ রৌপ্যমুদ্রায় তিনি ক্রয় করলেন সাত নৌকোবোঝাই চুনার-পাথর। নৃসিংহদেব পণ্ডিত—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং তাঁর প্রপিতামহ রামেশ্বর রায় প্রতিষ্ঠিত ৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরে দেখেছেন, পোড়ামাটির কাজ বাংলা দেশের এই জ'লো আবহাওয়ায়, ক্রমাগত বার্ষিক ধারাপাতে অত্যন্ত দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে চলে পড়ে। মাত্র তিন পুরুষের ভিতরেই ৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের অনেক ভাস্কর্যের নাক-মুখ ক্ষয়ে গেছে। তাই তিনি হংসেশ্বরী মন্দির গড়বেন প্রস্তরে, পোড়ামাটিতে নয়। সে মন্দির হয়তো 'যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী' দাঁড়িয়ে থাকবে না, তবু বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে।

রাজা-রানীতে সাক্ষাৎ হয়নি, এ কাহিনী নৃসিংহদেব সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন তাঁর পুত্র-প্রতিম দিলীপ দেওয়ানকে।

সেই কাহিনী বিস্তারিত শোনাচ্ছিল দিলীপ, রাজা-মহাশয়ের প্রত্যাবর্তনের দিন-তিনেক পরে—বড়রানীমার শয়নকক্ষে। মহামায়া নির্জীবের মত পড়ে আছেন বিছানায়। দিলীপের বিস্তারিত বিবরণ হয়তো কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল

ঠিকই, কিন্তু মস্তিষ্কের চিহ্নিত রন্ধ্রকোষে বোধের হয়তো জন্ম দিচ্ছিল না। কারণ তাঁর কোনও ভাবান্তর নেই। কাঁদছেন না, আহা-উহু করছেন না,—শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানলার দিকে। চতুষ্কোণ জানলায় লোহার গরাদে মা-গঙ্গার দৃশ্যটি শূলবিদ্ধ। সেইদিকেই তাকিয়ে নিশ্চুপ শুয়েছিলেন তিনি। শঙ্করী বসেছিল ওঁর পায়ের কাছে। ধীরে ধীরে মহামায়ার পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বস্তুতঃ সেই-ই ছিল দিলীপের একমাত্র শ্রোতা।

দিলীপ আজ সাত বছর ধরে যাতায়াত করছে রাজবাড়ির অন্দর মহলে। কিন্তু কোনদিন শঙ্করীর সঙ্গে কথা বলেনি। ছোটরানীমার সঙ্গে তার বয়সের প্রভেদ খুব বেশী নয়—দিলীপ প্রায় শঙ্করদেবেরই বয়সী। তাই উভয়েই সংকোচে কখনও পরস্পরের সম্মুখে আসেননি। ছোটরানীমার সৌন্দর্যের খ্যাতি সুবিদিত—সে কথা না জানা থাকার কোন কারণ নেই। দুরন্ত কৌতূহলও ছিল দিলীপের। কিন্তু কৌতূহলকে সে দমন করেছিল এতদিন। মাঝে মাঝে অলক্তকরাগরঞ্জিত দুটি দ্রুতছন্দ নূপুর-নন্দিত চরণ সে দেখেছে। কখনও দেখেছে কঙ্কণ-চূড়-শোভিত গজদন্তশুভ্র একটি হাত—কিন্তু তাঁর মুখখানা কখনও দেখেনি। সেদিন সন্ধ্যায় মর্মান্তিক প্রয়োজনে সে যখন দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করতে এল তখন শঙ্করী তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে সরাসরি কথা বলেছিল তাঁর সঙ্গে। তারপর থেকেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বুদ্ধিমতী শঙ্করী বুঝে নিয়েছে—বড়দির যা অবস্থা তাতে তাকেই এবার হাল ধরতে হবে। এবং তা ধরতে হলে—ঐ দেওয়ানজীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রাখলে চলবে না। বহির্জগতের সঙ্গে ঐ একটিই বিশ্বাস-যোগ্য যোগসূত্র। ওর সঙ্গেই বড়দির স্বাস্থ্যের বিষয়ে পরামর্শ করতে হয়, বৈষয়িক কথাবার্তা চালাতে হয়। তাই দেওয়ানজী বড়মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে সে অকুণ্ঠচিত্তে এসে বসেছিল বড়দির পায়ের কাছে। মাথায় আধো-ঘোমটা টেনে।

দীর্ঘ-কাহিনী শেষ করে দিলীপ সরাসরি তার ছোটমাকে সম্বোধন করে বলল, ছোটমা, আজ আমি এসেছিলাম আর একটি সংবাদ জানাতে, এটিও দুঃসংবাদ এবং মর্মন্তুদ। বড়মাকে বলে লাভ নেই। তিনি তো থেকেও নেই। আপনাকেই বলব। কিন্তু এভাবে একের পর এক দুঃসংবাদ জানাতে স্বতঃই আমি কুণ্ঠিত হচ্ছি।

শঙ্করী বললে, আপনি দূতমাত্র। শুধু তাই নয়, আপনিই এ রাজপুরীর একমাত্র হিতৈষী। বলুন আপনি। আমি প্রস্তুত।

—রাজা-মহাশয় কাশীধাম থেকে একাকী প্রত্যাবর্তন করেননি। তাঁর সঙ্গে

আরও একজন এসেছেন। আপনার চেয়ে বছর দশেকের ছোটই হবেন। তাঁর নাম শ্রীকৈলাসদেব রায়। তিনি বংশবাটির ঘাটে অবতরণ করেননি—সোজা কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, মিস্ত্রি-মজুর সংগ্রহ করে আনতে। আজ তিনি ফিরে এসেছেন।

—বুঝলাম না। এটা দুঃসংবাদ কেন?

ইতস্ততঃ করল দিলীপ। তারপর বললে, সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে রাজা-মশায় ঐ কৈলাসদেব-রায় মশায়কে কাশীতে থাকতেই শাস্ত্রমতে দত্তক-পুত্র নিয়েছেন। তিনি আইনমতে রাজা-মহাশয়ের ওয়ারিশ—তাঁর সন্তান!

শূন্যে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি মহামায়া হঠাৎ বলে ওঠেন: তাহলে এভাবেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করলে তুমি! বলিহারি!

দুজনেই চমকে ওঠে। শঙ্করী বললে, বড়দি কিছু বললেন না?

দিলীপ বললে, অসঙ্গত কথা। সম্ভবত বিকারের ঝোঁকে।

তবু শঙ্করী ঝুঁকে পড়ে তার বড়দির মুখের উপর: কিছু বললে বড়দি?

মহামায়া না-রাম, না-গঙ্গা!

শঙ্করী এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। দিলীপকে বলে, এটাই বা দুঃসংবাদ কেন হতে যাবে দেওয়ানজী? আমরা দুই বোনই নিঃসন্তান। পূর্বপুরুষদের 'লুপ্ত-পিণ্ডোদক' না করার এটাই তো শাস্ত্রীয় বিধান। উনি তো ঠিকই করেছেন।

দিলীপ পূর্বদিনই প্রণাম করেছিল তার ছোটমাকে। আজও তার করতে ইচ্ছে করছিল। কী অদ্ভুত মহিমময়ী নারী। কোনও বিকার নেই। বললে, কৈলাসবাবু আমাকে বলেছেন, তিনি মায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনি বস্তুতঃ মাঝমহালে অপেক্ষা করছেন। তাঁর পরিচয় অবশ্য আমি এবং রাজা-মহাশয় ছাড়া এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না। আপনি অনুমতি করলে তাঁকে নিয়ে আসি এখানে।

এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিল শঙ্করী। তারপর বললে, না। তাঁকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে বলুন। আজ সন্ধ্যায় আমি রাজা-মশায়ের পর্ণকুটিরে যাব। তাঁকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলবেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। আপনি পালকির ব্যবস্থা করুন।

দিলীপ অনেক কিছুই জানে। সে বিস্মিত হয়ে যায় ছোটরানীমার এ সিদ্ধান্তে। অবাক হয়ে বলে, আপনি নিজে যাবেন রাজা-মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?

—উপায় কি বলুন দেওয়ানজী? কৈলাস আমার সন্তান, আমার পুত্র—কিন্তু

ধর্মপত্নীর হাতে সন্তানকে তুলে দেবার অধিকার আর কার আছে?

এবার আর দ্বিধা করেনি দিলীপ। উঠে এসে পদধূলি নিয়েছিল তার ছোট-মায়ের।

বয়সের বাধা অস্বীকার করে শঙ্করী ওকে 'তুমি' সম্বোধন করল, নাম ধরে ডাকতে একটুও কুণ্ঠিত হল না। বললে, তুমিও সেখানে উপস্থিত থাকবে দিলীপ। কৈলাসের পরিচয় তার বাপকে দিতে হবে দু'বার—দুটি পরিচয়; পারিবারিক—যা বুঝে নেব আমি, এবং আইনঘটিত—যা বুঝে নেবে তুমি। কৈলাসকে দত্তক নেওয়ার সময় তুমি-আমি কেউই তো উপস্থিত ছিলাম না।

—তাই হবে ছোটমা!

সেদিন সন্ধ্যায় পালকি এসে লাগল অন্দর-মহলে। স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার পূর্বে শঙ্করী এসে দাঁড়ালো তার বড়দির শয়ন-কক্ষে। সঙ্গে মোতির মা। বললে, মোতির মা, বড়দির মাথাটা একটু তুলে ধর তো, প্রণাম করব।

বড়দির বোধ নেই, থাকলে তিনি দেখতেন শঙ্করীর সাজসজ্জা ঠিক সেই রাত্রের মত। যে-রাত্রে সে শয়নকক্ষে আহ্বান করেছিল কাব্যতীর্থকে। সেই লাল-পাড় কার্পাসের শাড়ি, সেই নিরলঙ্কার মণিবন্ধে শাঁখা আর নোয়া। মোতির মা আপত্তি করেছিল। শঙ্করী শোনেনি, বলেছিল—সন্ন্যাসী দর্শনে যাচ্ছি যে রে। সাজতে নেই।

বড়দি কিন্তু কোনও কথা বলল না। বুঝবে না তবু শঙ্করী ঐ জড়বুদ্ধিসম্পন্নাকে বললে, বড়দি! তাঁর কাছে যাচ্ছি! তুমি অনুমতি দাও। আজ তিনি আমাকে পুত্রসন্তান দান করবেন!

বড়দি কী বুঝলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর মাথাটা টেনে নিয়ে সীমন্তের উপর চুম্বন করলেন।

হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো! পালকি এসে থামল ৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের কাছে। হংসেশ্বরীর মন্দির উঠছে, তারই ঠিক পাশ ঘেঁষে। সেখানেই তৈরী হয়েছে এক পর্ণকুটির। বাঁশের খুঁটি, উলু খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল। বংশবাটির রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায়ের রাজ-প্রাসাদ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল। মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে; আর তার সঙ্গে হাসনুহানার গন্ধ। পালকি থেকে নামল বংশবাটির ছোটরানী। মাথার ঘোমটা আরও একটু টেনে দিল। উঠে এল পর্ণকুটিরের দাওয়ায়। বাঁশের-ঝাঁপ-লাগানো দরজাটা খোলাই আছে। ঘরে একটি মৃৎ-প্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় কম্বলের আসনে বসে

আছেন এক বৃদ্ধ। এক সন্ন্যাসী। সংসারাশ্রমে যাঁর পরিচয় ছিল নৃসিংহদেব রায়, রাজা-মশায়। তাঁর এক পার্শ্বে দিলীপ এবং অপর পার্শ্বে একজন তরুণ—নিঃসন্দেহে রাজা-মশায়ের দত্তকপুত্র, কৈলাস।

শঙ্করী হাঁটু গেড়ে বসল। পদ্মাসনে বসে থাকা সন্ন্যাসীর পদধূলি নিতে বাড়িয়ে দিল তার শঙ্খশোভিত নিরাভরণ দক্ষিণহস্ত। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, না, না, না! আমার পাদস্পর্শ করো না ছোটরানীমা!

হাত টেনে নিল শঙ্করী। ছোটরানীমা! মা! ছোটবউ নয়! গড হয়ে মাটিতেই মাথা ঠেকালো। দিলীপ একটি আসন পেতে দিল, সেটা সরিয়ে ভূতলেই বসল শঙ্করী। মাথার ঘোমটা হাত দিয়ে কমিয়ে দিল। প্রদীপের আলো পড়ল তার মুখে। স্পষ্টভাবে বলল, সন্ন্যাসাশ্রমে আপনার কী নাম জানি না, আপনাকে কি রাজা-মশায় বলেই সম্বোধন করব?

চমকে উঠল দিলীপ ছোটমায়ের অকুণ্ঠ দৃঢ়তায়। নৃসিংহদেবও বোধ করি কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শঙ্করীর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বললেন, তোমার বড়দি কেমন আছেন?

শঙ্করী মুখটা ঘোরালো। একটু ভর্ৎসনা-মিশ্রিত কণ্ঠে দিলীপকে বললে, বড়-রানীমার শারীরিক সংবাদ ওঁকে জানান না কেন? এবার থেকে প্রত্যহ কবিরাজ মশাই কি বলে গেলেন তা ওঁকে জানাবেন।

দিলীপ বুঝতে পারে এ ধমক তাকে নয়। সে শুধু বললে, জানাব মা। বড়মা একই রকম আছেন। ওঁকে এইমাত্র তা জানিয়েছি।

নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। নৃসিংহদেব প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললেন, পড়াশুনার চর্চাটা রেখেছ?

এ প্রশ্নেরও জবাব দিল না শঙ্করী। প্রতিপ্রশ্ন করল, ইনিই কি কৈলাসদেব?

—হ্যাঁ। তোমার ছোটমাকে প্রণাম কর কৈলাস।

কৈলাস উঠে এসে প্রণাম করল শঙ্করীকে। পুনরায় গিয়ে বসল তার আসনে।

—ওঁকে আপনি কাশীতে দত্তক নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। মাস কয়েক পূর্বে।

শঙ্করী কৈলাসের দিকে ফিরে বললে, তাহলে তুমি বাবা এখন থেকে রাজ-বাড়িতে থাকবে। রাজা-মশায় যে ঘরে ছিলেন সেটা ঝাড়-পোঁছ করাই আছে—

বাধা দিয়ে কৈলাস বললে, না ছোটমা, আমি বাবামশায়ের সঙ্গে এখানেই

থাকব। ওঁর দেখাশোনার কেউ নেই—

নৃসিংহদেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই শঙ্করী বলে ওঠে, কথাটা তোমার ঠিক হল না বাবা। উনি সন্ন্যাসী। ওঁর তো দেখাশুনার জন্য লোকের প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলেই তো উনি দশটা দাস-দাসী নিয়োগ করতে পারেন। এ ওঁর স্বকীয় কৃচ্ছ্রসাধনা। অথচ তুমি গৃহী। এতবড় জমিদারী তোমাকে চালাতে হবে। এতটা বয়স পর্যন্ত বোধ করি জমিদারী সংক্রান্ত কিছুই শেখনি, নয়?

কৈলাস জবাব দিল না। নৃসিংহদেবই তার হয়ে বললেন, তুমি ঠিক অনুমান করেছ ছোটরানীমা। কৈলাস এতদিন কাশীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেছে। যন্ত্রসঙ্গীতে ওর অদ্ভুত অধিকার। জমিদারী সংক্রান্ত কোনও অভিজ্ঞতা ওর নেই। আর ও-কথাটাও তোমার ঠিকই হয়েছে। ও গৃহী, আমি সন্ন্যাসী। ওর পক্ষে এই কুটিরে পড়ে থাকা নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়, অন্যায়।

কৈলাস তবু দৃঢ়স্বরে বললে, তা হোক। আমি আপনার কাছে এখানেই থাকব।

শঙ্করী বললে, তোমার যেমন অভিরুচি।

আবার ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ। সে নিস্তব্ধতা শঙ্করীই ভঙ্গ করল। বললে, আর একটা কথা। দেওয়ান রঘুনাথ দত্তজী অবসর নেবার পর থেকে বংশবাটির কোনও আইনতঃ দেওয়ানজী নেই। অর্থাভাবে রাজসরকার কোন দেওয়ান নিযুক্ত করেননি। অথচ আজ প্রায় দশ বৎসর কাল দিলীপ সে কর্মভার বহন করছে। অবৈতনিকভাবে। এখন তো রাজসরকারের অর্থাভাব নেই। তাই আমার প্রস্তাব—দিলীপ দত্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়ান-পদে বরণ করা হোক, ওর পিতামহ যে বেতন পেতেন সেই বেতনে।

নৃসিংহদেব বলেন, অর্থাভাব এখনও আছে। আমাদের সঞ্চয় হয়েছিল সাত লক্ষ। তার ভিতর এক লক্ষ তঙ্কার উপকরণ ক্রয় করেছি। হংসেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করতে বাকি ছয় লক্ষ তঙ্কাই লাগবে। তবে তুমি যা বলছ তাও সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। দিলীপ কেন অবৈতনিক পরিশ্রম করবে?

দিলীপ দত্ত বাধা দিয়ে বলে, না না, রাজা-মহাশয় আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি এবং আপনার পিতৃদেব আমার পিতামহকে যে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন তাতেই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায়। অর্থের জন্য আমি লালায়িত নই। ব্যবস্থা যে রকম ছিল তাই থাকুক। তা ছাড়া আমি এঁদের 'মা' বলে ডেকেছি। মায়েদের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য আবার বেতন কিসের?

রাজা-মহাশয় বললেন, তবে তো লেঠা চুকেই গেল!

—না গেল না! শঙ্করী দৃঢ় প্রতিবাদ করল। সকলেই চমকে ওঠেন। শঙ্করী তার স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললে—আপনি মায়ের মন্দির গড়তে যে-সব মিস্ত্রি-মজুর-স্থপতিবিদদের নিয়োগ করবেন তাদের তো যথাযথ পারিশ্রমিক দেবেন, 'মায়ের মন্দির' বলে তারা তো আপনাকে রেয়াৎ করবে না। দিলীপও পরিশ্রম করছে; কৈলাস জমিদারীর কিছু জানে না—আদায়পত্র কিভাবে হয়, কিভাবে তহবিল বৃদ্ধি করতে হয়, কিভাবে জমিদারী সুরক্ষিত করতে হয়। মনে হয়, সেদিকে ওর আগ্রহও নেই—যেহেতু ও তা শিখতেও অরাজী। এক্ষেত্রে মন্দির তৈরীর কাজের জন্যই দিলীপকে দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করা উচিত। এই আমার অভিমত। আপনি কি বলেন?

—আমি কি বলব শঙ্করী? আমি সন্ন্যাসী! এসব বৈষয়িক কথা।

শঙ্করী! এতক্ষণে তাকে নাম ধরে ডাকলেন। তবু নরম হল না ছোটরানী। একই ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, এটা তো আপনার মত কথা হল না রাজা-মশায়। আপনি সন্ন্যাসী—কিন্তু তহবিল আপনার নামে। আপনার সই ছাড়া ওর এক কপর্দক ব্যয় করা যাবে না। আপনি সংসারত্যাগী হলেও বিত্তবান সন্ন্যাসী। চার-ধামের মোহান্তের মত। তাঁরা সাধন-ভজন করেন, কিন্তু বিষয় যখন আছে তখন বৈষয়িক আলোচনাও করেন। আপনিই বা তা থেকে রেহাই পাবেন কেমন করে?

নৃসিংহদেব হঠাৎ বলে ওঠেন, বেশ। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দান করে দিচ্ছি। তুমি গ্রহণ কর—শুধু এক শর্তে! আমার মনের মত মন্দির তুমি গড়তে দেবে!

সিদ্ধান্ত নাকি এমন হঠাৎই নিতে হয়!

শঙ্করীও সিদ্ধান্তে এল মুহূর্তে। বললে, আমি তা গ্রহণ করব কেন? আপনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করার পূর্বে প্রস্তাব করলে নিশ্চয় আমি রাজী হতাম। আজ পারি না রাজা-মশায়। আপনি কাশী থেকে অপুত্রক প্রত্যাবর্তন করেননি। তার অভিশাপ কেন আমি কুড়োতে গেলাম?

তিনজনেরই দৃষ্টি গেল কৈলাসদেবের উপর। সে নতনয়নে স্থির হয়ে বসে রইল। নৃসিংহদেব বলেন, বেশ, তাহলে তোমার প্রস্তাবই গ্রহণ করছি। দিলীপকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়ান পদে বরণ করে নেব।

এবার আপত্তি জানালো দিলীপ স্বয়ং: আমার আপত্তি আছে রাজা-মহাশয়। আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নই।

নৃসিংহদেব নন, শঙ্করীই প্রশ্ন করলে, কেন দিলীপ ?

—ছোটমা, বিবেচনা করে দেখুন,—ঠিক যে কারণে আপনি রাজা-মহাশয়ের দান গ্রহণ করতে পারলেন না, সেই কারণেই আজ আমি এ জমিদার সরকারের দেওয়ান-পদ গ্রহণ করতে পারি না। আমি আপনাদের সুপরিচিত—কিন্তু এ সম্পদের ভবিষ্যৎ-অধিকারী কৈলাসবাবুর কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং যে-ব্যবস্থা ছিল সেটাই চলতে দিন।

এবারও শঙ্করী বললে, তোমার যেমন অভিরুচি'

পনের

হংসেশ্বরী মন্দিরকে অসমাপ্ত রেখে নৃসিংহদেব স্বর্গারোহণ করলেন আরও তিন বছর পরে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। একটা ইন্দ্রপাত হল যেন বংশবাটিতে। মহাশয়ের দাহ দেখতে কাতারে কাতারে লোক ভীড় করে এল বংশবাটির শ্মশানঘাটে। না, শুধু রাজা-মহাশয়ের শেষকৃত্যের জন্য নয়—এত জনসমাবেশ হওয়ার কারণ—ঐ সঙ্গে বংশবাটির দুই রানীমা সহমরণে যাচ্ছেন, এই খবর রটে যাওয়ায়। প্রধানা না হলেও কনিষ্ঠা রাজমহিষী—ত্রিংশতি-বর্ষীয়া রানী শঙ্করীর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। তাঁকে চোখে কেউ দেখে না—শুধু কানে শোনে তাঁর অপূর্ব দেহ-লাবণ্যের কথা। সেই তিনি উঠবেন জলন্ত চিতায় !

১৭৪০ থেকে ১৮০২। বাষট্টি বছরে নৃসিংহদেব অনেক কিছুই দেখে গেলেন দুনিয়ায়। নবাবী আমল থেকে কোম্পানীর রাজত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসও বদলে গেছে দ্রুতচ্ছন্দে। ফরাসী দেশে বাস্টিল দুর্গ বেদখল হয়েছে—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জাকোবিন-দল রাজতন্ত্রকে ধুলায় লুটিয়ে দিল—গিলোটিনে কাটা পড়ল রাজা-মহারাজার মাথা। সপরিবারে। তারপর সেই গিলোটিনেই কাটা পড়লেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা। ড্যান্টন, রোবসপীয়র। সন্ত্রাসের রাজ্যকাল উত্তীর্ণ হল—সেখানে সদ্য উদিত হচ্ছেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইংলণ্ডে এল শিল্পবিপ্লব। স্বাধীন হল আমেরিকা।

বংশবাটির ঢিমেতালা জীবনে এ সবের কোনও ছায়াপাত ঘটেনি। সেখানে আগেও যেমন, আজও তেমনি—শেয়াল ডাকে, জোনাক জ্বলে, মাঝিরা গান গায়, আর পালকি বাহকরা পথ চলে হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো! বেল-জুঁই-শিউলি ফোটে আর ঝরে। আসে নানা পালা-পার্বণ—দুর্গোৎসব, কোজাগরী, গাজন, রথের মেলা।

বছরে বছরে একই রূপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে। ৺অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে কোনও ছন্দবদল হয় না—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ—বৈকালী, সন্ধ্যা-বন্দনা, শয়নারতি!

রাজা-মশায় চলে গেলেন—ভ্রূক্ষেপও করল না বংশবাটির আম-তাল-অর্জুন-পাকুড়-শিমুল গাছের সারি। তারা একই ছন্দে মাথা দোলাতে থাকে।

এ তিন বছরে বংশবাটির রাজপরিবারের রূপও বেশ কিছু বদলেছে। বড়-রানীমার যদিচ কোন পরিবর্তন হয়নি, ছোটরানীমার হয়েছে। তিনি আর মোটেই উদাসীন নির্লিপ্ত নন, কাব্যপাঠে একটি মুহূর্ত ব্যয় করেন না। বস্তুতঃ শঙ্করদেব দেশত্যাগ করার পর তিনি আর কোনদিন তাঁর অতিপ্রিয় পুঁথিপত্রের বাণ্ডিলটা পেড়ে 'নামাননি। এখন সমস্ত ভিতরবাড়ির দায়িত্ব যে তাঁর উপর। বড়রানীমা থেকেও নেই। শয্যাশায়ী তো ছিলেনই, এখন বোবা-কালা; কানে শোনেন কিনা কে জানে, মুখে বলেন না কোনও কথা। চুপচাপ বিছানায় পড়ে আছেন তিন বছর। তাঁকে নাওয়ানো-খাওয়ানোর দায়িত্ব এখন মোতির-মায়ের। ছোটরানী তাঁর খাস দাসীকে ছাড়া আর কাউকে ও-কাজ দিয়ে ভরসা পাননি। অন্দর-মহলের কাজ ছাড়াও তাঁকে আর একটি কাজ করতে হয়—ঐ মন্দিরের হিসাব দেখা। নিত্য সন্ধ্যায় বড়মিঞা এসে দাঁড়ায় খাস-মহালে। চিকের ওপাশ থেকে হাজরির হিসাব জানায়; উনি লিখে নেন। সপ্তাহান্তে টাকা মেটানোর দায় তাঁর। মাঝে মাঝে পালকি চেপে স্বয়ং কাজ পরি-দর্শনে যান।

ইতোমধ্যে উত্তরখণ্ড থেকে এসেছে দক্ষ কারিগর। প্রস্তরশিল্পী। চুনার-পাথর দিয়ে তারা তিল-তিল করে গড়ে তুলছে নৃসিংহদেবের 'তাজমহল'। রাজা-মশাই আছেন মন্দিরের সংলগ্ন সেই কুটিরে। ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই শয্যত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জপে বসেন। তারপর একপ্রহর বেলায় ছাতাটি বগলে নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে যেতেন মন্দির চাতালে। মধ্যাহ্নে ঘরে ফেরার তাগাদা নেই —একাহারী তিনি। সন্ধ্যায় কুটিরে প্রত্যাগমন করে পুনরায় জপে বসেন। এক প্রহর রাতে রান্না চড়ান। যা-হোক কিছু ফুটিয়ে নিয়ে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ। নিত্যি ত্রিশ দিন।

কৈলাসদেব অবশ্য এখন আর সে কুটিরের ভাগিদার নন। তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছেন রাজা-মহাশয়ের পরিত্যক্ত কামরাটায়। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-খোলা সব চেয়ে ভাল ঘরখানায়। ইতোমধ্যে শঙ্করী যে বিবাহ দিয়েছেন পুত্রের। দশম-বর্ষীয়া রানী-কাশীশ্বরী এখন বৌ-রানীমা। এ পঞ্চাশ বছরে যুগের হাওয়া কিছু

পাল্টেছে। আগেকার কালে রাজাদের ঘর আর রানীদের ঘর পৃথক ছিল। রাজা দিবাভাগে থাকতেন বারমহালে—শুধু মধ্যাহ্নভোজনের সময়েই আসতেন অন্দরে। এখন কৈলাসদেব এবং কাশীশ্বরীর ঘর অভিন্ন। যুগের হাওয়া। কৈলাস জমিদারীর ঝামেলার মধ্যে যেতে চান না। গান-বাজনার সখ তাঁর। সন্ধ্যা-বেলায় শুধু বার-মহালে গিয়ে সঙ্গীতচর্চা করেন। বাকি সময়ে নিজের ঘরে বসেই রেওয়াজ করেন—কাশীশ্বরীর নজরবন্দী হয়ে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে রাজপরিবারে। কাশীশ্বরীর সম্পর্কের মামা হন এমন একজন এসে আশ্রয় নিয়েছেন রাজবাটিতে। তিনি নাকি জঙ্গী! কোম্পানীর হয়ে লড়াই করেছেন কোথায়-কোথায়। তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। ভাগ্নীর প্রতি স্নেহবশতঃ এখন তার সংসারেই আছেন। চেহারাখানা না হলেও মেজাজখানা তাঁর জঙ্গীলাটের মত। আর আছে মোম দিয়ে পাকানো একজোড়া গোঁফ। নানান বাতিক আছে তাঁর। রাজবাড়ির হেঁসেলে আহারাদি করেন না। তাঁর ঘরে সিধে পাঠিয়ে দিতে হয়। তাঁর খাস-ভৃত্য শম্ভু পাক করে দেয়। ভদ্রলোকের অদ্ভুত গল্প করার ক্ষমতা। ঐ এক গুণেই তিনি বংশবাটি গ্রামের অনেক অনেক আবালবৃদ্ধের মনোহরণ করেছেন। টিপু সুলতানের মৃত্যুসময়েও তিনি উপস্থিত, আবার আরাকানরাজের সেনাপতির হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যও তাঁর প্রত্যক্ষ করা ঘটনা—যদিও সাল-তারিখের হিসাবে হয়তো দেখা যাবে দুটি ঘটনাই ঘটেছে একই সময়ে—হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে। তা হোক—গল্প শোনাবার ক্ষমতা আছে হাবিলদার-মামার।

হাবিলদার-মামা নামেই তিনি পরিচিত বংশবাটিতে। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে মিলিটারী বুট পায়ে, ব্যাটন হাতে তিনি প্রাতর্ভ্রমণে যান, এবং ফেরার পথে হাটের কোন দোকানে বসে গল্প ফাঁদেন।

এতে আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু দেখা গেল—কী জানি কী ভাবে তিনি ক্রমশঃ কৈলাস ও কাশীশ্বরীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন। শঙ্করীর দৃষ্টি এদিকে প্রথম আকৃষ্ট হল একটি তুচ্ছ ঘটনায়। তুচ্ছ অবশ্য শঙ্করীর কাছে, মোতির-মায়ের কাছে সেটা মর্মান্তিক। সে এসে জড়িয়ে ধরল শঙ্করীর চরণ দুটি : মা তুমি না বাঁচালে মরি যাব!

—কী হল তোর? এমন করছিস কেন?

—কুমার-বাহাদুর মোতিরে জবাব দে দিছে! মাইনে দে খ্যাদায়ে দিছে!

ভ্রূকুঞ্চিত হয় শঙ্করীর। অন্দর-মহলের দাস-দাসীদের শাসন করাটা তার এক্তিয়ারে। মোতির-মায়ের মেয়ে মতি এখন আর ছোটটি নয়, দিব্যি ডাগর

হয়ে উঠেছে। বয়সে সে কাশীশ্বরীর চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। তাকে কাশীশ্বরীর খাস-দাসী করা হয়েছিল। হয়তো কাশীশ্বরীর ইচ্ছানুযায়ীই তাকে বরখাস্ত করেছে কৈলাস—কিন্তু ব্যাপারটা শঙ্করীকে জানানো উচিত ছিল। শঙ্করী মোতির-মাকে বললে, ঠিক আছে। আমি দেখছি।

কৈলাস ঘরেই ছিল, কিন্তু ঘরে বৌমাও আছে। দরজায় বাইরে থেকে গলা খাঁকারি দিল শঙ্করী: বৌমা আছ নাকি?

সেতারের ঝঙ্কার স্তব্ধ হল। ভিতর থেকে কৈলাস সাড়া দিল: আসুন ছোট-মা! আছে।

—এই যে তুমিও আছ। দরকারটা তোমার সঙ্গেই বাবা। মোতিকে কি তুমি জবাব দিয়েছ?

কৈলাস কিছু বলার পূর্বেই ঘোমটার ভিতর থেকে কাশীশ্বরী বলে ওঠে, হ্যাঁ, দিয়েছে। দেবেই তো। ও কেন আড়ি পেতে আমাদের দুজনের কথা শুনতে আসে?

শঙ্করী বুঝতে পারে। এ আড়ি-পাতা কানাইয়ের মায়ের মত নয়। মোতিরও পনের-ষোল বছর বয়স। এতটা বয়সেও অনূঢা। নবদম্পতির ঘরে সে যদি আড়ি পেতেই থাকে তার মূল কারণ নিতান্তই কৌতুক। কৌতুহল! শঙ্করী গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে আমি প্রশ্নটা করিনি বৌমা। তাছাড়া স্বামীর সম্মুখে শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলাও বংশবাটির রাজবাড়ির শিষ্টচার-বিরুদ্ধ!

কাশীশ্বরীর বয়স মাত্র দশ, কিন্তু সব মানুষ তো এক ধাতুতে তৈরী নয়। সে মাথার ঘোমটা কমিয়ে দিল। সরাসরি শঙ্করীর চোখে চোখ রেখে বললে, আপনি যতই ওর হয়ে সুপারিশ করুন আপনার ছেলে ওকে চাকরিতে রাখবে না। ঝনাৎ করে চাবির গোছা পিঠে ফেলে মল ঝমঝমিয়ে বৌরানীমা কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

শঙ্করী স্তম্ভিত। দুনিয়া কী দ্রুত পালটে যাচ্ছে! এবার সে আবার কৈলাসের দিকে ফিরে বলল, অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে না বাবা?

—কিন্তু অপরাধটাকে লঘু করেই বা দেখছেন কেন? দাসীবাঁদীর এমন আড়ি পাতা কি ভাল? যার খাই, যার পরি, তারই ঘরে আড়ি পাতি?

শঙ্করী বললে, অন্যায় সে করেছে, আমি স্বীকার করছি—কিন্তু তুমি তো বৌমার মত ছেলেমানুষ নও। তোমার বোঝা উচিত এ শুধু কৌতুক! কৌতুহল! বাসরঘরে আড়ি পাতাটা কি অপরাধ?

—বাসরঘর ? আমাদের বিয়ের তো বছর ঘুরে গেছে।

—তা গেছে। তবু তোমরা নবদম্পতি। আর মতি ছেলেমানুষ—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কৈলাস বললে, না ছোটমা, ওর হয়ে আপনি সুপারিশ করবেন না। ওকে চাকরিতে আমি আর রাখতে পারি না।

আশ্চর্য! কৈলাস যেন শ্রুতিধর! স্ত্রীর ভাষণটাই প্রথম-পুরুষের বদলে উত্তম পুরুষে শুনিয়ে দিল! এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শঙ্করী। তারপর বলল, চাকরি ওর যাবে না। ও আমার খাস-দাসী হবে আজ থেকে। তবে তোমাদের মহালে ওকে আসতে বারণ করে দেব।

কৈলাস উঠে দাঁড়ায়: তার মানে আমাদের অপমান করতে ওকে রাজবাড়িতে রাখবেন ?

শঙ্করী বলে, এ ভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কেন কৈলাস? তাকে আমি ধমকে দেব। তোমাদের ঘরে যেন না আসে সে হুকুম দেব। তাতেও তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না? কী হলে খুশী হও তোমরা? ওকে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে ?

—তাই দেওয়া উচিত। হাবিলদার-মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, 'আড়ি পাতার শাস্তি শূলে দেওয়া'; আমি তো শুধু ওর চাকরি খেয়েছি।

—হাবিলদার-মামা! ও বুঝেছি!

সেই তাঁর কথা প্রথম লক্ষ্য করল শঙ্করী। স্বামী-স্ত্রী সমস্যা মেটাতে কৈলাস হাবিলদার-মামার শরণাপন্ন হয়েছে! বংশবাটির এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ রাজা!

সেই সূত্রপাত। তারপর তিল-তিল করে নানান ক্ষেত্রে হাবিলদার-মামার উপস্থিতিটা স্বীকার করতে হল। একদিন দেখল বাগানের পূবদিকের অমন সুন্দর কাঞ্চন গাছটা কাটানো হচ্ছে। প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছিল গাছটা। বসন্তকালে বেগনী রঙের থোকা-থোকা ফুলে ভরে যেত, আর বাঁদর-ছড়ির মত লাঠি ঝুলত হাওয়ায়। আহা! অমন গাছটা কাটা হচ্ছে কেন! শঙ্করী হুকুম দিল, দেখ্‌তো, দেখ্‌তো মোতির মা, গাছ কাটছে কারা! বারণ কর্। বল্, আমি বলেছি।

মোতির মা ফিরে এসে বললে, হাবিলদার-মামা হুকুম দেছে। কাঠুরে বললে তিন-পো কাটা হয়ে গেছে—এখন না কাটলেও গাছ বাঁচবেনি।

কাঞ্চন গাছটাকে বাঁচানো গেল না।

তারপর গেল গোবর্ধন। পরের সপ্তাহে ভৈরব ঘোষ। কর্তার বিশ্বস্ত

লাঠিয়াল। কেউ বিশ বছর চাকরি করেছে, কেউ পঁচিশ। শঙ্করীকে প্রণাম করে গেল যাবার আগে। তাদের জবাব হয়ে গেছে। কী অপরাধ তা বোঝা গেল না, তবে হুকুমটা জারি করেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ হাবিলদার-মামা। শঙ্করী শুনল, দেখল—ওদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এল নতুন নতুন লোক। তারা সবাই নাকি লড়াই করেছে। জঙ্গী আইনে অভ্যস্ত। নিয়ম-শৃঙ্খলায় রপ্ত। বা'র-মহলের ব্যাপার—শঙ্করীর কথা বলবার অধিকারই নেই। শেষ পর্যন্ত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সে ডেকে পাঠালো দেওয়ানজীকে। দিলীপ এসে বললে, আপনি না ডাকলেও আসতে হত আমাকে। কদিন ধরেই আসব আসব ভাবছিলাম। এবার আমাকে ছুটি দিন ছোটমা। আমি আর পারছি না।

শঙ্করী অবাক হল না। এমনই কিছু সে আশঙ্কা করছিল। বললে, কিন্তু ছুটি তো আমি দিতে পারব না দিলীপ। আমি মেয়েমানুষ হয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আর তুমি পুরুষমানুষ হয়ে ছুটি চাইছ?

—কী করব বলুন? হাবিলদার-মামার অত্যাচারে—

—কে হাবিলদার-মামা! তুমি এ রাজ্যের দেওয়ান—

বাধা দিয়ে দিলীপ বলে, আজ্ঞে না। আইনতঃ নই, আপনাদের স্নেহের বন্ধন ছাড়া আমারই বা জোর কিসের? আপনাদের স্নেহে আমি আছি, কৈলাস-বাবুর আদরে হাবিলদার-মামা আছেন। আমরা দুজনেই তো এক সমতলে!

—কিন্তু তার জন্যে তুমিই তো দায়ী দিলীপ। এমনটি ঘটতে পারে আশঙ্কা করে প্রথম দিনই তো আমি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। রাজামশাইও রাজী ছিলেন। তুমিই রাজী হওনি। এখন ছুটি চাইছ কোন্ লজ্জায়?

এমনিভাবে তিল-তিল করে বদলে গেছে বংশবাটির রাজবাড়ির ভিতর-বাহির—বাইরের লোক তা টের পায় না; ভিতরের লোক তা টের পায় হাড়ে-হাড়ে। সংকীর্ণ সীমিত ক্ষেত্রে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে একা-হাতে সপ্তরথীর বিরুদ্ধে লড়ে যায় শঙ্করী—একটিমাত্র লক্ষ্য তার: রাজামশায়ের জীবিতাবস্থায় ঐ মন্দিরটা শেষ করা। মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে ছোটরানী যে অতর্কিতে শুনে ফেলেছিলেন রাজামশায়ের আর্ত আকুতি: ও বড়মিঞা! তোমার লোকজনদের আর একটু হাত চালাতে বল। না হলে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা যে দেখে যেতে পারব না।

বড়মিঞা জবাবে বলত: কী করব রাজামশাই! বড় জবর দেউল ফেঁদেছেন যে! সময় কিছুটা তো লাগবেই তবে ব্যস্ত হবেন না; খোদাতালার দয়ায় দেউল শেষ হওয়া তক্ তিনি আপনাকে জিন্দা রাখবেন।

না। তা রাখেননি খোদাতালা অথবা হংসেশ্বরী। অসমাপ্ত দেউলকে

পিছনে ফেলে একলা-চলার পথে একদিন রওনা হতে হল নৃসিংহদেবকে। কাজ তদারকি করতে গিয়েই একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন! হাহাকার করে উঠল মিস্ত্রী-মজুরের দল! ছুটে এল বংশবাটির ইতর-ভদ্র। রাজবৈদ্য কবিরাজমশাই নাড়ি দেখে বললেন, তারকব্রহ্ম নাম শোনাও! তে-রাত্তির পোয়াবে না!

পূর্ণজ্ঞান আছে কিন্তু।

দুঃসংবাদটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল কৈলাস। বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

আদ্যন্ত শুনে শঙ্করী বললে, মানুষজন চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ। বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। দক্ষিণাঙ্গ ঠিকই আছে। কথাও বলতে পারছেন। আপনাকে ডেকেছেন।

—আমাকে? শুধু আমাকে? বড়দিকে নয়?

—বড়মা কেমন করে যাবেন? বাবামশাই বললেন, তোমার ছোটমাকে ডেকে নিয়ে এস।

—দিলীপ কোথায়?

—তাঁকে বসিয়েই তো ডাকতে এলাম।

—ঠিক আছে। পালকি পাঠিয়ে দাও। দুখানা। বড়দিও যাবে। বুঝুক না-বুঝুক, চিনুক না-চিনুক এ সময় তাঁকে ফেলে একা আমি যেতে পারব না।

কৈলাস ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজার পাল্লাটা ধরে মনকে শান্ত করল শঙ্করী। না, ভেঙে পড়লে চলবে না। মাথা ঘুরে উঠলে চলবে না। স্থির করল নিজের দেহমন। মনের জোরে। তারপর ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করল বড়দির ঘরে। মোতির মা হাওয়া করছিল। অবাক হয়ে বললে, ও কি! কী হয়েছে ছোট-রানীমা!

শঙ্করী জবাব দিল না। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তার বড়দিকে। ওঁর হাড়-পাঁজরা বার করা বুকে মুখটা ঘষতে ঘষতে বললে, কী ভাগ্যবতী তুমি। এতবড় শোকটা পেতে হল না তোমাকে! ও বড়দি! তোমার রাজা-মশাই যে বিদায় নিচ্ছেন দুনিয়া থেকে! তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

আস্তে আস্তে মহামায়ার হাতখানা এসে পড়ল শঙ্করীর মাথায়। শঙ্করী স্পষ্ট শুনল দৈববাণী—তার বড়দির কণ্ঠস্বরে: কাঁদিস না ছুটকি! এখন কাঁদতে নেই! ওঁর যাত্রাপথ কেঁদে পিছল করে দিস্‌নি!

ধীরে-ধীরে মুখটা তুলল শঙ্করী। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল তার বড়দির দিকে। বললে, কথাগুলো তুমিই বললে? বড়দি! বড়দি!

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ফেললেন মহামায়া! কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ রে

ছুটকি! একবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারিস?

—তুমি? তুমি কথা কইছ! বুঝতে পারছ আমার কথা?

—পাগল আমি কোন দিনই হইনি রে। আমি সবই দেখছি বুঝছি! আজ তিন বছর!

বড়দিকে ফাঁকি দিতে দিতে শঙ্করী বলে, কিন্তু কেন? কেন? কেন? এত ডেকেছি তবু পাষাণের মত সাড়া দাওনি কঁন?

—কোন্ লজ্জায় দেব? কী বলব?

—আজ যা বলছ! তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ যে এক!

—না! আমি সন্তান পাইনি, কিন্তু স্বামী পেয়েছি। তুই আমার চেয়েও হতভাগী। অনেক অনেক বেশী। তাই তো লজ্জায় দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছি আজ তিন বছর!

জোড়া পাল্কি এসে থামল অসমাপ্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে। নৃসিংহদেব শুয়ে আছেন কম্বলশয্যায়—আধশোয়া হয়ে, তাঁর পিঠের দিকে কয়েকটি তাকিয়া ঠেস দেওয়া। ধরাধরি করে সকলে বড়রানীমাকে নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। শুইয়ে দিল তাঁকে। দিলীপ কৈলাস প্রভৃতি। তারা এখনও জানে না বড়রানীমা সুস্থ-মস্তিষ্কা। শঙ্করী আধো-ঘোমটা টেনে দিলীপকে বললে, সবাইকে সরে যেতে বল। ঘরে এখন কেউ থাকবে না। না, তুমিও নয়, কৈলাসও নয়।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বললে, হ্যাঁ, এখন ভীড় হটাও!

শঙ্করী চোখ তুলে চাইতে পারল না, কিন্তু নত নয়নে অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকেই দেখতে পেল বক্তার পায়ে একজোড়া জঙ্গী বুট। শঙ্করী এগিয়ে এল দ্বারের কাছে। চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে দেখল—ঘরে পাশাপাশি শুয়ে আছেন রাজা-মশাই আর তাঁর বড়রানী, আর রাজা-মশায়ের পায়ের কাছে বসে আছে কাশীশ্বরী। এবার সে কৈলাসকে বললে, বৌমাকেও নিয়ে যাও।

কাশীশ্বরী অবাধ্য হল না। উঠে এল। পালকি চড়ে ফিরে গেল। রইলেন ওঁরা তিনজন। দুজনে ঘরের ভিতর; শঙ্করী চৌকাঠের বাইরে। এ তিন বছরে সে রাজা-মশায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করতে আসেনি।

—বড়বৌ!

আশ্চর্য! বড়রানীমা নয়! বড়বৌ! সন্ন্যাসী নৃসিংহদেব ডাকছেন।

বড়রানীমা বললেন, তোমার চোখে জল কেন রাজা-মহাশয়? এমন

আনন্দের দিনে কাঁদছ কেন?

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রাজা-মহাশয়। বললেন, তুমি…তুমি আমার কথা শুনতে পারছ? বুঝতে পারছ?

চোখ দুটি একবার নিমীলিত করলেন বড়রানীমা! ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ!

ম্লান হাসলেন রাজা-মহাশয়। ডান হাত দিয়ে চোখটা মুছে বললেন, না! তাহলে আর কাঁদব না। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারছিলাম না বলেই চোখে জল আসছিল।

মহামায়া বললেন, আমার কাছে তো তুমি অপরাধ করনি কোনও! কিসের ক্ষমা?

রাজা-মহাশয় বললেন, তবে ওকে ডাক। আমার ডাকে তো আসবে না। হ্যাঁ, অপরাধটা ওর কাছেই করেছি। ক্ষমাও ওর কাছেই চাইতে হবে। কিন্তু সে তো অভিমান করে সরে থাকল, এ সময়েও এল না!

শঙ্করী চৌকাঠের পাল্লা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। না, কাঁদবে না সে; কিছুতেই কাঁদবে না। মহামায়া বললেন, ভুল বললে রাজা-মশাই। আমি তো ডাকব না ওকে। ঐ তো দোরের কাছে ও দাঁড়িয়ে আছে। তুমি ওকে ডাক।

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরালেন। এতক্ষণে দেখতে পেলেন ওকে। পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, ছোট-বৌ! ভেতরে এস! এখনও রাগ করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে? আমি যে বিদায় নিচ্ছি।

শঙ্করী ছুটে এগিয়ে এল।

কী করবে সে? জড়িয়ে ধরবে স্বামীকে?—যে স্বামী কোন দিন ওকে আলিঙ্গন-পাশে বাঁধেননি? লুটিয়ে দেবে মাথাটা ওঁর যুগ্মচরণে—যে স্বামী ওর প্রণাম নেননি কোন দিন! না, স্পর্শ করল না তাঁকে। বরং জড়িয়ে ধরল বড়দিকে। ডুকরে কেঁদে উঠল।

রাজা-মশাই বললেন, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা-পরিসীমা নেই ছোটবৌ। তবু এই শেষ সময়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

অবশ বাঁ হাতটা উঠল না। একটা হাতে যুক্তকর হবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

মুখ তুলল শঙ্করী। বলল, অমন করে বলবেন না। আমার কোনও অভিমান নেই।

—আঃ! বাঁচালে তুমি! আমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

শঙ্করী উঠে বসে। ধীরে ধীরে দু'হাতে দুজনের কপালে হাত বুলোতে থাকে। দুই মৃত্যুপথযাত্রী। রাজা-মশাই আবার বললেন, আঃ! আজ বড তৃপ্তি পেলাম। বুকের মধ্যে পাষাণ জমেছিল। আমার সময় কম। তোমরা দুজনেই আছ। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। আমি তো চললাম। আমার অবর্তমানে মন্দিরটা যেন শেষ হয়। ছোটবৌ, সেদিন তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ নেবে সে দায়িত্ব? আমি সজ্ঞানে আছি, বুদ্ধিভ্রংশ আমার হয়নি। দক্ষিণ-হস্ত এখনও সবল। বল—সব কিছু তোমাকে লিখে দিয়ে যাব? নেবে? নেবে এ ভার?

শঙ্করী পাষাণ। বড়দি এবার ডাকলেন, ছুটকি! ওঁর কথার জবাব দে।

শঙ্করী বললে, তার আগে একটা কথা বলুন। কেন আপনি আমার প্রণাম নেননি এতকাল। কেন সেদিন…সঙ্কোচে থেমে পড়ে।

নৃসিংহদেব বলেন, ঠিক কথা। সে কৈফিয়তটা আমার দেওয়া বাকি। ভেবেছিলাম সে-কথা প্রকাশ করব না। আমি ভিন্ন তা আজ আর কেউ জানে না। কিন্তু—ঠিকই বলেছ তুমি—সে-কথা স্বীকার না করে গেলে আমার ব্যবহারের অনেক কার্যকারণ সম্পর্ক তুমি বুঝবে না। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে গেলাম ছোটবৌ—তোমাকেও আমি ভালবেসেছিলাম; ঠিক বড়বৌয়ের মতই। কিন্তু স্বয়ম্বরা মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন ঘটনাচক্রে জানতে পারি—বিস্তারিত তুমি দিলীপের কাছে শুনে নিও—যে, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা। যাকে তুমি পিতা বলে জানতে সে তোমার পালকপিতা মাত্র। সে তোমাকে শৈশবে অপহরণ করেছিল—না সে নয়, সে যে ডাকাতদলে ছিল সেই ডাকাতদলের হাত থেকেই সে তোমাকে নিয়ে পালায়। সে পূর্বজীবনে ডাকাতি করত; কিন্তু তোমাকে নিয়ে ডাকাতদলের কাছ থেকে পালিয়ে আসে। দলত্যাগীকে শাস্তি দিতেই সে রাত্রে ডাকাতেরা তোমাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল।

শঙ্করী বললে, আমি…আমি শূদ্রাণী নই? আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা?

—হ্যাঁ। ছোটবৌ, আর সে জন্যই কোনদিন তোমার গাত্র স্পর্শ করিনি। তোমার প্রণাম নিইনি। স্বজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্ম নষ্ট করেছি একথা জানাজানি হলে আমাকে জাতিচ্যুত করা হত। আমি সবংশে পতিত হয়ে যেতাম।

শঙ্করী কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। জবাব দিলেন মহামায়া। বললেন, ছি ছি ছি! রাজা-মশাই, তুমি এতবড় পণ্ডিত হয়ে এমন সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারনি। আমাকে বলনি কেন? ও বামুনের মেয়ে তাতে কি হল? অগ্নিসাক্ষী করে যেদিন তোমায় বিয়ে করল সেদিন থেকেই ও যে শূদ্রাণী—শূদ্রের

বউ। ছুট্‌কি, পেন্নাম কর্‌ ওঁকে। আমি বলছি। আমার হুকুম! কর্‌।

রাজা-মহাশয় বললেন, ঠিকই বলেছ তুমি। আমার সংস্কারটাই বড় হল? ছি ছি ছি! কী ভ্রান্তি!

শঙ্করী লুটিয়ে পড়ল রাজা-মহাশয়ের চরণে। ঘষতে থাকে তার মুখটা।

রাজা-মশাই বাধা দিলেন না। অনেকক্ষণ পর বললেন, ছোটবৌ, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে। আমার দানপত্র গ্রহণ করবে তুমি? তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা তো আমি দিয়েছি।

অশ্রুআর্দ্র মুখখানা তুলে শঙ্করী বললে, হ্যাঁ, এতদিনে তুমি স্ত্রীর মর্যাদা আমাকে দিয়েছ, কিন্তু আমার প্রেমের মর্যাদা তো দাওনি!

—প্রেমের মর্যাদা! তা আমি কেমন করে দেব ছোটবৌ? সে-হাটে আমি যে আজ দেউলে।

—না। আমি যা চাইব, বল তা দেবে?

রাজা-মহাশয় বললেন, দেব শঙ্করী। জীবনভর তোমাকে শুধু বঞ্চনাই করেছি। আজ যা চাইবে তাই দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়। বল, কী চাও তুমি এই ফকির-রাজার কাছে।

—তুমি সত্যবদ্ধ কিন্তু!

—হ্যাঁ। আজ আনন্দের দিনে তোমাকে কিছুই অদেয় নেই।

—তবে অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব।

রাজা-মশাই বজ্রাহত।

আর্তনাদ করে উঠলেন মহামায়া: ছুট্‌কি !!

ষোলো

নবদ্বীপে গঙ্গাতীরের পর্ণকুটীরেও সে সংবাদ এসে পৌছলো। সবকিছু ভুল হয়ে গেল শঙ্করদেবের। তাঁর সাধনার কথা, তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। চমকে উঠলেন তিনি: ঠিক শুনেছ তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঁশবেড়ের রাজা-মহাশয়ের দেহান্ত হয়েছে। দুই রানীমা সহমরণে যাচ্ছেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব: জীবনকৃষ্ণ! তুমি এক্ষণি নৌকোর ব্যবস্থা কর, আমি যাব!

শিষ্য জীবনকৃষ্ণ চমকিত হয়ে ওঠে : কী বলছেন ঠাকুরমশাই ? আগামীকাল না আপনার বিচারসভা ? আপনি গিয়ে কী করবেন ?

—সে-সব পরে হবে জীবন, তুমি নৌকোর ব্যবস্থা কর। আমাকে এখনই যেতে হবে বাঁশবেড়িয়ায়। যেমন করেই হোক, এ সর্বনাশকে ঠেকাতে হবে।

জীবনকৃষ্ণ তার শিক্ষাগুরুকে চেনে। এখন কিছুতেই ওঁকে রোধ করা যাবে না। উনি যাবেনই। আজ বৎসর দুয়েক উনি এসেছেন নবদ্বীপ ধামে, একবারও বাঁশবেড়ে যাবার নাম করেননি। রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেবের অনুগ্রহভাজন ছিলেন তিনি, জীবনকৃষ্ণ জানে সে-কথা। এখন তাঁর মৃত্যুসংবাদে স্বদেশে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছাটা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু আগামীকালই যে বিচারসভার আয়োজন হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি শঙ্করদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করে যান তাহলে শত্রু হাসবে না ?

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জীবনকৃষ্ণকে নৌকোর বন্দোবস্ত করতে গোঁসাইপাড়া ঘাটে ছুটতে হল।

শঙ্করদেব আজ প্রায় দু বছর আছেন নবদ্বীপ ধামে। একটি টোল খুলে বসেছেন। বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাই ছিল না তাঁর। ফিরতে হয়েছে তাঁর সেই বয়স্যের নির্দেশে। রাজা রামমোহনের ইচ্ছানুসারে।

রাজা রামমোহনের সঙ্গে তিনি প্রায় বছর দুই ছিলেন কাশীধামে। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজা রামের মাথায় তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রচেষ্টাই প্রখর। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, নানা তত্ত্ব নোট করেন,—হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে মহানির্বাণতন্ত্রে পাঠ নেন। হরিহরানন্দ ছিলেন বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, মহানির্বাণতন্ত্রমতে ব্রহ্মোপাসনা করতেন। রামমোহনের চেয়ে বছর দশেকের বড। বছর দুই কাশীবাসের পর রামমোহন একদিন বললেন, এবার তো আমি দেশে ফিরব, কাব্যতীর্থ, তুমি কি করবে ?

—দেশে ফিরবেন ? কেন ? এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেল ?

রামমোহন বলেছিলেন, কাজ তো শুরুই হয়নি বয়স্য, শেষ হবে কি ? তা নয়, সাংসারিক প্রয়োজন। আমি তো তোমার মত বাউণ্ডুলে নই। পিতৃদেব বর্ধমানের মোকামে অসুস্থ, মরণাপন্ন। তাছাড়া আমার এক স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। কলকাতাতেই ফিরে যাব। তাই জানতে চাইছি, তুমি এখন কি করবে ? কাশীতেই থেকে যাবে, না ফিরবে ?

শঙ্করদেব প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি পরামর্শ দেন ?

হেসে ওঠেন রাজারাম : কী জ্বালা ! তোমার জীবনের লক্ষ্য কী তাই তো

আমি জানি না, পরামর্শ আবার কি দেব? তোমার সম্বন্ধে শুধু এটুকুই জেনেছি যে, তুমি হৃদয়বান যদিচ পাষণ্ড, পণ্ডিত যদিচ মূর্খ। এক্ষেত্রে আমি কী বলব?

শঙ্করদেবও হেসে ফেলেছিলেন। বলেন, আমার সম্বন্ধে ঐটুকু তথ্যই শুধু জেনেছেন?

—না। আরও কিছুটা জানি। তুমি একটি কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েছ। এখন নিউটনের ফার্স্ট-ল অনুসারে তুমি ক্রমশঃ ছুটতেই থাকবে, আনলেস্ ইম্প্রেস্‌ড্ বাই অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স···

ঐখানেই মুশকিল। ওঁর অর্ধেক কথার অর্থই বোঝা যায় না। শঙ্করদেব বলেন, আমাকে আপনার কোন কাজের দায়িত্ব দিন না।

—খুব ভাল প্রস্তাব। আমার অনেক, অনেক, অনেক কাজ আছে। বল কোন্‌টা তোমার পছন্দ?

শঙ্করদেব বলেন, তাহলে এবার আমাকেই প্রশ্ন করতে হয়, আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?

রামমোহন তৎক্ষণাৎ বলেন, হলকর্ষণ।

—হলকর্ষণ? মানে, চাষবাস?

—না বন্ধু। কৃষিকর্মের একটি মাত্র পর্যায়। বীজ বপন, সেচ, ফসল-কাটা, নবান্ন ওসব আমার কাজ নয়। আমি ডিভিশন অব লেবারে বিশ্বাসী। আমি শুধু হলকর্ষণ করতে চাই।

স্বীকার করলেন শঙ্করদেব: বুঝলাম না।

রামমোহন গম্ভীর হলেন। বলেন, বেশ, বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। দেখ, বুঝতে পার কিনা। আমি শ্রমবিন্যাসে বিশ্বাসী। একজন হলকর্ষণ করবে—নির্মমহস্তে জমিকে কর্ষণ করবে; দ্বিতীয়জন এসে বীজ বপন করবে; তৃতীয়জন তার পরিচর্যা করবে এবং চতুর্থজন সেই উৎপন্ন ফসলে নবান্ন করবে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ-সবই তো আলঙ্কারিক অর্থে। মূল বক্তব্যটা কি?

—ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করে দেখ। কৃষ্ণ ছিলেন নির্মম—

বাধা দিয়ে রাধামাধবের উপাসক বলেন, প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নির্মম?

—আমি বেন্দাবনের শ্রীরাধার নাগর কেষ্টোঠাকুরের কথা বলছি না, বেদব্যাসের কল্পনায় চক্রপাণি পার্থসারথীর কথা বলছি। তিনি নিষ্ঠুর, নির্মম—রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে! সমস্ত পাপ, সমস্ত মালিন্য ধুইয়ে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়রক্তস্রোতে। সেই কর্ষিত উর্বর ভূখণ্ডে করুণার বীজবপন করতে

এলেন শাক্যসিংহ, হাজার বছর পরে। শুধু বীজই বপন করলেন, সেচের কাজ, পরিচর্যার কাজ করলেন পরবর্তী যুগের মানুষ—অশোক, হর্ষবর্ধন, গুপ্তরাজারা। আর তার ফসল তুলে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করল আর এক জাতের মানুষ কাবুল-কান্দাহার থেকে যবদ্বীপ-ওঙ্কারধাম, সিংহল থেকে চীন-জাপান। হাজার বছর ধরে।

এমন তন্ময় হয়ে বলছিলেন যে, শঙ্করদেব পুনরুক্তি করতে পারলেন না: বুঝলাম না। রামমোহন বলেই চলেন, ইতিহাসের রথচক্র কিন্তু থেমে যায়নি। আবার পুঞ্জীভূত হল ক্লেদ, গ্লানি, ব্যভিচার—ধর্মের নামে, সমাজনীতির নামে—এল বামাচার, চীনাচার, বজ্রযান। অমনি আবির্ভূত হলেন আবার এক নতুন যুগের বলরাম—হলকর্ষণ করতে। নির্মম, নিষ্ঠুর! এবারও করুণা নয়, ভক্তিযোগ নয়, ক্ষুরধার জ্ঞানযোগের হলের ফলায় কর্ষণ করলেন ভারত ভূখণ্ড। আমি বলছি, অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শঙ্করের কথা। জ্ঞানমার্গের পথে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তিনি নূতন করে তৈরী করলেন জমি। বীজ বপন করলেন না কিন্তু। করুণা, ভক্তি, প্রেম, দাস্য, সখ্য, কোনও রকম কোমল হৃদয়বৃত্তির বীজই নয়। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর পরবর্তী যুগেই আসবেন বীজ বপনকারীরা—রামানুজ, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য। আবার পাঁচ-সাতশো বছর ধরে নবান্ন উৎসব ছিল অব্যাহত। তারপর আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ। কোম্পানি আবার বিশ বছর ধরে ভারতবর্ষকে শোষণ করবার অধিকার পেয়েছে, নীলকর সাহেবরা দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছে—এ নিয়ে দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। সমাজপতিরা কূপমণ্ডুক, অশিক্ষিত, ঘোর স্বার্থপর, স্ত্রীজাতির নির্যাতন উঠেছে চরমে—এদিকে বাবু-কালচর উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে। কী অপরিসীম অবক্ষয়! দেখতে পাচ্ছ না কাব্যতীর্থ? তোমার কি মনে হয় না, চক্রপাণির নূতন করে আবির্ভূত হবার মহালগ্ন ঘনিয়ে এসেছে?

শঙ্করদেব ভয়ে ভয়ে বললেন, কল্কি অবতার?

নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে ওঠে রাজা রামমোহনের। বলেন, না! কল্কি অবতার আছে কল্পনায়। আমি কল্পনাবিলাসী নই কাব্যতীর্থ। কল্কি নয়, আমি…আমি রাজা রামমোহন রায়! এ কোন আত্মশ্লাঘা নয়, কাব্যতীর্থ। আমি বলছি, তুমি দেখে নিও, আমি নিজেই নির্মম হাতে দেশমাতৃকার হৃদয়টা ফালা ফালা করে দিয়ে যাব। তার বেশি আর কিছু পারব না! আর কিছু করার আমার সময়ও নেই। আমি জানি, আমি দীর্ঘজীবী হব না। তাই বীজ বপনের কথা আমি চিন্তাও করি না। সেটা করবে উত্তরকাল। তারা আসছে, তারা আসবে।

শঙ্করদেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বক্তার দার্ঢ্যে, আত্মপ্রত্যয়ে। তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বললেন, কী করতে চান আপনি?

—ঐ যে বললাম—অনেক অনেক অনেক কিছু! বাংলাভাষায় ব্যাকরণ লিখব, বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য লিখব, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা করব, সতীদাহ বন্ধ করব, বহুবিবাহ রোধ করব, মিল-বেন্থাম-বেকন-রিকার্ডো-ভলতেয়ারের জ্ঞানজাহ্নবীকে এই মৃত্যু-আকীর্ণ সগররাজ্যে নিয়ে আসব ভগীরথের মতো।

আবার বয়স্যের কথাবার্তা ওঁর জ্ঞানরাজ্যসীমার বাইরে চলে যেতে চায়, তাই শঙ্করদেব বলেন, এ যুদ্ধে কে আপনার বন্ধু, কে শত্রু?

—সবাই বন্ধু, সবাই শত্রু। টুলোপণ্ডিতদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করব তখন কেরী-মার্সম্যান-হাইড-হেয়ার আমার বন্ধু; আবার যখন পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে লড়াই করব তখন ঐ বিদ্যালঙ্কার-তর্কালঙ্কার-মহামহোপাধ্যায়রা আমার বন্ধু। লড়াই কি একটা—যে শত্রুমিত্র বেছে নিতে পারি?

শঙ্করদেব বলেছিলেন, বেশ, আপনি বলুন এর মধ্যে কোন্ কাজে আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি অসাধারণ প্রতিভার মানুষ, কোন একটি মাত্র ক্ষেত্রেই আমি আপনার সেবা করতে পারি, আপনার বহুমুখী প্রয়াসে···

—বুঝেছি। তুমি তাহলে বরং সতীদাহ-নিবারণের কাজটার দায়িত্ব নাও। কিন্তু তাহলে তোমাকে আমার সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরতে হবে। কাশী ও-কাজের ক্ষেত্র নয়—

—কেন?

—প্রথমত কাশীধামে ভূমিকম্প হয় না। দ্বিতীয়ত লড়াইটা হবে কলকাতায়, রাজধানীতে। ফলে বিপক্ষের ঘাঁটি হবে নবদ্বীপ। তুমি আমার সঙ্গে চল। নবদ্বীপে টোল খুলে বস। নবদ্বীপ সমাজকে যদি স্বমতে আনতে পার তাহলেই আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে—

—আপনি কি কলকাতায় থাকবেন? জোড়াসাঁকোর মোকামে?

—বলতে পারছি না। সম্প্রতি সিভিলিয়ান জন ডিগ্‌বির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি সম্ভবতঃ কোম্পানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করব। তাহলে আমাকে যেতে হবে ঢাকায়—ঢাকার কালেক্টার টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান হিসাবে চাকুরিতে যোগ দেব।

প্রশ্নটা না করে পারেননি : আপনার তো অর্থের অভাব নেই, কোম্পানির অধীনে—

বাধা দিয়ে রামমোহন বলেছিলেন, সে তত্ত্বটা বোঝার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তোমার নেই। আগেই বলেছি, তুমি পণ্ডিত হলেও মূর্খ! বাউণ্ডুলে বামুন, অকৃতদার। অথচ আমার দুই স্ত্রী বর্তমান।

রামমোহনের সঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বঙ্গদেশে। নবদ্বীপে টোল খুলে বসেছেন। ছাত্র জুটেছে বেশ কয়েকটি। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তার মধ্যে প্রধান। এখানকার পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে সহমরণ প্রথা নিয়ে বহুবার আলোচনাও হয়েছে, খণ্ড-খণ্ড ভাবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল, একটি পণ্ডিতী মজলিসে এ নিয়ে শঙ্করদেব রামমোহনের বক্তব্য পেশ করবেন। আয়োজন সব সম্পূর্ণ। এমন সময়েই হঠাৎ সংবাদ এল ওঁর স্বগ্রামে ইন্দ্রপাত হয়ে গেছে। সেটা খবর নয়, আসল খবর—রাজা-মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর দুই স্ত্রীই সহমরণে যাচ্ছেন।

শঙ্করদেবের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। তাত্ত্বিক বিচার নয়, এখন সম্মুখ সংগ্রাম। যেমন করে হোক, রুখতে হবে এই সর্বনাশ। সহস্রাব্দির ঐ বিষপ্রথা—সহমরণের বিরুদ্ধে যে সতী প্রথম মাথা তুলে দাঁড়াবে সে কে? এতদিন মনশ্চক্ষে তার চিত্রই দেখতেন শঙ্করদেব। আজ যেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঐ কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ যোজনা করবে সেই মেয়েটিই—যার কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে—রামমোহনের মতে—শঙ্করদেব নাকি ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েন?

সতের

কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতো বার্তাটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রটে গেল। বংশবাটির রাজা-মশাই মৃত্যুশয্যায়—তাঁর দুই স্ত্রীই সংকল্প করেছেন সহমরণে যাবেন। বামে লক্ষ্মী—দক্ষিণে সরস্বতী। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে ফিরে যাচ্ছেন। কাতারে কাতারে মানুষজন আসতে থাকে বংশবাটিতে—গোযানে, নৌকোয়, পদব্রজে। গঙ্গার ঘাটে রীতিমত মেলা বসে গেছে।

রাজা-মহাশয় মারা গেলেন তার পরদিন সকালে।

বড়রানীমা শুয়ে আছেন তাঁর পাশেই। উত্থানশক্তিরহিতা। এতক্ষণে জ্ঞানহীনা। তাঁকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হবে পাশের চিতায়। শবদাহ

হবে সন্ধ্যায়—সূর্যাস্ত মুহূর্তে। পঞ্জিকা দেখে অগ্নিসংযোগ মুহূর্তটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন ভট্টশালী।

অন্দর-মহলে রানী শঙ্করীর কোন ইচ্ছাকেই একপক্ষ ভাল মনে মেনে নিতে পারত না—নবাগতের দল। আজ তাঁর এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু তারাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিল। হ্যাঁ, বংশবাটির রানীমায়ের উপযুক্ত কথা। কাশীশ্বরী তার কিঙ্করীদের নিয়ে সাজাতে বসল শাশুড়ীকে। মনের মতো করে সাজালো তারা—একদিন বড়দি যেমন সাজিয়েছিলেন তাকে। শুধু সিঁথি নয়, সমস্ত ব্রহ্মতালুটা রক্তিম হয়ে উঠেছে সিন্দুর-লেপনে। অঙ্গে উঠেছে পট্টবাস—রক্তচীনাংশুক। কঞ্চুলিকা নেই—একবস্ত্রা হয়ে চিতায় উঠতে হয়। শাড়ির আঁচলটাই আবদ্ধ করেছে তার 'স্তোকনম্রা' হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। অলক্তকরাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে শঙ্খধবল দুটি রাতুল-চরণ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সারিবদ্ধ এয়োস্ত্রী তাঁর পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করে যাচ্ছে। সেই আবীর সংগ্রহ করে রাখছে কৌটোয়। যে-সে সতী নয়, স্বয়ং রানী-মা। অনিন্দ্যসুন্দরী লক্ষ্মীঠাকরুণ।

মোতির মা আসেনি সাজাতে। কোথায় লুকিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে উঠে এল কোথা থেকে। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। শঙ্করীর কানে-কানে কী যেন বলল। চমকে উঠল শঙ্করী : ঠিক বলছিস? কোথায় তিনি?

—ডেকে আনব?

—ডাক্। এঁদের সরে যেতে বল্ আগে।

মোতির মা ভীড় হটালো। তারপর ডেকে নিয়ে এল তাঁকে। দশ বছরে খুব কিছু একটা পরিবর্তন হয়নি তাঁর। কৃশকায় হয়ে গেছেন একটু। তবু তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না। উঠে এল শঙ্করী। প্রণাম করল। একটি আসন বিছিয়ে দিয়ে বলল, কবে এলেন?

শঙ্করদেব বললেন, এইমাত্র এসেছি রানীমা। কাছেই ছিলাম। নবদ্বীপে। বছর কয়েক হল সেখানেই আছি। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি।

খুব ভাল করেছেন। আমার শেষ ইচ্ছাও পূরণ হল। অনুষ্ঠান কিছু করব না। শুধু বীজ মন্ত্রটা কানে দিয়ে যান, যা জপ করতে করতে দাহন জ্বালাকেও অস্বীকার করতে পারি—

কী ভাবে কথাটা পাড়বেন স্থির করে উঠতে পারেন না শঙ্করদেব। বড় দেরী হয়ে গেছে। রাজা রামমোহনের সংস্পর্শে এসে তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছেন—স্বামীর চিতায় উঠে আত্মদাহনে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গে যায় না। ওটা একটা নিষ্ঠুর লোকাচার। ওটা শাস্ত্রীয় বিধান নয়। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন রামমোহনের

বয়স্বরূপে—অনেক কিছু শিখেছেন, অনেক কিছু বুঝেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেছে। কিন্তু কেন এত দেরী করলেন এখানে এসে পৌঁছতে? রানীমা যে ঘোষণা করে বসে আছেন, সহমরণে যাবেন। দেশ-দেশান্তর থেকে লোক যে ভীড় করে দেখতে আসছে। এ লোকলজ্জাকে কি করে প্রতিহত করবেন?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শঙ্করী বুঝি আজ প্রগল্‌ভা হয়ে গেছে। সে যেন স্বপ্নাবেশে বলে চলে, দেখে এসেছেন মহাশয়? ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছে ওরা। আজ আর ওঁর কপালে ত্রিপুণ্ড্রক নেই—আবার উঠেছে শ্বেতচন্দনের মুক্তাবিন্দু—সেই সেদিন যেমন ছিল। গলায় আজ আর নেই রুদ্রাক্ষমালা—ওরা পরিয়ে দিয়েছে গোড়ে মালা, সেই সেদিনের মত। অগ্নিসাক্ষী করে সেদিন তিনি আমাকে বরণ করেছিলেন সেই অগ্নিসাক্ষী করেই—

—রানীমা!

সম্বিৎ ফিরে পায় শঙ্করী। বলে, বলুন!

—সহমরণে আপনার যাওয়া হবে না!

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় রানীমার। তবু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর বলে, কী বলছেন আপনি!

—এ ভুল! এ নিদারুণ ভুল! এ কোন শাস্ত্রীয় বিধান নয়। সহমরণপ্রথা একটা নিদারুণ প্রহসন। আমি জানি—আমি জেনেছি। এক মহাপণ্ডিত—রাজা রামমোহন রায়—আমাকে স্থিরসিদ্ধান্তে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

শঙ্করী বললে, আপনি উন্মাদ।

আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। বললেন, বিশ্বাস করুন রানী-মা। এ সত্য আমি প্রাণধান করেছি—এ ধ্রুব সত্য!

শঙ্করীও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবার আসুন আপনি।

শঙ্করদেব বললেন, রানী শঙ্করী! এ তোমার গুরুর আদেশ। সহমরণে যেতে পারবে না তুমি। তুমি গুরুত্বে বরণ করতে চেয়েছিলে আমাকে। আজ আমি তোমাকে দীক্ষাদানে স্বীকৃত। এ তোমার গুরুদক্ষিণা!

স্থির দৃষ্টিতে শঙ্করী দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর শোনা গেল তার অস্ফুট আর্তি: কেন এলেন আপনি? একটা সুখস্মৃতি পুড়িয়ে খাক্‌ করে দিতে? এবারে আপনি যান। বীজমন্ত্র দিতে হবে না আপনাকে। আমি আপনার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেব না। আমি আপনাকে গুরু বলে মানি না। যান এবার।

নতমস্তকে বেরিয়ে এলেন কাব্যতীর্থ।

রানীমা তার সঙ্কল্পে অটল। এই তার শেষ ইচ্ছা।

কিন্তু—

নিষ্ঠুর বিধাতা সারাজীবন তার কোন্ ইচ্ছাটা পূরণ করেছেন !

এবারও বাধ সাধলেন তিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে।

শেষ ইচ্ছা পূরণ হল না ছোটরানীমার।

হঠাৎ একটা অসতর্ক কথোপকথন কর্ণগোচর হল তাঁর। কাশীশ্বরীর সঙ্গে তার মাতুল হাবিলদার-মামার একটি জনান্তিক আলাপচারী। আপাদমস্তক শিউরে উঠল শঙ্করী দেবীর।

কথাটা আগেও কানে গিয়েছিল—কানাঘুষায় ; মোতির মায়ের, দিলীপের, মোতির কথায়—আভাসে-ইঙ্গিতে। বিশ্বাস হয়নি, বিশ্বাস হবার কথাও যে নয়। এখন স্বকর্ণে শুনে বুঝলেন—মিথ্যা গুজব এটা নয়। অপরিসীম মনোবেদনায় পাথর হয়ে গেলেন শঙ্করী। মনে হল এত বড় আঘাত তিনি জীবনে পাননি—না, স্বামী তাঁকে কাশী প্রেরণ করায় নয়, তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে নয়, কাব্যতীর্থের মন্ত্রদীক্ষায় অস্বীকৃতিতে নয়, এমনকি তাঁর বিচিত্র গুরু-দক্ষিণার প্রস্তাবেও নয়।

অদ্ভুত ওঁর মনোবল। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। মুহূর্ত-মধ্যে সিদ্ধান্তে এলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন মোতির মাকে, দিলীপকে ডেকে নিয়ে আয়। এখনি, এই মুহূর্তে। যদি তাকে খুঁজে না পাস, তবে কাব্যতীর্থকে। বলবি খুব জরুরী দরকার। ভীষণ জরুরী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল দিলীপ : ছোটমা' ডাকছিলেন ?

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে এস। কথা আছে। অত্যন্ত গোপন। অত্যন্ত জরুরী।

ওকে টেনে নিয়ে গেলেন শয়নকক্ষে। পুরললনার ভীড় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। সবাই সরে দাঁড়ালো, ঘোমটা টানল দেওয়ানজীকে আসতে দেখে। রুদ্ধদ্বারে পিঠ দিয়ে শঙ্করী বললেন, দিলীপ ! আমি সতী হব না। সহমরণে যাব না।

বজ্রাহত হয়ে গেল দিলীপ দত্ত। কী বলবে ভেবে পেল না।

—আমি নিজে কানে শুনেছি—ঐ হাবিলদার-মামা বৌমাকে বলছিল, 'তিন-চিতায় আগুন নিভলেই মিস্ত্রিদের বিদায় করে দেব, ছাখ্ না ! কাশিমবাজারের রাজা পাথর খুঁজছে। লাখ টাকা দামের পাথর দেড় লাখে ঝেড়ে দেব !' দিলীপ, আমি এখন মরতে পারব না বাবা।

—কিন্তু ছোটমা, কেমন করে আপনাকে বাঁচাবো ? দশ বিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে যে !

—লোকলজ্জাকে পরোয়া করলে চলবে না।

—লোকলজ্জা নয় ছোট-মা! আপনি যে নিজ-মুখে ঘোষণা করেছেন। ওরা যে জোর-জবরদস্তি করবে! শেষে একটা মারপিট দাঙ্গা বেধে যাবে!

—তোমার জমিদারিতে লেঠেল নেই?

—আছে। কিন্তু লেঠেলদের সর্দার হাবিলদার-মামার লোক। আমার হুকুম তারা মানবে কেন?

শঙ্করী এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, কোন বিশ্বস্ত ভাল ঘোড়সোয়ার তোমার জানা আছে?

—আমি নিজেই ভাল ঘোড়ায় চড়তে জানি। কেন?

—তবে এই মুহূর্তে তুমি রওনা হয়ে যাও। আমার এ সিদ্ধান্তের কথা কাউকে কিছু বল না। সোজা চলে যাও হুগলীতে। কালেক্টার সাহেবকে আমার বিপদের কথা বলবে। বলবে, আমাকে জোর করে ওরা সহমরণে পাঠাচ্ছে—আমার সম্মতি ব্যতিরেকে। তিনি যেন ফৌজ পাঠিয়ে দেন সন্ধ্যার আগেই।

অত্যন্ত দ্রুত হাতে মায়ের পদধূলি নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দিলীপ। শঙ্করী এসে বসলেন পদ্মাসনে। আবার সবাই প্রণাম করতে থাকে সার বেঁধে। যে-সে সতী নয়! স্বয়ং রানীমা। লক্ষ্মীঠাকরুণটি।

বিকেল গড়িয়ে গেল। দিলীপের কোন খবর নেই। হুগলী থেকে থানাদার এসে পৌছায়নি। মোতির মা ফিরে এসে বলেছে—কাব্যতীর্থমশাই সহমরণ দেখবার জন্য অপেক্ষা করেননি। যে নৌকোয় এসেছিলেন নবদ্বীপ থেকে সেই নৌকোতেই ফিরে গেছেন।

চতুর্দোলা নিয়ে হাবিলদার-মামা ফৌজী ভঙ্গীতে প্রবেশ করল অন্দর-মহলে। সেপাইরা এতদিন এমন তালে-তালে হাঁটত না। এখন নতুন কুচকাওয়াজ শিখেছে। লেফ্-রাট, লেফ্-রাট, লেফ্-রাট—হাল্ট! দাহিনা মোড়! স্যালুট!

পুরললনার দল বিস্ফারিত-নেত্রে দেখতে থাকে জঙ্গীশাসনের কার্যক্রম।

এগিয়ে এল ভীড় ঠেলে কৈলাসদেব: সময় হল। আসুন ছোটমা!

আর বিলম্ব করা যায় না। শঙ্করী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, পাল্‌কি ফিরিয়ে নিয়ে যাও কৈলাস। আমি যাব না।

—যাব না! যাব না মানে?

—আমি সহমরণে যাব না। আমি সতী হব না।

এর চেয়ে প্রাঙ্গণের মাঝখানে বজ্রপাত হলে প্রতিক্রিয়াটা কম হত। দশ বছরের পুত্রবধূ ছুটে এসে মুখ চেপে ধরল ওঁর: এমন কথা বলতে নেই মা!

শঙ্করী জোব কবে ওব হাতটা সবিয়ে দিয়ে বললেন, কৈলাস, তোমাব মামা শ্বশুবকে বল তাঁব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বাইবে যেতে। এটা অন্দব-মহল।

কৈলাস সে প্রসঙ্গ এড়িযে বললে, আপনি কি ভব পেযেছেন মা?

—ভযেই হোক আব সুবুদ্ধিতেই হোক, এ আমাব দৃঢ় সংকল্প।

—এমন হঠাৎ ঐ অদ্ভুত সংকল্পটা কবে বসলেন?

—সংকল্প এমন হঠাৎই কবতে হয় বাবা। দেখনি তোমাব বাবাব ক্ষেত্রে? মামলাব টাকায় মন্দিব গড়বাব সংকল্প করতে তাঁব সময় লাগেনি।

হাবিলদাব-মামা এগিযে এল কয়েক পা। বানীমাব সঙ্গে জীবনে সে বাক্যালাপ করেনি। যে আমলের কথা, সে যুগে এ জাতীয় সম্পর্কে বাক্যালাপ বেওয়াজেব বাইরে। তবু জঙ্গীমামা একপদ অগ্রসব হযে এসে বললে, বেযান-ঠাকরুন, আমবা তো আপনাকে এভাবে বাঁশবেড়েব সম্মান ধুলোয় লুটাতে দেব না।

জঙ্গীমামা উঠোনেব সমতলে, শঙ্কবী দাবান্দাব উপব। প্রাঙ্গণে তিন-চাব শো মহিলা—বাঁশবেড়েব এবং নিকটবর্তী গ্রামেব এযো-স্ত্রীই বেশি। এ-ছাড়া জনাপঁচিশ লাঠিযাল—যাদেব নিযে হাবিলদাব মামা বিনা এত্তেলায় প্রবেশ কবেছে অন্দব-মহলে। আব আটজন বেহাব এসেছে কিংখাবে মোড়া পাল্‌কিটা বাঁধে। এত লোকেব সামনে বৈবাহিকেব সঙ্গে কথা বলা চলে না। শঙ্কবী এগিযে এলেন দাওযাব প্রান্তে। এক বুক উচু, খাড়া পোতা। মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিযে কৈলাসেব দিকে ফিবে দাঁড়ালেন। পুত্রকে সম্বোধন কবে বললেন, কৈলাস, তোমাব মামাশ্বশুবকে বল—আমি বাঁশবেড়ে বাজ্যেব অন্নপুষ্ট কুটুম নই—আমি এ রাজ্যেব বানীমা। বাঁশবেড়েব সম্মান—

কথাটা তাব শেষ হল না। ভীড় ঠেলে ছিলে খোলা ধনুকেব মত এগিযে এল দশ বছবেব মেযে কাশীশ্ববী। নাকে নথ, মাথায় ঘোমটা, পাযে মল। শ্বশ্রূমাতাব নাকেব সামনে মণিবলয খচিত হাতখানা নেড়ে বললে, উনি তো ঠিকই বলছেন। আপনি আমাদেব মুখ হাসাচ্ছেন। সতী হতে যদি অত ভয় তবে দিনভব অত সিঁদুব মাখলেন কেন মাথায়? এক-গাঁ লোকেব পেন্নাম নিলেন কেন? ভড়ং কবলেন কেন?

জানকীব আহ্বানে মাতা ধবিত্রী দ্বিধা-বিভক্ত হযেছিলেন। শঙ্কবীব আহ্বানে হলেন না। এক উঠোন গ্রামবাসীব সম্মুখে ঐ বালিকাবধূ এ বাড়িব ছোটরানীমাযের এতদিনের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিল। কথা খুঁজে পেলেন না—মর্মাহতা অপমানিতা বাঁশবেড়েব ছোটবানীমা।

কৈলাসই বরং স্ত্রীকে ধমক দিযে ওঠে, তোমাকে নথ নাড়তে হবে না।

কাকে কী বলছ ?

কাশীশ্বরী ক্ষেপে গেল। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে, এক-প্রাঙ্গণ মানুষের উপস্থিতিতে যে স্বামী সম্ভাষণ করতে নেই সে কথা মনে রইল না ওর। দৃপ্তভঙ্গিতে বললে কাকে আবার কী বলছি ? ঢঙীকে ঢঙী বলেছি, তাতে হয়েছেটা কী ?

মল ঝমঝমিয়ে সে নাটকীয় প্রস্থান করে।

কৈলাস বলে, ওর কথা কানে নেবেন না, মা, আসুন আপনি। পাল্‌কি এসে গেছে, সবাই প্রতীক্ষা করছে। এখন সতী হব না বললে লোকে শুনবে কেন ?

—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে ? লোকে যদি জোর-জবরদস্তি করে তবে তোমার লেঠেলরা আছে কেন ?

কৈলাস তার মামার দিকে তাকায়। তিনি আরও একপদ অগ্রসর হয়েএসে বলেন, লেঠেলরাও যে সবাই হিঁদু, বেয়ান-ঠাকরুণ। মোছলমান নয়। তারাও জানে শাস্ত্রীয় বিধান না মানলে লাঠি কোনদিকে চালাতে হয়। আসুন, আসুন, দেরি করবেন না—

অম্লানবদনে লোকটা এগিয়ে আসে সিঁড়ির দিকে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয়—যেন পরমুহূর্তেই চেপে ধরবে বৈবাহিকার হাতখানা। হেঁচকা টানে টেনে নেবে বুকে। শঙ্করী এবার ভয় পেলেন। পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। পুরললনার দল সভয়ে সরে গেল। শঙ্করী চিৎকার করে উঠলেন, কৈলাস, তোমার উপস্থিতিতে ঐ লোকটা আমাকে—

কথাটা তাঁর শেষ হল না। সিঁড়ি বেয়ে হাবিলদার-মামা উঠে এল রোয়াকে। বললে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করবেন না বেয়ান-ঠাকরুণ। আসুন, আসুন।

এবার সে দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওকে ধরতে।

শঙ্করী ছুটে পিছিয়ে গেলেন বারান্দার ও-প্রান্তে। সেখানে ছিল একটা জলচৌকি। তার উপর উঠে দাড়ালেন। হাবিলদার-মামা নাটকীয় ভঙ্গিতে একবার জনতার উপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণের পূর্ব-মুহূর্তে দুঃশাসন বুঝে নিতে চাইছে কুরু-রাজসভার মনোভাব। না, কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। সহমরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর সদ্যোবিধবা যদি ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়, তখন তার উপর দৈহিক বলপ্রয়োগে সামাজিক অনুমোদন আছে। লোকাচার বলে—তখন তার গাত্রস্পর্শ করায় পাপ নেই। এ যে শাস্ত্রীয় বিধান। তাই পৈশাচিক উল্লাসে লোকটা হাসতে হাসতে বলতে পারল—ছেনালি করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার যে মধুর সম্পর্ক তাতে আপনাকে পাজাকোলা করেও আমি নিয়ে যেতে পারি বেয়ান-ঠাকরুণ—পাল্‌কির

প্রয়োজন নেই। নেব তুলে?

আশ্চর্য! যে রানীমা ছিলেন বাঁশবেড়ের অতিশয় শ্রদ্ধেয়া মহিষী—সর্বসমক্ষে তার গাত্রস্পর্শ করতে এগিয়ে আসছে লোকটা—অথচ কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই! জনতা রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছে। জনতা! কাব্যতীর্থ বলেছিলেন, মানুষ নাকি 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'; চণ্ডীদাসের ভাষায়, 'তাহার উপরে নাই।'

সহসা ভাবান্তর হল রানীমার। একবস্ত্রা নারী একটানে খুলে ফেললেন তাঁর অবগুণ্ঠন। চমকে উঠল হাবিলদার মামা। জলচৌকির উপর দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন—অনবগুণ্ঠিতা জগদ্ধাত্রী! একমাথা সিঁদুর! পট্টবস্ত্র পরিহিতা! যেন গাড়-দোলে উঠেছেন বিসর্জন-মুহূর্তে জগন্মাতা! বিসর্জন-মুহূর্তে জগদ্ধাত্রীও তো একবস্ত্রা! সঙ্কোচময় বর্তমান বছরে বছরে খুলে নেয় তার পরিধেয় বেনারসী, পরিয়ে দেয় সালুর ত্যানা। চিৎকার করে উঠলেন শঙ্করী, খবরদার!

থমকে গেল হাবিলদার মামা। সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। উচ্চগ্রামে শঙ্করী ঘোষণা করলেন: শুনুন বেয়াইমশাই! আমি দিলীপকে পাঠিয়েছি হুগলীর কালেক্টারের কাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য এসে যাবে। আমি আপনার নাম উল্লেখ করে তাঁর কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছি—আপনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইছেন। বলপ্রয়োগের চেষ্টা আপনি করতে পারেন। কিন্তু তারপর ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হবে আপনাকে। মনে থাকে যেন।

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাবিলদার-মামা। সে জানে, কোম্পানীর শাসনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে সতী করা যায় না। কে এক রামমোহন নাকি লড়াই শুরু করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে থানাদার জেনে যায়—সতীর সম্মতি আছে কি নেই। এখানে আসবার সময়েই অশ্বপৃষ্ঠে দিলীপ দেওয়ানকে সে বাদশাহী সড়ক ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে। তার মানে—রানীমার এটা ফাঁকা হুমকী নয়।

জলচৌকি থেকে নেমে এলেন একবস্ত্রা সামন্তিনী। লীলায়িত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ডান হাত, বৈবাহিকের দিকে। বললেন, আমাকে ধরতে আসছিলেন না? হিম্মৎ থাকে তবে আমার কব্জি ধরুন! এত লোক সাক্ষী রইল। স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার রেহাই পাননি, দেখি আমাদের হাবিলদার-মামা ফাঁসীর দড়িতে ঝোলেন কি না!

মাথা নিচু করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল হাবিলদার-মামা।

পাইক-বরকন্দাজদের দিকে ফিরে শঙ্করী বললেন, তোমাদের সর্দার কে?

একজন দশাসই জোয়ান এগিয়ে এসে সেলাম করল: হামি রানীমা। মহাদেও পরসাদ।

—মহাদেব! তুমি বংশবাটি রাজার নিমক খেয়েছ। আমি রানীমা। তোমাকে হুকুম করছি। চলে যাও এখান থেকে। এটা অন্দরমহল। তোমাদের রাজা-মহাশয়ের মহাশব তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছে। যাও, দাহকার্য সম্পন্ন হলে আমাকে এসে খবর দিয়ে যেও।

মস্ত সেলাম করে মহাদেও সর্দার বললে, যো হুকুম রানীমা।

এবার আর 'লেফ্-রাট' নয়, সার দিয়ে চলে গেল ওরা—হাবিলদার-মামার হুকুমের অপেক্ষা না করেই।

আঠার

বংশবাটির রাজপরিবারের ইতিহাসে দেখছি এরপর এক বিশ্রী মামলায় বিষিয়ে উঠল রাজবাড়ি। দীর্ঘ চব্বিশ বছর—১৮০২ থেকে ১৮২৬। বৃদ্ধা বিধবার শুরু হল নূতন জীবনসংগ্রাম। যে মামলাকে আকৈশোর এড়াতে চেয়েছিলেন মহামায়া, বারে বারে স্বামীকে বুঝিয়েছিলেন—মামলা করতে নেই, যা আছে তাতেই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, যে মামলাকে এড়াতে রাজা-মহাশয় রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঐ টাকায় মন্দির তৈরী হবে, সেই মামলাতেই জড়িয়ে পড়লেন শেষবেশ। শুভানুধ্যায়ীরা এবার ওঁকেই বোঝাতে এল: মামলা করতে নেই। ছি ছি ছি! সম্পত্তি নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাটা-ব্যাটাবৌয়ের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা!

রানী শঙ্করী বললেন, উপায় নেই।

প্রতিবেশিনীরা আড়ালে বললে, তবে তো ঠিকই শুনেছিলাম। মৃত্যুশয্যায় বুড়োকে দিয়ে সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল।

স্বর্গত নৃসিংহদেবের ওয়ারিশদের মধ্যে সে মামলা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে চলেছিল। এক পক্ষে উপযুক্ত পুত্র কৈলাসদেব—যাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন রাজা-মহাশয়; অপর পক্ষে ছোটরাণী, যিনি ঐ সম্পত্তির লোভে সহমরণের চিতা থেকে উঠে এসেছিলেন। সকলের সহানুভূতি কৈলাসদেবের পক্ষেই গেল। হাবিলদার-মামা পরগনা পরগনা ঘুরে প্রচারকার্য চালাতে থাকে —প্রজারা যাতে রানীমার দফতরে খাজনা জমা না দেয়। শহর কলকাতা

থেকে এক জাঁদরেল উকিলবাবুকে নিয়ে এল হুগলী আদালতে মামলা পরিচালনা করতে। রানী শঙ্করী দিলীপ দত্তের পরামর্শে নিয়োগ করলেন সাবেক আমলের মোক্তারবাবুকে—বৃদ্ধ হরেরাম চৌধুরীকে। তিল তিল করে ডুবতে থাকেন রানী শঙ্করী। অনেকেই বলল—তাঁর পরাজয় অনিবার্য।

এদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও হয়ে পড়ল দুর্বিষহ। প্রাসাদের মধ্যে বস্তুতঃ তিনি বন্দিনী—একঘরে। কোম্পানীর সিপাহিদের সাহায্যে প্রাণে বাচা যায়, মানে বাঁচা যায় না। কালেক্টার-সাহেব তাঁর প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একঘরে হয়ে থাকা সে ঠেকাবে কি করে? অশাস্ত্রীয় কাজ করায় শঙ্করী জাতিচ্যুতা। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে না, বিজয়ার প্রণাম করতে আসে না। কারও বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ হয় না। তাঁর নিমন্ত্রণেও কেউ আসবে না নিশ্চয়। তা ছাড় রাজবাড়ি প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। ওদিকে শহর কলকাতা জমজমাট হয়ে উঠেছে। রাজা-জমিদার বেনিয়ান বাবুদের বাড়িতে নিত্য উৎসব। কবিগান-ঢপ যাত্রা গান-বাইজীর নাচ। বিত্তস্ফীত ইজারাদার কাপ্তেনবাবুদের এইসব আমোদ কৌতুকে দোষ ধরত না কেউ। নিকী-বাইজী তখন কলকাতার সেরা রূপোপজীবিনী। মাসিক হাজার টাকা মাহিনায় তাকে রক্ষিতারূপে রেখেছিলেন কলকাতার এক গণ্যমান্য পদস্থ সমাজনেতা—নামটা আর নাই করলাম। এমন কি স্বয়ং রামমোহনের দালানেও সে একাধিক রজনী নেচে গেছে। নেচেছে দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও। হরুঠাকুর, নীলুঠাকুর, নীলমণি ইত্যাদি কবিওয়ালা আর গোলকমণি, দয়ামণি, রত্নমণি প্রভৃতি 'লেডী-কবির দল' তখনও আসর মাতিয়ে রেখেছেন। সেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতে আশপাশের অনেক জমিদার কলকাতায় বাসা-বাড়ি অথবা বসতবাড়ির বন্দোবস্ত করতে থাকেন। জমিদারীতে এসে আদায়পত্র করে যাওয়া ছাড়া বারো মাসই তার কলকাতাবাসী। সেই গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসালেন কৈলাসদেব। কালিঘাট অঞ্চলে একটি গলির ভিতর নূতন বাড়ি কিনে সস্ত্রীক উঠে গেলেন কলকাতায়। ভবিষ্যতে সেই গলিটির ই নাম হয়েছিল—'রানী শঙ্করী লেন'। আজও তার ঐ নাম।

নির্বান্ধব পুরীতে মোতির-মা-সম্বল রানী শঙ্করী এতদিন পরে আবার পেড়ে নামালেন তাঁর পুঁথিপত্র। আবার মন দিলেন লেখাপড়ায়। এখন বাংলা বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছাপা। দিলীপকে দিয়ে অনেকগুলি বই আনিয়ে নিলেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র,' কেরী সাহেবের 'ইতিহাসমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ-সিংহাসন', চণ্ডী মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস'। কিছু মাসিক-সাপ্তাহিকও বার হয়েছে। তারও গ্রাহক

হলেন—দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, বাঙ্গালগেজেটে। দিবারাত্র সেগুলিই নাড়াচাড়া করেন। ওঁর প্রায়ই মনে পড়ত কাব্যতীর্থের কথা—আহা, এ সময়ে তিনি যদি থাকতেন! রানীমা নবদ্বীপে লোক পাঠিয়েছিলেন। শঙ্করদেবের সন্ধান পাননি। তিনি নাকি নৃসিংহদেবের মৃত্যুর ঠিক পরেই উত্তরখণ্ড পরিক্রমায় গেছেন। কোথায় আছেন কেউ জানে না—হরিদ্বার, হৃষিকেষ, উত্তরকাশী, কিংবা কে জানে তিনিও তিব্বতে চলে গেলেন কিনা। শঙ্করীর দৃঢ় বিশ্বাস—কাব্যতীর্থ জানেন না, শেষমুহূর্তে রানীমা তাঁর আদেশটাই মেনে নিয়েছিলেন। যদিচ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। গুরুদক্ষিণা তিনি দিলেন—বীজমন্ত্র পেলেন না। সবই তাঁর কপাল!

মন্দিরের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়নি। মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ নৃসিংহদেব পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বেই। সে অর্থ ব্যয় করার অধিকারী—একমাত্র রানী শঙ্করীদেবী। আর কেউ নয়। তাই বড়মিঞার কাজ বন্ধ হয়নি। বৃদ্ধ রানীমা এতদিনে আর চিকের বাধা মানেননি। মহামায়া যেমন করে মর্মান্তিক প্রয়োজনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপ দেওয়ানের সামনে, তিনিও একদিন তেমন মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ বড়মিঞার সম্মুখে। বললেন, কর্তাকে তোমরা ফাঁকি দিয়েছ, আমাকেও যেন ফাঁকি দিও না বাবা। হপ্তায় হপ্তায় এসে টাকা নিয়ে যাবে। আমার জীবদ্দশায় যেন মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

উত্তরখণ্ডের বৃদ্ধ মিস্ত্রি খোদাতালার নামে কসম খেয়ে বলেছিল, আপনি আমার মা। নিশ্চিন্ত থাকুন রানীমা—আমরা তঞ্চকতা করব না। দিবারাত্র পরিশ্রম করব। আর দুটি বছরের মধ্যেই শেষ হবে দেউল।

তাই হয়েছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হল সেই অপূর্ব দেব-দেউল। চতুর্দশ শিবের প্রস্তরমূর্তি-বেষ্টিত মন্দির। তার গর্ভগৃহে নিমকাঠের দারুময় মাতৃমূর্তি—অবিকল যে মূর্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন নৃসিংহদেব। দ্বারদেশে উৎকীর্ণ করা হল।

> "শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
> মোক্ষদ্বার-চতুর্দশেশ্বর-সমং হংসেশ্বরী-রাজিতং॥
> ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিমারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
> তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে॥ শকাব্দা ১৭৩৬

চতুর্দশ মোক্ষদ্বাররূপী মহাদেবের সহিত হংসেশ্বরী কর্তৃক বিরাজিত এই শ্রীমন্দির, যেটি কৃতি নৃসিংহদেব ভূপাল কর্তৃক আরব্ধ হয়েছিল, সেটি এই ১৭৩৬ শকাব্দে তাঁর আজ্ঞানুগা পত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী সমাপ্ত করলেন।

১৭৩৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ। কালটা চিহ্নিত করতে বলতে পারি—ইউরোপ-খণ্ডে ওয়াটারলু যুদ্ধপূর্ব-বৎসরের ঘটনা, কলকাতায় এবছরই টেকচাঁদ-ঠাকুর জন্মগ্রহণ করলেন। রাজা রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

সে মন্দির আজও অটুট। যুগে যুগে যাত্রীদল এসেছে বংশবাটীতে ঐ শ্রী মন্দির দেখতে। স্তব্ধ বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করেছে মন্দির-স্থাপত্য, শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে প্রণাম করে গেছে মাতা হংসেশ্বরীকে। তারা কিন্তু জেনে যায়নি এ মন্দিরের প্রতিটি প্রস্তর কী করুণ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। তারা রানী শঙ্করীকে চেনে না। তাতে তাঁর দুঃখ নেই। কর্মেই শুধু ছিল তাঁর অধিকার—তিনি নিজেকে বলেছেন স্বামীর 'আজ্ঞানুগা', যে স্বামী সারাজীবন তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। তিনি নিজেকে বলেছেন 'গুরুপাদপদ্মনিরতা', যে গুরু সারাজীবনে তাঁর কানে বীজমন্ত্র দেননি। সাধারণ যাত্রী মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করেই ধন্য হয়, সাধারণ ট্যুরিস্ট মুগ্ধ হয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যে; একটু বিদগ্ধ যাঁরা, তাঁরা বলেন—এ মন্দিরের নির্মাতা নৃসিংহদেব। রানী শঙ্করীর নাম কেউ করে না। এমন কি প্রগাঢ় পণ্ডিত ইংরাজ-কবি চ্যাপমান এ মন্দির দর্শনে যে দীর্ঘ গীতি-কবিতাটি রচনা করেছিলেন তাতেও শঙ্করী 'কাব্যে-উপেক্ষিতা'।

এমনিই হয়! শুধু ঊর্মিলা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়াই নন—সব যুগাবতারের সহধর্মিণীই কাব্যে উপেক্ষিতা। গুরু নানকের তিন পুত্রের জননী সুলক্ষণীর দুঃখের কথা, অথবা গুরুগোবিন্দের তিন পত্নী, জিতো, সুন্দরী, সহিব-দেবীর মর্মদাহনের ইতিকথা লিখে যাননি শিখধর্মের প্রবক্তারা; তুলসীদাসজীর নাম সারা ভারত জানে, কিন্তু কজন খবর রাখে তুলসীদাসজীর ধর্মপত্নী তারক-জননী রত্নাবলীর আত্মত্যাগের কাহিনী? আর রানী শঙ্করী তো সন্তানহীনা—স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা!

জন আলেকজাণ্ডার চ্যাপমান ছিলেন প্রথম যুগের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বিদগ্ধ গ্রন্থাগারিক। পণ্ডিত এবং কবি। গত শতাব্দীতে প্রকাশিত তাঁর কাব্য-গ্রন্থ **'Religious Lyrics of Bengal'**-গ্রন্থে দেখছি—হংসেশ্বরী মন্দিরের উপর একটি কবিতা। খ্রীস্টান-কবি মন্দিরের ভিতর ঢুকবার অনুমতি পাননি। বাহিরদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন ঐ দেবদেউলকে। লিখেছিলেন:

"What did he do? He built a temple, still
It stands and I have seen it, but too ill
Would words of mine describe it. Inside, out,

Silent on earth, in pinnacled air ashout ;
It doth reveal what to the initiate
Figures pure thought. So unto them a gate
Is opened to deliverance. I outside,
Alien but not unmoved untouched abide "

"আজন্ম সঞ্চয় দিয়ে বংশবাটি ভূপ
জীবন সায়াহ্নে এসে অতি অপরূপ
রচিলা মন্দির এক : আজও উচ্চশির,
ভিতরে, বাহিরে, ভূমে, আকাশে, গম্ভীর
উদাত্ত-কণ্ঠে ঘোষিছে মুক্তির বাণী। বলিছে
'তিনিই চরম সত্য! আর সব মিছে।'
বিজাতি বিধর্মী আমি, মন্দির-বাহিরে
রয়েছি দাঁড়ায়ে একা, শ্রদ্ধানম্র শিরে।
বর্ণিবারে শক্তি নাই, মাথা মোর নত ;
নির্বাক! অন্তর শুধু স্তব্ধ অভিহত!"

১৮২০—অর্থাৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বৎসর পরের কথা। সেকালের সংবাদপত্রে দেখছি প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদ "১৯. ২. ১৮২০ : সমাচার দর্পণ : চুরি। মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই-তিন-হাজার টাকার স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসানকালে তাঁহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারকী অনেক হইতেছে।"

১৮২১—শঙ্করী দেবীর বয়স উনপঞ্চাশ।

দিলীপ দত্ত একদিন এসে দাঁড়াল মাথা নীচু করে। বললে, আবার দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি মা। মামলায় আমাদের হার হয়েছে। বিচারক রায় দিয়েছেন, এ মন্দির জমিদারীর অন্তর্ভুক্তই—দেবোত্তর নয়। যেহেতু কৈলাস-দেব জমিদারীর উত্তরাধিকারী সেই হেতু মূর্তিসহ মন্দির তাঁর সম্পত্তি।

শঙ্করী কয়েকটি মুহূর্ত ভাষা খুঁজে পেলেন না। তারপর একটু দম নিয়ে বলেন, আমি মন্দিরের সেবায়েত নই? কৈলাস মায়ের সেবায়েত! এই বিচার হল?

দিলীপ বুঝতে পারে রানীমার নিদারুণ মর্মযাতনা।

পাশ থেকে বৃদ্ধ হরেরাম মোক্তাব বলে ওঠেন, রানীমা আপনি পরিস্থিতি-টা বুঝতে পারছেন না। কৈলাসও সেবায়েত নয়। সেবায়েত কখন হয়? যখন সম্পত্তি হয় দেবোত্তর। আদালতের রায়-মোতাবেক এ সম্পত্তি দেবোত্তর নয়—রাজা কৈলাসদেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি—ঐ মন্দির, শিবলিঙ্গ এবং দারুময় মাতৃমূর্তি। কৈলাস ইচ্ছা করলে একখানি একখানি করে ঐ পাথর খুলে ফেলতে পারেন। বেচে দিতে পারেন।

শঙ্করী বসে পড়েন ভূ-শয্যায়। দিলীপ দ্বিধা করে না, এগিয়ে এসে ধরে ফেলে তার ছোটমাকে: এ কী করছেন! আপনি পড়ে যাবেন যে!

ততক্ষণে সামলেছেন রানীমা। বললেন, না, আমি ঠিক আছি। শোন দিলীপ…

কথাটা তাঁর শেষ হল না, হঠাৎ তূর্য নিনাদে আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে ওঠে। নির্বান্ধব রাজপুরীতে সহসা এ শব্দে রানীমা চমকে ওঠেন। বলেন, ও কি?

মোতির মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, বাজনদার। হাবিলদার-মামা বাজনদার নে এসেছে। রাজবাড়ির সামনে বাজাবে। মামলায় রাজা মশায়ের জয় হল যে।

শঙ্করী বললেন, দিলীপ, তুমি আপীল কর। আমি এ বিচার মানি না।

মাথা নত করে দিলীপ কি বলল শোনা গেল না। ঢাক-ঢোল-শিঙার শব্দে ডুবে গেল সে-কথা। রানীমা বললেন, কী বললে?

মুখটা কানের কাছে এনে দিলীপ বললে, উপায় নেই মা। আপনি আজ কপর্দকহীনা।

—ও! এই কথা! আচ্ছা অপেক্ষা কর একটু। আমি এখনই আসছি।

উঠে দাঁড়ালেন রানীমা। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন তাঁর বড়দির কক্ষে। ঘরের পরিবর্তন হয়নি বিশেষ কিছু। শুধু প্রাচীরে বিলম্বিত ফ্রেমে বাঁধানো এক জোড়া চরণের ছাপ। আলতা-ছাপ। সহমরণে শায়িতা মহা-মায়ার যুগলচরণের ছাপ। শঙ্করী সেটার উপর তাঁর মাথাটা ঠেকালেন। অস্ফুটে বললেন, বড়দি, তুমি আশীর্বাদ কর তোমার ছুটকিকে।

অনতিবিলম্বে ফিরে এলেন রানীমা। নামিয়ে দিলেন একটি পুঁটুলি। বললেন, নিয়ে যাও দিলীপ। আপীল দায়ের কর।

পুঁটুলিটা না খুলেই দিলীপ বুঝতে পারে ওর ভিতরে কী আছে। অনুরূপ

একটি পুঁটুলি খুলে সে বড় রানীমার সামনেই গহনা ওজন করিয়েছিল—স্যাকরা দিয়ে। আজ ছোটমা সামনে ওজন করানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন তাঁর যৌতুক, তাঁর সমস্ত অলঙ্কার দিলীপের হাতে।

১৮২৬—আরও ছ বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে কলকাতাবাসী কাশীশ্বরীর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে—কৈলাস তার নাম রেখেছেন দেবেন্দ্রদেব। তার অন্নারম্ভে শঙ্করীর নিমন্ত্রণ হয়নি। শুনেছেন লোকমুখে—কলকাতায় ঐ উপলক্ষ্যে কত সাহেব-সুবো, রাজা-উজীর নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। একদিন দেশী মতে, একদিন বিলাতী খানাপিনা। আতস-বাজি, খ্যামটার নাচ, বাইজি। রাজপুত্রের অন্নারম্ভ সাড়ম্বরেই হয়েছে। নাতির মুখ অবশ্য এখনও দেখেননি রানী শঙ্করী।

আবার একদিন মোক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন রানীমার কাছে, দিলীপ দেওয়ানকে সঙ্গে করে। বললেন, মা, আমি তো শেষরক্ষা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আপীলে হাবিলদার-মামা এক সাহেব ব্যারিস্টার দিয়েছে। তার কথাই বুঝতে পারি না আমি। বিচারকও সদ্য এসেছেন কালাপানি পার হয়ে। উদ্ধত নবীন যুবক—খাস সাহেব। সে তো আমার কোন যুক্তিই শুনতে চায় না। বলছে—দায়ভাগ মিতাক্ষরা কোনও আইনেই কোথাও লেখা নেই উপযুক্ত দত্তকপুত্র পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তির অধিকারী হবে না।

শঙ্করী বলেন, জমিদারী সম্পত্তি তো চাইছি না আমি। আমি চাইছি শুধু ঐ মন্দির। ও মন্দির তো পিতৃপুরুষের বংশানুক্রমিক সঞ্চিত অর্থে নির্মিত হয়নি। ওর মধ্যে যে রয়েছে বড়দির বিবাহের যৌতুক। এ তো আমার স্বামীর স্বোপার্জিত। আমার সতীনের বুকের পাঁজর দিয়ে গাঁথা। সাহেব একথা বুঝছে না?

বৃদ্ধ মোক্তার মাথা নেড়ে বললে, না মা। আইনের সেরকম নির্দেশ নয়। তাছাড়া সম্পত্তি তো সত্যই স্বর্গত রাজা-মহাশয়ের স্বোপার্জিত অর্থে নয়। 'কাশীখণ্ড' রচনা করে তিনি কতটুকুই বা জমিয়েছিলেন? বড়রানীমার যৌতুকের সব অর্থ যে মন্দির গড়ার জন্য ব্যয়িত হয়েছে তারই বা প্রমাণ কই, সাক্ষী কই?

—কেন? কৈলাস তা জানে, কাশীশ্বরী জানে।

এত দুঃখেও হাসলেন মোক্তারবাবু: আপনি ভুলে গেছেন রানীমা—তাঁদের সঙ্গেই মামলা।

—রাজা-মহাশয় যে আমাকে ঐ মন্দিরের সেবায়েত করতে চেয়েছিলেন সে-কথাও কি স্বীকার করবে না কৈলাস?

দিলীপ বললে, কই আর করছেন। হয়তো আলাদা করে পেড়ে ফেললে

তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাকে তিনি আজও শ্রদ্ধা করেন— পুত্রের অন্নপ্রাশনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতেও নাকি আসছিলেন—কিন্তু ঐ হাবিলদার-মামার জন্য পারেননি। তিনি যেন ভাগ্নে জামাইকে সবদা আগলে রেখেছেন।

রানীমা বললেন বুঝলাম। আপনারা তাহলে এক কাজ করুন। সাহেবকে বলুন, আমি আদালতে গিয়ে স্বয়ং এজাহার দিতে চাই।

মোক্তারবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দিলীপ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী বলছেন ছোটমা। প্রকাশ্য আদালতে আপনি কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন? সেখানে 'চিক' এর ব্যবস্থা নেই কিন্তু।

—জানি। আপনি শুধু একটা কাজ করবেন মোক্তারবাবু। একজন ইংরাজী-নবীশ উকিলের ব্যবস্থা রাখবেন। যিনি আমার জোবানি ঠিক ঠিক ভাবে সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

দিলীপ দৃঢ়ভাবে বলে এ অসম্ভব।

দৃঢ়তর স্বরে রানীমা বললেন, তুমি তা আমার চেয়ে দিলীপ তা চেনে!

সতীদাহের চেয়ে এ তামাশা বড় কম নয়। সম্ভ্রান্ত রাজবাড়ির পর্দানসীন পুরললনা প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে এজাহার দেবেন। ঘোমটা পরলে চলবে না—সনাক্ত হতে হবে। চিকের আড়ালে থাকলে চলবে না—সহস্র দর্শকের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে হবে। বিপক্ষের উকিল তাঁর দাম্পত্য জীবন নিয়ে নির্লজ্জ প্রশ্ন করতে পারে—তাঁর সঙ্গে রাজ-মহাশয়ের সম্পর্ক কী জাতের ছিল তা আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে—তাতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না।

ব্যাপারটা যে কতদূর অবাস্তব তা আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকাকে বোঝানো শক্ত। হয়তো কিছুটা আভাস দেওয়া যাবে 'কাল'-টাকে চিহ্নিত করলে—ভারতবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা ইংলণ্ডে কুইন ভিক্টোরিয়া তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। আমেরিকা যুরোপে তখনও বন্ধ হয়নি দাস প্রথা। বন্ধ হয়নি সতীদাহ—এই ভারতবর্ষে।

ষোল বেহারার পাল্‌কি এসে থামল হুগলী কালেক্টারির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। দিলীপ কিংখাবে মোড়া পাল্‌কির দরজাটা খুলে বললে, নেমে আসুন ছোটমা, আমরা আদালত প্রাঙ্গণে এসে পৌঁচেছি।

শঙ্করী নেমে এলেন। তাঁর পরিধানে সাদা থান। সর্বাবয়বে নেই একটি

অলঙ্কার যেন পঙ্ককুণ্ডের ভিতর থেকে উঠে এল দুগ্ধশুভ্র মানস-যাত্রী রাজহংসী। আবক্ষ অবগুণ্ঠন। দিলীপের পিছন-পিছন প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উঠে এলেন পাষাণ সোপান বেয়ে। সোপান-শীর্ষে প্রতীক্ষা করছেন একজন। বললেন, আস্তে আজ্ঞা হোক বেয়ান-ঠাকরুণ। এই দিকে—

শঙ্করী অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলেন একজোড়া ভারী জঙ্গী বুট।

লোকটা অনাহূত তাঁর পাশে পাশে চলতে থাকে। এটা অন্দর মহল নয়। প্রকাশ্য আদালতের বারান্দা। পাশাপাশি হাঁটলে আপত্তি করা চলে না। দিলীপ দাতে দাত দিয়ে নীরব রইল। লোকটা আপন মনেই বকবক করতে করতে চলেছে ঃ এই জন্যেই বলে—'বিষয় হচ্ছে বিষ'। সম্পত্তি এমন জিনিস যে, মাকেও ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হয়। বাঁশবেড়ের রাণীমা, কোথায় অন্দর মহলে দাসীর সেবা খাবেন, তা নয়—একহাট লোকের সামনে ঘোমটা খুলে খ্যামটা নাচতে হবে।

চাপা গর্জন করে ওঠে দিলীপঃ থামুন আপনি! বেয়াদপ, বেসরম কোথাকার!

একগাল হাসলেন হাবিলদার-মামা। বললেন, আমাকে ধমকে থামাতে পার দেওয়ান সাহেব, কিন্তু আমার উকিল ব্যারিস্টার যখন রানীমাকে খ্যামটা নাচাবে—

—সাট আপ! স্কাউণ্ড্রেল!

চমকে ওঠেন শঙ্করী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। ঘোমটা তুলে দেখেন ও-পাশ থেকে কে যেন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে হাবিলদার মামার হাত। চিনতে পারেন। অনেক—অনেকদিন পরে দেখছেন বটে—তবু চিনতে অসুবিধা হয় না। কৈলাসদেব। হাবিলদার-মামাকে বলে, উনি আমার মা। ওঁকে অপমান করলে—

হাবিলদার-মামা হঠাৎ কেঁচো। বলেন, না বাবা, অপমান করব কেন? এস এস, আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।—হাত ধরে তিনি আকর্ষণ করেন কৈলাসকে।

কৈলাস তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বিস্মিত বিমূঢ় শঙ্করী কিছু বলবার আগেই কৈলাস যেন ছোঁ মেরে তাঁর পদধূলি নেয়। শঙ্করী ওকে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কৈলাসদেব ছুটে পালালো।

অবাক হয়ে গেলেন শঙ্করী। কৈলাস অনেক বদলে গেছে। রোগা হয়ে গেছে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে মিশে ইংরাজী গালও শিখেছে। ভাষাটা বোঝেন নি, কিন্তু সুর শুনে বুঝতে পারেন মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করলেও—মায়ের অপমান সে সইবে না।

কোর্ট-পেয়াদা-ইস্তক সমস্ত আদালত-সুদ্ধ লোক দেখতে পাচ্ছে ওঁকে। বস্তুত

ঐ অবগুণ্ঠনবতীই মানুষ-জনে-ঠাসা আদালতকক্ষের মূল আকর্ষণ—কেন্দ্রবিন্দু। তবু প্রথামাফিক কোর্ট-পেয়াদা নির্দেশ-মত হাঁক পাড়ল : রানী শঙ্করী দেবী। হা—জি—র ?

দিলীপ ওঁর কানে কানে বলল, এবার আপনার সাক্ষী ছোটমা। আসুন।

এক গলা ঘোমটা দিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন রানী শঙ্করী। দিলীপ রয়ে গেল দর্শকের আসনে। কোর্ট-পেয়াদা ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, কাঠের রেলিং ঘেরা অংশটা অতিক্রম করে, কাঠের সোপান বেয়ে সাক্ষীর মঞ্চে।

দেড়শো বছর আগেকার কথা। আদালতের কার্যকারণ প্রণালী সে-যুগে ঠিক আজকের মত ছিল না। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ল'-এর নিয়ম-কানুন তখনও এভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। কোম্পানির আমলে বিচারপদ্ধতি ছিল—চণ্ডীমণ্ডপের-বিচার-পদ্ধতিরই একটা মার্জিত সংস্করণ। ক্রশ-রিক্রশ-রিডাইরেক্ট প্রভৃতির ঝামেলা নেই। দু-পক্ষের উকিল এবং বিচারক যাঁর যখন খুশি সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারতেন। বিচারকের পার্শ্বে বসে আছেন দো-ভাষী। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিচারক বঙ্গভাষা ভালভাবে জানেন না। অল্প অল্প বুঝতে পারেন মাত্র।

কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, এই গ্রন্থটি স্পর্শ করুন রানীমা। এটি শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। এটি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করুন—'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।'

শঙ্করী গ্রন্থটি স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হলেন না। বক্তার হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন। দু হাতে সেটি ধরে, ললাটে স্পর্শ করিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—'যাহা বলিব, সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না—'

সমস্ত আদালতে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা—রানীমায়ের সুউচ্চ কিন্তু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলেরই কর্ণগোচর হল।

একজন সাহেব উকিল বললেন—আপনার নাম কি আছে ? পরিচয় কি আছে ?

—আমার নাম শ্রীশঙ্করী দাসী। আমি বংশবাটির স্বর্গত রাজা-মহাশয়ের কনিষ্ঠা মহিষী।

—আপনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন। আপনিই যে রানী-শঙ্করী আছেন তাহা আমরা কীরূপে জানিব ? চিনিব ?

শঙ্করী অবলীলাক্রমে তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেন ললাট পর্যন্ত। চোখে চোখ রেখে তাকালেন সাহেব-ব্যারিস্টারের দিকে। সমস্ত আদালতে একটি গুঞ্জন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত প্রবাহিত হল।

পঞ্চাশোর্ধ্বা রানীমা এখনও দেবীপ্রতিমা !

—আপনিই যে সত্যই রানী শঙ্করী আছেন, তাহা কে সনাক্ত করিবে ? এ আদালতে কেহ আপনাকে চেনে কি ?

রানীমা অসঙ্কোচে তাঁর নিরাভরণ দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে বলেন, স্বয়ং বাদী আমাকে চেনেন—আমার পুত্র, শ্রীকৈলাসদেব রায় ।

হঠাৎ এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কৈলাসদেব। অধোবদন হলেন তিনি।

সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামীর কি নাম আছে ?

রানী শঙ্করী কঠিন স্বরে বললেন, তুমি এদেশে ব্যারিস্টারি করতে এসেছ সাহেব, অথচ এটুকু জান না—কোন হিন্দু স্ত্রী তাঁর স্বামীর নামোচ্চারণ করে না।

আদালতে একটা হাস্যরোল ওঠে। বিচারক তাঁর হাতুড়িটা ঠোকেন।

এবার ও-পাশ থেকে একজন দেশী উকিল, কৈলাসদেবেরই উকিল—বলে ওঠেন, না রানীমা, নাম বলতে হবে না। আমিই প্রশ্ন করছি : স্বর্গতঃ রাজা মহাশয় নৃসিংহদেব রায় কি আপনার স্বামী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ-কথা কি সত্য যে, নৃসিংহদেব কাশী থেকে শেষবার ফিরে আসার পর আপনার অন্দর-মহলে আদৌ প্রবেশ করেননি ?

—হ্যাঁ সত্য।

—এবং তিনি ফিরে আসার পর যে তিন বৎসর বংশবাটিতে ছিলেন তার ভিতর মাত্র একবার আপনাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ?

—হ্যাঁ, তাও সত্য।

—তার অর্থ—আপনাদের দুজনের দাম্পত্য-জীবনে সেই তিন বৎসর কোন সদ্ভাব ছিল না ? দেখাসাক্ষাৎ হত না ?

—না। সেটা সত্য নয়। আমার স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে কেউ সংসারাশ্রমে যে তার স্ত্রী ছিল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না। সদ্ভাব ঠিকই ছিল।

শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে উকিলবাবু বলেন, কিন্তু আমরা শুনেছি—সংসারাশ্রমেও আপনাদের দুজনের আদৌ দেখাসাক্ষাৎ হত না। রাজা-মহাশয় বড়রানীমায়ের শয়নকক্ষেই বরাবর রাত্রিযাপন করতেন। সে কথা কি সত্য নয় ?

রানী শঙ্করীর মুখ ক্রোধে রক্তজবার মত রাঙা হয়ে উঠল। তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, কিন্তু তিনি কোনও প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মোক্তার হরেরাম চৌধুরী। এ প্রশ্নে আপত্তি জানালেন। প্রশ্নের বিষয়বস্তু

বিচারককে বুঝিয়ে বলা হল। বাদীপক্ষের উকিল বিচারককে বললেন, আমি প্রমাণ করতে চাইছি, নৃসিংহদেব কোনদিন প্রতিবাদীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। বিবাহ করলেও তার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেননি। সেই জন্যই তাঁর সন্তানাদি হয়নি। প্রতিবাদীর প্রতি বিরাগবশতঃ তিনি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে বঞ্চিত করতেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

হরেরাম বলেন, এ-কথা সর্বৈব মিথ্যা ধর্মাবতার।

উকিল বলেন, সত্য-মিথ্যা আপনি কেমন করে জানবেন মোক্তারবাবু? সাক্ষীকে বলতে দিন।

বিচারক বলেন, ঠিক কথা। সাক্ষীকে বলতে দিন।

আদালত উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে। উকিলবাবু পুনরায় বলেন, বলুন রানীমা। এ-কথা কি সত্য যে, রাজা-মশাই জীবনে কোনদিন আপনাকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেননি?

রানী শঙ্করী দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্নকর্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ইংরাজ বিচারককে বললেন, এ তোমার কেমন বিচার সাহেব? সত্যের মর্যাদা রাখতেই আমি এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছি, এজাহার দিতে এসেছি। আমার ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনের কথা হাটের মাঝখানে ব্যক্ত করতে নয়। আমি শুনেছি ইংরাজ জাতি সুসভ্য। তুমি বল—সেটা কি আমি ভুল শুনেছি?

ইংরাজ বিচারক বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু সাক্ষী যে তাঁকেই সম্বোধন করে কিছু বলেছে তা বুঝলেন। দোভাষীকে প্রশ্ন করেন, What does the lady say?

দোভাষী রানী শঙ্করীর বক্তব্য নির্ভুল অনুবাদ করে শোনালো।

বিচারক নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, সওয়াল জবাব থাক। আপনি একটি এজাহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সে কথাই বলুন।

রানীমা বলতে থাকেন, সাহেব, তুমি আমার সন্তানের বয়সী। হয়তো তুমি আমারই বয়সী জননীকে দেশে ফেলে এখানে ন্যায়বিচার করতে এসেছ। হয়তো তাঁর কথা মনে করেই তুমি অবাক হয়ে ভাবছ—মা হয়ে কেন আমি সন্তানের বিরুদ্ধে লড়ছি। নয়? সেই কথাটাই আমি বুঝিয়ে বলতে এসেছি। তুমি শুনতে চাও?

দোভাষী অনুবাদ করে শোনাতে বিচারক বললেন, আপনি বলুন, মা!

মা! এতক্ষণে মনে বল পেলেন শঙ্করী। স্থির অচঞ্চল বঙ্গভাষে তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন পরিস্থিতিটা। বললেন, সবার আগে তোমাকে বুঝে

নিতে হবে একজন ইংরাজ বিধবার সঙ্গে একজন ভারতীয় বিধবার কী পার্থক্য! ভারতীয় হিন্দু-বিধবার কাছে অর্থ নিবর্থক—সে একাহারী, বিপুল বিত্তের অধিকারী হলেও সে তা ভোগ করতে পারে না—শাড়ি-গহনা, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-বৈভব তার নিষিদ্ধ। কোন মঙ্গলকার্যে সে উপস্থিত থাকতে পারে না—কোন শুভকার্যে সে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অর্থের প্রতি তার মোহ থাকার কথা নয়। ধর আমার কথা। আমি জমিদারী চাইনি, চেয়েছি মন্দিরের সেবাইতের অধিকার। যদি সমস্ত সম্পত্তিটাই পেতাম, তাহলেও আমার জীবনযাত্রার কোন পার্থক্য হত না। আমি সেই একবেলা আহার করতাম, ফল-মূল-ছানা-দুধ। রঙিন বা পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতে পারতাম না, গহনা পরতে পারতাম না। যাক সে কথা। কিন্তু আমি তো সেজন্য মামলা লড়ছি না। আমি শুধু মা হংসেশ্বরীর পূজা করবার অধিকারটুকুর জন্যই এ মামলা লড়ছি।

বললেন, হংসেশ্বরী কে, তা তুমি বুঝবে না সাহেব। তোমার কাছে হয়তো সে পুতুল। তা 'মা মেরী'র মূর্তিও তো পুতুলই। মনে কর না কেন—আমার স্বর্গত স্বামী সেই মা-মেরীর নামে একটা গীর্জা বানিয়ে দিয়ে গেছেন, আমি সেই মা-মেরীর অছি।

আরও বললেন, শুনেছি—ওপক্ষের উকিলবাবু নাকি বলেছেন—এ অর্থ আমার স্বামীর স্বোপার্জিত নয়! এ নাকি আমাদের বংশের সাতপুরুষের সঞ্চিত অর্থ। কথাটা সত্য নয় সাহেব। তুমি বুদ্ধিমান, বুঝে দেখ—অর্থ সঞ্চিত হয় কী ভাবে? আয় বৃদ্ধি করে অথবা ব্যয় সঙ্কোচ করে। আমরা ঐ দ্বিতীয় পন্থায় সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে এ অর্থ সঞ্চয় করেছি। তখন কোথায় ছিল ঐ বাদী? ঐ কৈলাসদেব? আমরা যদি জমিদারদের চিরাচরিত প্রথায় বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতাম, তাহলে তো ঐ দেব-দেউল গাঁথা হত না। খোঁজ নিলে তুমি জানতে পারবে—আমার সতীন, আমার বড়দি মহামায়া দেবী তাঁর সমস্ত যৌতুক, সমস্ত অলঙ্কার ঐ তহবিলে জমা দিয়েছিলেন—

বাদী পক্ষে উকিল বাধা দিয়ে বলেন, সেটা গল্পকথা। তার কোন প্রমাণ নেই, কেউ সাক্ষী নেই—

—নেই! রুখে ওঠেন শঙ্করী। বলেন, সেদিন সে-কথা গোপন ছিল, এখন বাঁশবেড়ের প্রতিটি মানুষ জানে—কী ভাবে রাতারাতি রাজকোষের সঞ্চয় ছয় থেকে সাত লক্ষে উঠে গিয়েছিল! দিলীপ দেওয়ান জানে, নীলমণি স্যাকরা জানে—

উকিলবাবু বাধা দিয়ে বলেন, দিলীপ দেওয়ান আপনার পক্ষের লোক,

নীলমণি স্যাকরা স্বর্গগত। আপনি যে মিথ্যা বলছেন না—

—কী! আমি মিথ্যা বলছি!—ঘুরে দাঁড়ালেন রাণীমা। বললেন, বেশ! ঐ তো বসে আছে কৈলাস! এ মামলার বাদী। তাকে উঠে আসতে বলুন। সে এসে ধর্মাবতারকে বলুক—তার মা মিথ্যাবাদী! বলুক—সে তার জ্ঞানমত জানে না—তার বড়মায়ের সর্বস্ব আছে ঐ মন্দিরে!

হাবিলদার-মামা কৈলাসকে একটা কনুয়ের গোত্তা মারেন। কৈলাস মুখটা তুলতে পারে না।

ধমকে ওঠেন শঙ্করী, মুখ লুকোলে তো চলবে না বাবা কৈলাস। তুমি বাঁশবেড়ের রাজা-মহাশয়। মাথা সোজা করে উঠে দাঁড়াও; বল ধর্মাবতারকে। ধর্মসাক্ষী করে বল।

মায়ের আদেশমত কৈলাস উঠে দাঁড়ালো। দুটি হাত জোড় করে বললে, ধর্মাবতার! মন্দিরের উপর থেকে আমি দাবী প্রত্যাহার করছি। ছোটমা মিথ্যা কথা বলেন না। ওকে রেহাই দিন এবার।

উঠে আসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে নিরলঙ্কার মায়ের মনিবন্ধ। বলে, নেমে এস মা! সাবধানে পা ফেল, পড়ে যাবে তুমি!

এ সাবধানবাণীর প্রয়োজন ছিল। শঙ্করীর দুই চোখে তখন জল ভরে উঠেছে। কাঠের সোপান তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না আদৌ। তা হোক। দৃষ্টি না থাক—ছেলে তো আছে। অন্ধ বৃদ্ধার সেই তো যষ্টি।

উনিশ

বিনোদ মজুমদারের একটা সুবিধা ছিল যা ছিল না কৈলাসদেব রায়ের। বিনোদের কাশীশ্বরী ছিল না, স্ত্রীর হাবিলদার-মামা ছিল না। তাই গোকুলের পদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করায় আর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, কাহিনীর যবনিকা-পাত ছাড়া। কিন্তু কথাসাহিত্যের যেখানে যবনিকাপাত ঘটে জীবনী-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেখানে সমাপ্তি ঘটে না। তাই 'বৈকুণ্ঠের উইলে' পাঠক যে প্রশ্ন তুলবার অবকাশ পাননি, সেই কৈফিয়তই এখন দিতে হবে নৃসিংহদেবের উইলের প্রসঙ্গে।

কৈলাসদেব ফিরে গেলেন কলকাতায়, শঙ্করী দেবী বংশবাটিতে। আদালতের সেই ক্ষণিক মুহূর্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসের জন্য ঘরে-বাইরে কৈলাসকে কীপরিমাণ

গঞ্জনা সইতে হয়েছিল তা আমরা জানি না ; কিন্তু রাজবাড়ির ইতিহাস পড়ে মনে হয়েছিল দীর্ঘ জীবনের অযুত-নিযুত মুহূর্তের মধ্যে জীবনের ঐখণ্ডমুহূর্তটির জন্যই তিনি বংশবাটির রাজা-মহাশয়ের পরিচয় রেখে গেছেন—প্রমাণ রেখেছেন, নৃসিংহদেব তাঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করবার সময় মানুষ চিনতে ভুল করেননি।

এর পরেই নানা কারণে কৈলাসদেব মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহর ; ডাক্তার-বদ্যির অভাব নেই। রীতিমত সাহেব-ডাক্তার দিয়ে দেখানো হল তাঁকে ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দিন দিন শয্যালীন হয়ে পড়লেন কৈলাসদেব। বংশবাটিতে বসে রাণীমা কোন খবর পেলেন না। কেউ জানায়নি তাঁকে।

তারপর একদিন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি নিদাঘ সন্ধ্যা। প্রায় জনহীন প্রকাণ্ড নির্বান্ধব রাজবাটিতে ছাপ্পান্ন বছর বয়সের বৃদ্ধা রাণীমা সন্ধ্যাপিদীমটি জেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বারান্দার একান্তে। তাঁর হাতে তখনও সন্ধ্যাদীপ। অস্পষ্ট আলোয় দেখলেন, উঠোনের একপাশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ, বৃদ্ধ এবং বেশ দশাসই হয়েছেন জোয়ান। অন্দর মহলে ও ঢুকলো কেমন করে? ভয় পেয়েছেন যতটা বিরক্ত তার চেয়েও বেশি। ওখান থেকেই বলেন : কে? কে ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

লোকটা আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। বললে, পরণাম রাণীমা। হামি। হামি মহাবীর পরসাদ আছি।

—মহাবীরপ্রসাদ! কে তুমি? তোমাকে তো চিনি না! এলে কেমন করে অন্দর মহলে?

—গোস্তাকি মাফ করবেন রাণীমা। বিনা এত্তেলাতেই এসেছি। লেকিন আপনি হমাকে পহ্চানতে পারলেন না? আমি মহাবীর পরসাদ আছি।

—না বাবা। তোমাকে আমি চিনতে পারলাম না ; কে তুমি মহাবীর প্রসাদ?

লোকটা বললে, অনেক দিন হইয়ে গেল রাণীমা। আপনি ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হামি ঠিক এইখানে খাড়া ছিলাম। আপনি পুকার দিলেন,—'কে তোমাদের সর্দার আছে?' হামি পরণাম করে বললাম—'হামি মহাবীর পরসাদ হাজির আছি, রাণীমা—'

মনে পড়ে গেল শঙ্করী দেবীর। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার এক সন্ধ্যার কথা।

বললেন, মনে পড়েছে মহাবীর। কোথায় ছিলে এতদিন? তোমাকে তো আর কখনও দেখিনি।

—লেকিন হামি আপনাকে দেখেছি রাণীমা—হুগলি আদালতে। হামি আজও রাজ-সরকারেই আছি। আপনাদের কলকাতার মোকামে দারোয়ান আছি গরীব পরবর।

—তুমি কলকাতা থেকে আসছ? কেউ পাঠিয়েছে তোমাকে?

—নেহি রাণীমা, কেউ পাঠায় নাই। হামি ছুটি নিয়ে এলম। আপনার ছিচরণে কুছ নিবেদন আছে রাণীমা।

—বস তুমি। আমি আসছি।

মাথার পাগড়িটা খুলে বারান্দার একান্তে বিছিয়ে মহাবীর প্রসাদ বসে। অনন্তবাসুদেবের বৈকালী ভোগ ঢাকা দেওয়া ছিল ঘরে। রাণীমা একটি পদ্ম পাতায় সেই ফলমূল-মিষ্টান্ন নিয়ে এসে ওর সামনে ধরে দিলেন। এটাই ছিল তাঁর নৈশ আহারের আয়োজন। বললেন, প্রসাদ গ্রহণ কর। তারপর শুনব কী তোমার আর্জি।

মহাবীর প্রসাদ যে-কথা শোনালো তাতে একটু অবাক হলেন রাণীমা। সে জানালো, কৈলাসদেবের মরণান্তিক অসুস্থতার কথা। আরও জানালো, বৌরাণীমা সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই রকমই ঘোষিত হয়েছে। একঘরে মৃত্যুশয্যায় রাজা-মহাশয় কৈলাসদেব, অন্য ঘরে এয়োস্ত্রীদের ভীড়। মহাবীর প্রসাদ ছুটে এসেছে রাণীমাকে খবর দিতে।

রাণীমা প্রাঙ্গণের একদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকেন। উঠোনে ঝোপঝাড় জঙ্গল হয়েছে। কে কাটায়? মনে পড়ল—এখানে ছিল না একটা প্রকাণ্ড কাঞ্চন গাছ? এমন চৈত্রসন্ধ্যায় বেগুনীফুলের গুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে কত কথা বলত কলমুখর গাছটা। কোথায় গেল অমন ঝাঁকড়া গাছটা?

—রাণীমা!

সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, আমি কি করতে পারি মহাবীর?

—রাজা-মশাই তো চললেন, বৌরাণীমাও সহমরণে যাইবেন, লেকিন কুমারবাবুর কী হোবে? আপনি তাঁকে লিয়ে আসুন।

কুমারবাবু! হ্যাঁ, তাই তো! তার কথা মনেই ছিল না। কুমার দেবেন্দ্র-দেব রায়। কৈলাসের পুত্র। কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু সাত বছর বয়স হল তারও। বললেন, আমি চাইলেই বা তারা দেবে কেন মহাবীর?

—দেবে রাণীমা। রাজা-মহাশয়ের তাই ইচ্ছা! লেকিন মামাবাবু

রাজী হচ্ছেন না।

আবার উঠে দাঁড়ালেন। আহ্! শান্তি কি ওঁকে দেবেন না ভগবান? এই নির্বান্ধব পুরীতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, আর হংসেশ্বরীর সেবা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার সুযোগও দেবেন না? আবার সেই তিক্ত সংগ্রাম। তা হোক, তবু হার মানতে পারেন না রাণী শঙ্করী। কুমার দেবেন্দ্রদেব তাঁর পৌত্র। সে-ই যে এখন এ বংশের শেষ পিদিম। মনস্থির করলেন। ডেকে পাঠালেন দেওয়ান দিলীপ দত্তকে। তিনিও এখন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। এসে বললেন. ডেকেছেন মা?

—হ্যাঁ বাবা। আমি একবার কলকাতা যাব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

মহাবীর প্রসাদ-আনীত সংবাদ বিস্তারিত জানিয়ে তিনি বললেন, কাল সকালেই যাব। নৌকোর ব্যবস্থা কর।

মাথা চুলকে দিলীপ বললেন, কিন্তু সেখানে হাবিলদার-মামা আছেন। ওঁরা যদি আপনাকে ঢুকতে না দেন? অপমান করেন?

শঙ্করীকে জবাব দিতে হল না। মহাবীর দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। এক পদ অগ্রসর হয়ে এসে বললে, দেওয়ান্জী! হমার হাতে একটি লাঠি আছে, ঔর হাবিলদার-মামার ঘাড়ে ভি একঠোই মাথা আছে। উ চিন্তা আপনি করবেন না।

কোর্ট অব ডইরেক্টরের রায়। এর উপর আপীল চলে না। মেনে নিতে হল দেওয়ানজীকে।

পরদিন অপরাহ্নে বজরা এসে ভিড়ল কালীঘাটের ঘাটে। হ্যা, ঐ যে দেড় হাত চওড়া পয়ঃপ্রণালীটা আজও বয়ে যায় কালীঘাট মন্দিরের পিছন দিয়ে, ঐ খানেই। যেআমলেরকথা, তখন ওখানকার ঘাটে দেড়-দুশো মহাজনী নৌকো সব সময় বাঁধা থাকত। বজরা থেকে অবতরণ করে রাণীমা ধুলো-পায়ে সর্বপ্রথমেই গেলেন ৺মায়ের মন্দিরে। সমস্ত দিন উপবাসে আছেন, মায়ের পূজো দেবেন বলে। পূজান্তে মহাবীর ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়েএল। পাথর-বাঁধানো সড়ক দিয়ে গাড়ি চলল সেই গলিটার দিকে, আজ যার নাম 'রাণী শঙ্করী লেন'।

ঘোড়ার গাড়িতে খড়খড়ি পাল্লা লাগানো। পর্দানসীন ব্যবস্থা। তবু তাতে চোখ লাগালে রাজপথের দৃশ্য দেখা যায়। সে পথে গোযান, ছ্যাকরগাড়ি, এক্কা, উট এবং হাতী দেখা যায়। শঙ্করী কিন্তু ওসব কিছু দেখছিলেন না। নিজের চিন্তাতেই তিনি ডুবে ছিলেন।

গাড়ি এসে থামল একটি বাড়ির সামনে। জীবনে প্রথম এ বাড়িতে পদার্পণ করলেন রাণীমা। সদর দরজা পার হয়েছেন কি হননি পথরোধ করে দাঁড়ালেন

একজন। অবগুণ্ঠনবতী যথারীতি দেখতে পেলেন—জরাজীর্ণ একজোড়া জঙ্গীবুট। যতই ঘোমটা টানুন, হাবিলদার-মামা তাঁকে ঠিকই চিনেছেন, বোধ করি তাঁর পিছন পিছন দিলীপ দত্তকে দেখে। বললেন, কী চাই ?

দিলীপ বললেন, রাণীমা এসেছেন রাজা-মশায়ের কাছে।

হাবিলদার-মামা বলেন, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু রাজা-মহাশয় অসুস্থ। বদ্যির বারণ, বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করার। আগেই একটা এত্তেলা পাঠানো উচিত ছিল আপনাদের।

এবার জবাব দিল মহাবীর প্রসাদঃ এটা কী আজীব বাত শুনালেন মামা-বাবু ? রাণীমা কি বাইরের লোক আছেন ? উনি তো 'মা' আছেন ?

—তুই ! তুই কোথায় ছিলি এ ক'দিন ?

—রাণীমাকে আনতে গিয়েছিলম গরীব পরবর। লেকিন রাস্তা ছোড়েন।

এক পা এগিয়ে আসে মহাবীর।

হাবিলদার-মামা অবস্থাটা বুঝে সরে দাড়ান, কিন্তু দুরন্ত ক্রোধে বলে বসেন, তুই এত বড় নেমকহারাম ? বেইমান !

শঙ্করী ততক্ষণে অতিক্রম করেছেন পথরোধকারীকে। মহাবীরও অনুগমন করেছিল। এ কথায় সে ঘুরে দাড়ায়। লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে বললে, নিমক তুমিও কুছু কম খাওনি মামাবাবু, এ রাজা-মশাইদের ! লেকিন এক বাত বলু বাবুজী ? তুম্‌নে মুঝ্‌কো নোকরি দি-থি, ইস্‌লিয়ে মুঝে পহ্‌লা গালি মান্-লি। অব্‌ দোস্‌রা দফে তুমনে মু খোলো তো—

না, হাবিলদার-মামা দ্বিতীয়বার আর মুখ খোলেননি।

কাশীশ্বরীও যেন ভূত দেখল ঃ আপনি ?

শ্বশ্রূমাতা অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন তার পুত্রবধূকে। শেষ যখন দেখেন তখন সে কিশোরী, এখন তার বয়স উনচল্লিশ। ঘরে দশ-বারোজন পুরনারী —এয়োস্ত্রী সবাই। ওদের কাউকেই চেনেন না শঙ্করী। কাশীশ্বরী উঠে এল। প্রণাম করল শাশুড়ীকে।

—কৈলাস কোথায় ?

—ওপরের ঘরে। আসুন আপনি !

—না। এমন হুট করে যাব না। উত্তেজনায় হঠাৎ একটা ভালমন্দ হয়ে যেতে পারে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি একটু একটু করে ওকে খবরটা জানাও।

তাই হল। বোঝা গেল কৈলাস এতদিন পরে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের

উত্তেজনাটা সহ্য করতে পারবেন। তাই পারলেন তিনি। তাঁর দু-চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। শঙ্করী সমস্ত সন্ধ্যাটা বসে রইলেন তাঁর মাথার কাছে নাতিকে কোলে নিয়ে। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

এক প্রহর রাতে কাশীশ্বরী এসে বললে, এবার আসুন আপনি। কাপড় ছেড়ে জপতপ সেরে নিন। সারাদিন উপবাসে আছেন, বললে মহাবীর। দুটি প্রসাদ মুখে দিন।

কৈলাস ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শঙ্করী উঠে এলেন। কাশীশ্বরী ওঁকে প্রদীপ দেখিয়ে নিয়ে গেল তার ঠাকুর ঘরে। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো পূজোর ঘর। সামনে একটি সিংহাসনে পটের ছবি—হংসেশ্বরীর। প্রণাম করলেন রাণীমা। হরিণচর্মাসন পাতাই ছিল—কোশাকুশি, ফুল, বিল্বপত্র, দীপ-ধূপ সব আয়োজনই করা আছে। তবু পূজোয় বসলেন না রাণীমা। খপ করে চেপে ধরলেন বধূমাতার হাতখানা। বললেন, দোরটা বন্ধ করে এখানে বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বৌরাণীমা অবাধ্য হল না। দ্বার রুদ্ধ করে এসে বলল, কী কথা?

—বস আগে। এখানে।

কাশীশ্বরী বসল শাশুড়ীর কোল ঘেঁষে। শঙ্করী ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমার ওপর রাগ করে আছ? কিন্তু আমি যে ওর মা—

—না। রাগ করে থাকব কেন? উনি যে যাবার আগে আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হবেন তা বুঝতে পারছিলাম, সঙ্কোচে আপনাকে ডাকতে পারিনি। অপরাধ তো আমরা কম করিনি। খোকার অন্নপ্রাশনে—

—থাক বৌমা। আজ আনন্দের দিনে সে-সব পুরনো কথা থাক! তুমি যে অভিমান করে নেই—

—অভিমান তো আপনারই করার কথা মা—

—শোন। যে কথা বলতে তোমাকে ডেকেছি। এ কি অনাসৃষ্টি কথা শুনছি বৌমা? তুমি নাকি বলেছ—কৈলাসের সঙ্গে, মানে তুমি নাকি—

—ঠিকই শুনেছেন। আপনি এসে পড়েছেন, এখন তো আর কোন চিন্তাই রইল না। খোকাকে কার হাতে দিয়ে যাব সেটাই শুধু চিন্তা ছিল।

—কিন্তু কেন? তোমার কি বা এমন বয়স? কৈলাস কিছু পরিণত বয়সে যাচ্ছে না?

—এই তো হিন্দু সতীস্ত্রীর একমাত্র উদ্ধারের পথ মা। ভুল বুঝবেন না আমাকে,

আপনাকে ব্যথা দিতে এ কথা বলছি না। আপনি যে সতী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার জন্য আমরাই দায়ী। আজ এতদিন পরে সেজন্য যাবার আগে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা না হই।

ঘরে একটি মাত্রপ্রদীপ জলছিল। তার শিখার দিকে তাকিয়ে শঙ্করী বললেন, বৌমা, জ্ঞানত কখনও আমি মিছে কথা বলিনি। তোমাকে এখন একটি কথা বলব, বিশ্বাস করবে?

ভ্রকুঞ্চিত হল কাশীশ্বরীর। বললে, কী এমন কথা?

—পূজোর ঘরে, মা হংসেশ্বরীর পটের সামনে আমি যা বলছি তা আমার অন্তরের বিশ্বাস। এ ভুল। এ নিদারুণ ভুল। এ কোনও শাস্ত্রীয় বিধান নয়। আমি জানি, আমি জেনেছি। এক মহাপণ্ডিতের গ্রন্থ-পাঠে আমি স্থিরনিশ্চয বুঝেছি—এ একটা নিষ্ঠুর প্রহসন। তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায।

উদ্দেশ্যে দুটি যুক্তকর কপালে ঠেকালেন।

কাশীশ্বরী সবিস্ময়ে বলে, কী ভুল! কিসের কথা বলছেন আপনি?

—সহমরণপ্রথা। না বৌমা, তোমাকে সতী হতে দেব না আমি।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত ছিটকে সরে গেল কাশীশ্বরী। বললে, মা! এ কী বলছেন? আপনি তো আমার মত নিরক্ষর নন! এমন অশাস্ত্রীয় কথা—

—ঐ একফোঁটা লেখাপড়া শিখেছি বলেই পড়েছি রাজা রামমোহনের লেখা 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ'। তাতেই জেনেছি, এ-প্রথা শাস্ত্রীয় বিধান নয়।

কাশীশ্বরী শুধু বললে, আপনি পূজো করুন মা, আমি যাই।

—দাঁড়াও! আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করী। বললেন, বৌমা, এ তোমার শাশুড়ীর আদেশ! তোমার বাড়িতে অযাচিত এসেছি,—এ আমার প্রণামী!

মাথা খাড়া রেখে কাশীশ্বরী বললে, শাশুড়ী যদি অশাস্ত্রীয় আদেশ দেন, তা মানতে পারি না আমি। আপনি ওঁর মা, কিন্তু ধর্ম তার চেয়েও বড়!

মাথা খাড়া রেখেই দৃপ্ত পদক্ষেপে দোর খুলে বের হয়ে গেল কাশীশ্বরী। সে জানতেও পারল না পরমুহূর্তে ভূ-শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন রাণী শঙ্করী। জীবনে অনেক অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন—এমন হতাশ বোধ করেননি কখনও!

কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার খেলার ধরনটাই ঐরকম। শঙ্করী জীবনভর বারে বারে জেতা খেলা হেরেছেন; আজ তাই তাঁর হারা খেলাই জিতিয়ে দিলেন। মৃত্যু-

শয্যা থেকে ফিরে এলেন কৈলাসদেব রায়—যে ভাবে একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন বড়রাণীমা। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। মাস ছয়েক রাণীমা ছিলেন সেইবার কলকাতায়—নিরলস সেবায়, যত্নে, শুশ্রূষায়, যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন পুত্রকে। তারপর একদিন ছেলে-ছেলেবৌ-নাতিকে নিয়ে বজরা করে ফিরে চললেন বংশবাটি। অনেক অনেকদিন পর। দেওয়ানজী মাল গুদাম থেকে বার করালেন শত শত মৃৎপ্রদীপ। সেগুলি কেনা হয়েছিল, জ্বালা হয়নি। বৃদ্ধা মোতির মা সারাদিন ধরে একা হাতে সলতে পাকালো। বজরা যখন সাঁঝের বেলায় বংশবাটির ঘাটে লাগলো, তখন নৌকো থেকেই দেখা গেল রাজবাড়ির কার্নিসে কার্নিসে আলোর রোশনাই। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পরে আজ রাজবাড়ি হাসছে।

কুড়ি

১৮২৯ থেকে ১৮৩৮। নয় বৎসর। এই একটি দশক রাণী শঙ্করীর জীবনে এসেছিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। ব্যাটা-ব্যাটাবৌ-নাতি। অন্দরে মোতির মা, বার মহালে দেওয়ান দিলীপ দত্ত আর মাঝ মহালে লাঠি হাতে মহাবীর প্রসাদ। না, জঙ্গী শাসন নয়। হাবিলদার-মামা একটা মাসোহারা নিয়ে কাশী চলে গেছেন। শতাব্দী পার হয়ে গেল প্রায়, অথচ তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি রাজাবরোধের অন্তরালের জীবনে। ঠিক তেমনি ভাবেই সাঁঝের বেলায় তুলসীবেদীতে প্রদীপ দেওয়া হয়, ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে থাস-গেলাসের আলো। অন্দর মহলের প্রাঙ্গণে জুঁই-বেল-দগুকলস ফোটে আর ঝরে। থোকা থোকা জোনাক জ্বলে ঝোপে ঝাড়ে, এক আকাশ তারা মিটমিট করে তাকায়। ডাকে শেয়াল, প্রহরে প্রহরে। বাজে শঙ্খ ঘণ্টা বাসুদেবের মন্দিরে—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বৈকালী, সন্ধ্যা-পূজা, শয়নারতি। এবং অশোক বনে বিরহিণী জানকীকে দেখে আজও হনুমান বলছেন—এবার মহাবীরের কণ্ঠে—'বচন্ন ন আও নয়ন ভরে বারি। অহহ নাথ তেঁহ নিপট বিসারী।'

তাই বলে কি বদল হয়নি ? হয়েছে। এ ফুলের গাছ, এ জোনাকির ঝাড় —এরা সবাই নবাগত। নতুন যুগের রাজা-মহাশয় বার-মহল থেকে অন্দর-মহলে যখন আহারাদি করতে আসেন বৌরাণীমা একই ভঙ্গিতে পাখা হাতে সামনে বসে থাকেন, একই ভঙ্গিতে রসিকতা করেন—'এটা খাও, ওটা খাও, না খাও তো আমার মাথা খাও'। শঙ্করীর মনে হয়—ঠিক যেন মা গঙ্গার মত। রূপ

তাঁর অপরিবর্তিত—কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যে জলরাশি যেখানে ছিল পরমুহূর্তে সে সেখানে নেই। বিরহিণী সীতার আর্তিতে একই করুণ মূর্চ্ছনা ; কিন্তু পাত্রের রূপ বদল হয়েছে। সীতা এখন গুরুপাদপদ্মনিরতা ! গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন, বীজমন্ত্র পাননি। তা হোক, দুঃখ করে সেদিন বলেছিলেন—'কেন এলেন আপনি একটা সুখস্মৃতি ধ্বংস করে দিতে ?' এখন বুঝতে পারেন, না, সে সুখস্মৃতিতে মালিন্য লাগেনি একতিল। কাব্যতীর্থ তাঁর প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি চিরসত্যাশ্রয়ী।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ছেদ পড়ল রাণী শঙ্করীর এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দঘন জীবনের। হঠাৎ মারা গেলেন কৈলাসদেব রায়। সাতান্ন বছর বয়সে। সজ্ঞানে। রাণী শঙ্করীর কোলে মাথা রেখে। কাশীশ্বরী সহমরণে গিয়েছিলেন কি না এ প্রশ্ন-টাই অবৈধ। কারণ যে বৎসর ওঁরা বংশবাটিতে ফিরে আসেন সেই বৎসরই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেছিলেন নব্য-ভারত- আত্মা রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল আইনের নির্দেশে।

আরও দু বছর পরে ১৮৪০-এ উনিশ বৎসর বয়সের তরুণ দেবেন্দ্রদেবের সঙ্গে বালিকাবধূ শ্রীমতী মৃন্ময়ীর বিয়ে দিলেন রাণীমা। নাতি আর নাতবৌকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরে। না, নিজের ঘরে নয়। সে ঘরে ফুলশয্যা পাতা চলে না। সে হিসাবে ঘরটা অপয়া। বড়রাণীমায়ের সেই সাবেক পালঙ্কটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজিয়েছেন। ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছেন ফুলশেজ। বাইরে নহবৎখানায় সানাই বাজছে। ছাদের কার্নিসে কার্নিসে আজও দীপাবলী। বর-বধূকে পাশাপাশি বসিয়ে বৃদ্ধা বলেন, মুখখানা একটু তোল তো নাতবৌ !

মৃন্ময়ী মুখটা একটু তুলল। শঙ্করী তার ঘোমটা খুলে দিয়ে হঠাৎ তার ওষ্ঠে চুম্বন করলেন, বললেন, এমনি করে চুমু খেতে হয়। বুঝলে ?

দেবেন্দ্রদেব মুখ টিপে হাসে। মৃন্ময়ী মরমে মরে যায়—ঠান্‌দির উৎকট রসিকতায়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাবধূ। কাশীশ্বরী দাঁড়িয়ে ছিলেন চৌকাঠের কাছে। বললেন, আপনি এবার আসুন মা, ওদের ঘুমোতে দিন। সারা দিন ধকল তো বড় কম যায়নি। এবার ওরা ঘুমোক।

—ঘুমোবে ! তুমি বলছ কি বৌমা ? আমাদের যেন আর ফুলশেজ হয়নি —বলেই চমকে ওঠেন। সব কথা মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। নিজের জীবনের কথা। তাই তো ! সে-সব কথা তো মনেই ছিল না। নাতবৌকে উনি চুম্বনের কায়দা শেখাতে গিয়েছিলেন ! ছি ছি ছি ! কি লজ্জা ! আটষট্টি বছরের বৃদ্ধা যে আজও জানেন না—পুরুষমানুষ চুমু খেলে নারীর শরীরে কী

জাতের রোমাঞ্চ হয়! ভাগ্যে সে-কথা কেউ জানে না!

কাশীশ্বরী আবার তাগাদা দেন, আসুন আপনি!

—না বৌমা। আমার কাজ এখনও মেটেনি। তুমি যাও, এই তোরাও যা সব। বর-বউ এবার শোবে।

কে একজন মুখরা বলে ওঠে, ওরা শোবে, তা তুমি যাবে না ঠান্‌দি? তুমি কি পালঙ্কের নীচে আড়ি পাতবে নাকি?

—সে আমি বুঝব। যা তোরা! নাতির দিকে ফিরে বলেন, তুইও টুক্ বাইরে যা। নাতবৌয়ের সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে। আধঘণ্টা পরে আসিস।

রাণীমায়ের হুকুম। খেয়ালী মানুষ তিনি। হয়তো কিছু কৌতুক বাকি আছে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মত হুড়মুড়িয়ে পুরললনার দল বেরিয়ে যায়। দেবেন্দ্রদেবও উঠে পড়ে। বলে, বেশী দেরী করো না ঠাক্‌মা। আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—ওরে আমার রে! অত ঘুম পেয়ে থাকে তবে আমার খাটে শুগে যা।

সকলকে ঘর থেকে তাড়িয়ে শঙ্করী ভিতর থেকে দোর বন্ধ করেন। বলেন, নাতবৌ, কিছু কথা আছে। এস, সবার আগে ওঁকে প্রণাম কর।

মৃন্ময়ী দেখল, ঠাক্‌মা একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে নির্দেশ করছিল। অলক্তকচর্চিত যুগল-চরণের ছাপ। শঙ্করী বলেন, উনি আমার বড়দি, তোমার বড়ঠাক্‌মা। মহামতি ছিলেন। আগে ওঁর আশীর্বাদ নাও।

মৃন্ময়ী গড় হয়ে সেই পটের সামনে প্রণাম করল। শঙ্করী ওকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। বললেন, আমি আর এত রাতে ছোঁব না, স্নান করতে হবে। ঐ তারের ঢাকাটা খোল দিকি?

আদেশমত একটা তারের জালতি খুলে ফেলে মৃন্ময়ী। তাতে নানান জাতের আহার্য। শঙ্করী বলেন, এ হচ্ছে রাজবাড়ির কুলাচার; ফুলশেজের রাতে রাজা-মশাইকে রাণী সামনে বসে খাওয়াবেন। এটাই নিয়ম। নাতিকে এই অন্নব্যঞ্জনের পাত্র ধরে দিবি। এই নে পাখা।

বালিকাবধূ বললে, পাখা কি হবে ঠান্‌দি। এটা তো মাঘ মাস।

—হোক, সেটাও নিয়ম। শোন তিন রকম মাছ আছে; ঐ জামবাটিতে আছে মহাপ্রসাদ। ঐ থালায় আছে মিষ্টান্ন—জনাইয়ের মনোহরা, ধনেখালির খইচুর, চন্দননগরের তালশাঁস আর শ্রীরামপুরের 'গুঁফো-সন্দেশ'—বলতে বলতেই তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

মৃন্ময়ী বললে, তুমিই বসিয়ে খাওয়াও না ঠান্‌দি। খাইয়েদাইয়ে বরং— হঠাৎ লজ্জায় সে থেমে পড়ে।

সবলে ওকে বুকে টেনে নেন শঙ্করী। বলেন, হ্যাঁরে নাতবৌ, তোর কি ভয় করছে?

ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে নাতবৌ শুধু বললে, হুঁ।

—দূর পাগলি! ভয় আবার কিসের! আমাকেও তো—

মাঝপথেই থেমে গেলেন। মৃন্ময়ী মুখ তুলে বললে, তোমার কত বছর বয়সে ফুলশয্যা হয়েছিল ঠান্‌দি?

সজ্ঞানে নাকি রাণী শঙ্করী কখনও মিছে কথা বলেন না। এবারেও পারলেন না। বলেন, আর একদিন সব কথা তোকে বলব নাতবৌ। শুধু তোকেই বলব।

যে বছর সাগরদাঁড়ির জমিদার রাজনারায়ণের প্রতিভাশালী পুত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলেন সেই বৎসরই জন্ম হল পূর্ণেন্দুদেব রায়ের—অর্থাৎ রাণী শঙ্করীর প্রনাতি। দেবেন্দ্রদেব এবং মৃন্ময়ীর সন্তান!

আবার শিশু এসেছে সংসারে। না, আবার কেন? এই তো প্রথম। সদ্যোজাত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরার যে তৃপ্তি সেটা এই একাত্তর বছর বয়সে প্রথম অনুভব করলেন বংশবাটির ছোটরাণীমা। পুত্র কৈলাসদেবকে পেয়েছিলেন তাঁর তরুণ বয়সে; পৌত্র দেবেন্দ্রদেবকে পেয়েছিলেন তাঁর সাত বছর বয়সে। এই প্রথম, জীবনের প্রথমবার, সূতিকাগারে প্রবেশ করে একটি সদ্যোজাত মানবককে তাঁর পঞ্জর-বিলীন অনাস্বাদিত স্তনযুগলের উপর চেপে ধরলেন।

এখন তিনি স্থবিরা। চোখে ভাল দেখেন না। বালাপোশ গায়ে শীতের সকালে বসে থাকেন বারান্দার একান্তে যেখানে এসে পড়েছে এক মুঠো রোদ। মালা টপকিয়ে জপ করেন। বীজমন্ত্র পাননি—'রাধামাধব' মন্ত্র জপ করেন। শাক্তবাড়ির বউ—হংসেশ্বরীর মন্দিরের যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ মন্ত্র তাঁকে কেউ দেয়নি। মাঝে মাঝে ছায়ামূর্তি সামনে দিয়ে চলে যায়। চোখের সামনে হাতটা তুলে রোদ-আড়াল করে বলেন, কে রে? কে যায়?

যে যায়, সে সাড়া দেয় না। আপন মনে গজগজ করে, জপ করছ, জপ কর না বাপু! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, এখনও সব দিকে নজর!

তা বটে! তা বটে! এখন উনি অকারণ, বাহুল্য। কে আসে, কে যায়— সে খোঁজে ওঁর আর কি প্রয়োজন? যাঁর আসার কথা, তিনি তো এলেন না!

কে জানে কোথায় দেহ রাখলেন ! রাধামাধব ! রাধামাধব !

তিন কুড়ি সাতের খেলা সাঙ্গ করেছেন। এ দুনিয়ায় হেসেছেন, কেঁদেছেন, ডুব খেয়েছেন, জল ভরেছেন। বাকি আছে বিদায় নেওয়া। জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বলতেন, ঠাকুর ! এদের সব রেখে যেন হাসতে হাসতে যেতে পারি ! এটুকুই শেষ প্রার্থনা ! খেলা তো সাঙ্গ হল—এবার তোমার কোলে টেনে নাও !

কাটল আরও আট-ন বছর। তিল তিল করে ভেঙে পড়ল দেহযন্ত্র। শঙ্করী এখন অশীতিপরা। চলৎশক্তিরহিতা। চোখে ভাল দেখেন না, কান কিন্তু খুব সজাগ, মস্তিষ্কও ঠিকই আছে। চিন্তাশক্তির পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ। মোতির মা অনেক দিন গেছে, মোতিও গেছে। মোতির মেয়ে এখন ওঁর দেখ্‌ভাল করে, ও ঠাক্‌মা ! দুটি চালভাজা খাবা ?

—চালভাজা ! দূর পাগলি ! দাঁত কই রে আমার যে, চালভাজা খাব !

—তবে দুধটুকু খাও। সকাল থিকে মুয়ে যে কুটোটি কাট নি গো ?

—আমার আবার খাওয়া ! রাধামাধব ! রাধামাধব !

কিন্তু সেই রাধামাধবের বোধ করি এখনও তৃপ্তি হয়নি। সমস্ত জীবনভর দুঃখের বেশে তিনি নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছেন। বারে বারেই তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন রাণী শঙ্করী। বারে বারে পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে, তবু ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাননি। এই আশী বৎসর বয়সে সেই অলক্ষ্যচারী নিষ্ঠুর বিধাতাপুরুষ আবার একটি কুলীশ-কঠিন বজ্র ছুঁড়ে মারলেন ওঁর স্তনবসিতবপু লক্ষ্য করে।

রাজবাড়ির সবাই ঐ নিকষা বুড়ীকে উপেক্ষা করত, শুধু একজন ছাড়া; ওঁর আদরের ছুটকি। হ্যাঁ, ছুটকি ! নাতবৌ-এর নূতন নামকরণ করেছিলেন তিনি। তুই আমাকে 'বড়দি-মা' বলে ডাকবি—আমি তোকে 'ছুটকি' বলে ডাকব। তোর সঙ্গে সতীন পাতালাম।

বোধ করি শঙ্করী এটা মেনে নিতে পারেনি—বংশবাটির রাজবাড়ি থাকবে অথচ সেখানে কোন 'ছুটকি' থাকবে না ! মহামায়া যেমন নবযৌবনবতী শঙ্করীর ভিতর নিজের দ্বিতীয়সত্তাকে আরোপ করতে চেয়েছিলেন, শঙ্করীদেবীও তেমনি ঐ নাতবৌ-এর মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চাইলেন। নিজের জীবনের ব্যর্থতা সার্থক করতে চেয়েছিলেন ঐ নূতন ছুট্‌কির সাহায্যে। ভগবান শঙ্করীকে রূপ দিয়েছিলেন অপরিমিত—এই আশি বছর বয়সেও তাঁর গায়ের রঙ পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মত, টুকটুকে ঠোঁট দুটি আজও পাতলা টসটসে। বলিরেখাঙ্কিত মুখে এখনও অদ্ভুত একটা দীপ্তি। মাথার চুল ধপধপে সাদা—কিন্তু এখনও গোছা-গোছা। রূপই

দিয়েছেন—দেননি স্বামীসুখ, দেননি সন্তান। ওঁর এই দ্বিতীয় সত্তা, এই নতুন ছুটকি, সে অভাব পূরণ করেছে। একাশি বছরের 'পুরনো ছুটকি' আর এক-বিংশতি বর্ষীয় 'নতুন ছুটকি' দুই সখী। মৃন্ময়ীকে খুলে বলতে পেরেছিলেন তাঁর সব বঞ্চনার ইতিহাস—অকপটে। সব, সব, সব কথা। নৃসিংহদেবের কথা, এবং হ্যাঁ, কাব্যতীর্থের কথাও। মৃন্ময়ী অনায়াসে প্রশ্ন করতে পেরেছিল —তুমিও তাঁকে ভালবেসেছিলে তো?

দৃষ্টিহীন দুটি চোখ মেলে বৃদ্ধা বলতেন: সজ্ঞানে আমি মিছে কথা বলি না ছুটকি। কেন এই বুড়িকে লজ্জা দিচ্ছিস?

—অথচ তাঁর কাছে কোন দিন স্বীকার করতে পারনি?

—তাই কি পারি? তিনি কত উঁচুতে!

আবার ছুটকিও তার দাম্পত্য জীবনের গোপন ইতিহাস অকপটে খুলে ধরত ঐ বৃদ্ধার কাছে। উনি চোখে দেখেন না, ওঁর কাছে আর চক্ষুলজ্জা কি? তাছাড়া মৃন্ময়া বোধকরি বুঝতে পেরেছিল—ঐ অনিন্দ্যকান্তি সৌন্দর্যের দেবী-প্রতিমা এই অশীতিপর স্থবিরতাতেও ও বিষয়ে কৌতূহলী। তাই তাঁকে সব কথা খুলে বলতে সঙ্কোচ করত না। বলত, তোমার নাতি আজকাল ভারী অসভ্য হয়েছে বড়দি। কালকে কি হয়েছিল জান?—

খোলাখুলি নয়, আকারে ইঙ্গিতে আভাস দেয়।

যেন কত বড় অভিজ্ঞ। ঠানদি বলতেন, তুই যা ভাবছিস তা নয়। অমন বিপরীত কাণ্ডও হয়। ঐ কুলুঙ্গিতে একটা পুঁথি আছে। পেড়ে নিয়ে আয়। পড়ে শোনা, তুই তো বাংলা পড়তে পারিস। তুই পড়ে শোনা, আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব অখন।

—কী পুঁথি?

—'বিদ্যাসুন্দর'। রায় গুণাকরের লেখা।

তারপরেই নেমে এল বিনা মেঘে বজ্র!

মাত্র তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন একত্রিশ বছরের তরুণ দেবেন্দ্রদেব রায়। ওঁরা স্থির করলেন বৃদ্ধাকে এ শোকটা পেতে দেবেন না। উনি আর কদিন! বৃদ্ধাকে তাই বলা হল মৃন্ময়ী তার বাপের বাড়ি গেছে—হঠাৎ তার বাপের এখন-তখন অবস্থার খবর এসেছিল রাত্রে। দেবেন্দ্রদেব রাত্রেই রওনা হয়ে গেছেন সস্ত্রীক। ঠান্‌দিকে বলে যেতে পারেননি।

শঙ্করী নির্বাক শুনে গেলেন। ওরা জানেন না. রাধামাধব ওঁর পাঁচটি অঙ্গ

কেড়ে নিয়ে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দান করেছেন। তারই মাধ্যমে বৃদ্ধা বুঝতে পারলেন কারচুপিটা। চোখ গেছে, কিন্তু কান? তিনি যে শুনতে পান, কাশীশ্বরী গুমরে গুমরে কাঁদে। ন বছরের পূর্ণেন্দুর পদধ্বনি যে শুনতে পান তিনি। বড়দিদার ঘরের সামনে দিয়ে সে ছুটে পালায়। আর শুনতে পান ছুটকির চাপা দীর্ঘ-শ্বাস। চোখে দেখেন না, মনের চোখে দেখতে পান—তার পরনে উঠেছে সাদা থান, তার সীমন্ত জুঁইফুলের মত সাদা। তার তেইশ বছরের ব্যর্থ যৌবনের হাহাকার মনের মধ্যে নতুন করে অনুভব করেন—দ্বিতীয় ছুটকির বেদনা বিদ্ধ হয় প্রথমা ছুটকির পাঁজরসর্বস্ব বুকে। মুখে স্বাকার করেন না। করতে পারেন না। এতদিনে বুঝতে পারেন, কেন তিন তিনটি বছর মূক হয়ে ছিলেন মহামায়া। এ লজ্জা যে তাঁরই। নিকষা রাক্ষসীর মত অজর অমর আয়ু নিয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন—আর ভরা সংসার ফেলে দেবেন্দ্র চলে গেল ড্যাংডেঙিয়ে। না, ড্যাং-ডেঙিয়ে নয়, চুপিসাড়ে। অন্দর মহলে প্রকাশ্যে 'হরিবোল' পর্যন্ত দেয়নি শববাহ-কেরা। পাছে ঠান্‌দি টের পান। সারাদিন কান্না জমিয়ে রাখেন শঙ্করী—সারা রাতভোর বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদেন: ঠাকুর! আজও কি আমার সময় হয়নি!

তারপর একদিন। কার্তিক মাস। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল রাণী শঙ্করীর। চমকে উঠলেন তিনি। ঐ তো তিনি ডাকছেন: "রাই জাগো, রাই জাগো, ডাকে শুকসারী। বলে, কত নিদ্রা যাও তুমি—"

কার্তিকের প্রত্যুষে প্রভাতফেরী করে যাচ্ছে বৈষ্ণবী। রাণী শঙ্করীর মনে হল, না, প্রভাতফেরী নয়। তিনিই ওঁকে ডাকছেন। শুকসারী নয়, তাঁর শ্যামই ডাকছেন—রাই জাগো, রাই জাগো! আর কত ঘুমোবে?

বুকে একটা বেদনা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে তিনি বুঝতে পারেন, মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। ঘটাকাশ এবার পটাকাশে মিলবে। মুক্তির ডাক অন্তর থেকে শুনতে পাচ্ছেন। ডাকলেন তিনি, পুঁটু! ও পুঁটু! ওঠ্ মা!

মোতির মেয়ে পটেশ্বরী মাটিতে শুয়েছিল। এই ঘরেই শোয় সে। ধড়-মড়িয়ে উঠে বসে। বলে, ঠাম্মা ডাক্‌তিছ?

—হ্যাঁ। বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়। জরুরী!

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করেন কাশীশ্বরী, কী হয়েছে মা? ডাকছেন?

—হ্যাঁ মা। এতদিনে সময় হয়েছে। আমি তাঁর ডাক শুনতে পেয়েছি। এবার যাব আমি।

—কী বলছেন আপনি! শরীরগতিক খারাপ লাগছে? কবিরাজ মশাইকে ডাকব?

—তাঁকে তো ডাকবেই। না, ওষুধ পাচন আর খাব না আমি। তবে তিনি নাড়িটা দেখে বলে যান, কতক্ষণ এ যন্ত্রণা সইতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, সূয্যি ডোবার আগেই—

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কাশীশ্বরী—শঙ্করী আবার ডাকলেন, আর একটা কথা, বৌমা। শোন। এদিকে এস।

ঘনিয়ে আসেন কাশীশ্বরী। শঙ্করী ওর হাতটা চেপে ধরে বলেন, শেষ সময়ে আর ছলনা করো না মা, ছুটকিকে পাঠিয়ে দাও। শেষ দিনটা তাকে নিয়ে—

—ছুটকি? মানে বৌমা?

—হ্যাঁ। আমি সব জানি রে। স্বীকার করতে পারিনি। কোন্ লজ্জায় করব? আমি বেঁচে রইলাম, আর দেবেন ড্যাংডেঙিয়ে—

কাশীশ্বরী জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধাকে। এতদিনে তাঁর সঞ্চিত কান্নাটা কাঁদতে পারলেন তিনি। শঙ্করীর কাছে এসে, কাছে পেয়ে, তাঁকে সত্যিই ভালবেসে-ছিলেন। শ্রদ্ধা করেছিলেন। শঙ্করীকে না ভালবেসে থাকা যায় না।

মৃন্ময়ীও এল। সেও কাঁদল বুকফাটা কান্না। তারপর বললে, বড়দি, তোমার কি ভয় করছে?

চাকা পালটে গেছে। এবার মৃন্ময়ীই তাঁকে অভয় দিতে বসেছে। শঙ্করী বললেন, দূর পাগলী। আমি তো তাঁর কাছে যাচ্ছি। সেখানে তোর ঠাকুর্দা আছেন, বড়দি আছেন, দেবেন আছে, কৈলাস আছে—তারা সবাই যে আমার প্রতীক্ষা করছে। কে জানে, হয়তো তিনিও আছেন আমার প্রতীক্ষায়।

—কে! তোমার গুরুদেব! কাব্যতীর্থমশাই?

ম্লান হাসলেন রাণী শঙ্করী। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বংশবাটির ছোটরাণীমা।

একুশ

সেখানে কিন্তু ভুল হয়েছিল শঙ্করী দেবীর। কাব্যতীর্থমশাই এখনও আছেন এ ধরাধামে। সাতাশি বছরের বৃদ্ধ। জরাজীর্ণ নন তা বলে। এখনও তাঁর দৃষ্টি ঠিক আছে, এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। তা বলে তাঁর কি পরিবর্তন হয়নি? হয়েছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তিনি যখন বংশবাটির খেয়াঘাটে রামমোহনের বজরায় চেপেছিলেন তখন তাঁর মস্তক ছিল মুণ্ডিত, অর্কশিখায় বিদ্ধ ছিল শ্বেত-করবী, কপালে ছিল শ্বেত-চন্দনের টিপ, মুখ খেউরি করা—নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গে

ছিল শুধু যজ্ঞোপবীত। আজ তাঁর একমাথা সাদা চুল, একমুখ দাড়ি—ললাটে চন্দনের পরিবর্তে ত্রিবলী, উর্ধ্বাঙ্গে পিরাণ এবং তার উপর কম্বল। সমগ্র ভারত-ভূখণ্ড পরিক্রমা করেছেন পদব্রজে। কন্যাকুমারিকা থেকে জ্বালামুখী, দ্বারকাধাম থেকে কামাক্ষা। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেননি আদৌ। কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন কাশীধামে। তারপর থেকে পথে পথেই কেটেছে। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক দণ্ড তিনি কাটিয়ে গেছেন জন্মভূমিতে—সেই যেদিন নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছিলেন, রাণী শঙ্করী সহমরণে যাচ্ছেন শুনে। জন্মভূমি তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নৃসিংহদেবের চিতায় অগ্নি-সংযোগের পূর্বেই।

নৌকা ঘাটে এসে লাগল। অতি বৃদ্ধ শঙ্করদেব এগিয়ে এলেন গলুইয়ের কাছে। মাঝি বললে, হুঁশিয়ার বুড়াবাবু, ঘাট পিছল হৈ!

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, গোটা সংসারটাই তো পিছল, মাঝি-ভাই।

পদস্পর্শ করার পূর্বে সেই ঘাটের গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে ললাটে লেপে দিলেন। তারপর নামলেন এক হাঁটু জলে। বংশবাটির খেয়াঘাটে।

চিনতেই পারছিলেন না। এই সেই বংশবাটির খেয়াঘাট? সেই জড়াজড়ি-করা তেঁতুল-বটটা গেল কোথায়? আর দোবেজীর সেই ছাপড়া-ঘেঁষে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটা? দোবেজীর ছাপরাটাই বা কোথায়? না, ঘাটওয়ালা রামাওতার দোবেকে চেনে না, নামই শোনেনি কখনও।

ঘাটের ধারে ধারে সর্ষের ক্ষেত। ফুল ধরতে শুরু করেছে। বাঁ দিক দিয়ে মন্দিরে যাবার হাঁটা পথটা ছিল। সেখানে এক এড়ো-এড়ি পাকা পাঁচিল। কাব্যতীর্থ একজন পথচারী প্রৌঢ়কে বললেন, মন্দিরে যাবার পথটা কোনদিকে?

—কোন্ মন্দির?

এ আবার কী প্রতিপ্রশ্ন! পঞ্চাশ বছর পূর্বে মন্দির বলতে ৺অনন্তবাসুদেব মন্দিরই বোঝাতো। জবাব না পেয়ে প্রৌঢ় পুনরায় বলেন, মায়ের মন্দিরে যাবেন? হংসেশ্বরী মন্দির?

—হংসেশ্বরী! মায়েব মন্দিরের নাম তো স্বয়ম্ভরা।

—হ্যাঁ, সে মন্দিরও আছে। সবই কাছাকাছি। ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে যান। মশায়ের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে? নিবাস?

—তীর্থযাত্রী বাবা। পথই আমার ঘর।

বৃদ্ধ এগিয়ে চলেন। তাহলে 'হংসেশ্বরী' নামে একটি মন্দিরও হয়েছে ইতিমধ্যে তাঁর গ্রামে! তা হোক। তিনি প্রথমে যাবেন ৺অনন্তবাসুদেব মন্দিরে। যে দেব-

দেউলের পুরোহিত ছিলেন তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব ত্রিপুরেশ্বর ন্যায়রত্ন মশাই। সর্বতীর্থ পরিক্রমা সেরে কাব্যতীর্থ শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছেন স্ব-গ্রামে। একটিই বাসনা আছে—এই গঙ্গাতীরের শ্মশান-ঘাটে যেন তাঁর শেষকৃত্য হয়। এই ঘাটে শুয়েছেন ন্যায়রত্ন, ভট্টশালী, বিদ্যালঙ্কার—আরও একশো বছর আগে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের গুরু, অর্থাৎ তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার। শুধু তাই নয়, এই শ্মশানঘাটের পুণ্য-তীর্থে স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ করেছিলেন সেই মহীয়সী নারী—যাঁর 'কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে' কাব্যতীর্থ নাকি ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েছিলেন।

অনন্তবাসুদেব মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। এই দেবালয়টিই হচ্ছে তাঁর পিতার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের লীলাক্ষেত্র। এর প্রতিটি শিলায়, প্রতিটি সোপানে, প্রতিটি ধূলিকণায় তাঁর পিতৃস্মৃতি বিজড়িত। 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়তে পরমেশ্বরঃ'—না, সুপরিচিত শ্লোকটির ভ্রমাত্মক আবৃত্তি করেননি তিনি—অনুপ্রাসের অনুরোধে সজ্ঞান রূপান্তরও নয়; এর মূল আরও গভীরে নিহিত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ভূতলেই—মন্দির চত্বরে না উঠেই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মন্দিরের তরুণ পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছেন সম্মুখে; তাঁর হাতে কুশীপাত্র। বললেন, চরণামৃত নিন বাবা!

হাত দুটি জোড় করলেন শঙ্করদেব, বললেন, মার্জনা করবেন।

—মার্জনা করব? অর্থাৎ চরণামৃত নেবেন না? পুরোহিত যারপরনাই বিস্মিত।

শঙ্করদেব নীরব। প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

—আপনি হিন্দু তো?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে?

—বাধা আছে।

আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তরুণ পুরোহিত বলেন, ভিনদেশের যাত্রী দেখছি, আপনার পরিচয়?

কাশফুলের মত সাদা মাথাটা নেড়ে কাব্যতীর্থ বলেন, না। ভিনদেশী নই, পুরোহিত মহাশয়। এই গ্রামেই আমার বাস ছিল; এই মন্দিরেরই পুরোহিত ছিলাম গত শতাব্দীতে। আমার নাম শ্রীশঙ্করদেব কাব্যতীর্থ।

পুরোহিত স্তম্ভিত। বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার নাম তো আমার জানা! তাহলে চরণামৃত প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? অন্তেবাসীর মত নিচে দাঁড়িয়েই

বা আছেন কেন? উঠে আসুন উপরে।

—আপনি রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়ই। যাঁর উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হল।

—আমি তাঁরই শিষ্য। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করি না।

এবার পুরোহিত বজ্রাহত। দম নিয়ে বলেন, কেন ঠাকুরমশাই? জাত দিলেন কেন?

—জাত দিয়েছি বলে আমি মনে করি না। আমি হিন্দুই আছি, ব্রাহ্মণই আছি, উপবীত ত্যাগ করি নাই—কিন্তু যাক সে-কথা, ঘাটে একজন বললেন, মা হংসেশ্বরী মন্দিরের কথা। সেটা কোথায়?

পুরোহিত অভিমান করে বলেন, আপনি তো ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহলে মায়ের মন্দির দর্শন করতে চাইছেন কেন? জাত যাবে না?

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, আমি জুম্মা মসজিদ দেখেছি দিল্লিতে, স্বর্ণ-মন্দির দেখেছি অমৃতসরে, থুপারাম স্তূপ দেখেছি সিংহল দ্বীপে গিয়ে। হংসেশ্বরী মন্দির দর্শনেও আমার জাত যাবে না।

পুরোহিতের কৌতূহলই জয়লাভ করল। বললেন, ঐ তো সেই মন্দির।

তাই তো। পিতৃস্মৃতির মধ্যে মগ্নচৈতন্য ছিলেন বলে এতক্ষণ নজরে পড়েনি। অনন্তবাসুদেবের গা-ঘেঁষে উঠেছে নূতন দেব-দেউল—হংসেশ্বরীর শ্রীমন্দির।

—বাঃ! অপূর্ব! আমার স্বগ্রামে এতবড় দেব-দেউল নির্মিত হয়েছে আর আমি খবরই রাখি না! কে তৈরী করলেন এ মন্দির?

—রাজা মহাশয়, নৃসিংহ দেব রায়। বর্তমান রাজার প্রপিতামহ।

কাব্যতীর্থ তৎক্ষণে পাঠ করতে থাকেন মন্দিরগাত্রের প্রস্তর-ফলকটি:

"শাকাব্দে রস বহ্নি মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দির মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে॥"

পাঠান্তে বিস্ময়াবিষ্ট কাব্যতীর্থ বলেন, তার অর্থ?

পুরোহিত বিস্মিত হন কাব্যতীর্থের বিহ্বলতায়। বলতে থাকেন শ্লোকটির বঙ্গার্থ।

—আঃ! আমি অন্বয়-ব্যাখ্যা চাইছি না। আমি জানতে চাইছি, নৃসিংহ-দেবের আরব্ধ মন্দির তদাজ্ঞানুগা শ্রীশঙ্করী কী ভাবে সমাপ্ত করতে পারেন?

—কেন? এর মধ্যে অনুপপত্তি কোথায়?

—কী আশ্চর্য ! ছোটরাণীমা তো স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন।

পুরোহিতের মুখে এতক্ষণে হাসি ফোটে : ও বুঝেছি। আপনি বুঝি তাই শুনেছেন ? হ্যাঁ, এমন একটা কথা প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে রাণীমা তাঁর অভিমত পরিবর্তন করেন। সহমরণে যাননি তিনি।

চমকে ওঠেন কাব্যতীর্থ : কী! কী বললেন আপনি! সহমরণে যাননি

পুরোহিত বলেন, সে অনেক কথা।

—অনুগ্রহ করে বলবেন ? আমি…আমি…কি বলব ? অত্যন্ত আগ্রহী—

পুরোহিত সংক্ষেপে অর্ধশতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন—কীভাবে থানাদারের কাছে ফৌজ প্রার্থনা করে রাণীমা কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছিলেন —কীভাবে তিনি দেশের রাণী হয়েও একঘরে হয়ে থাকেন, কীভাবে স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করেন, এবং কেমন করে দীর্ঘস্থায়ী মামলায় পুত্রের সঙ্গে বিবাদে সর্বস্বান্ত হন, হুগলীর আদালতে ইতিহাস রচনা করে আসেন বংশবাটির রাজান্তঃপুরিকা—পর্দানসীন বিধবা।

কাব্যতীর্থের শীর্ণ গণ্ড বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিল। উনি থামতেই বলেন, তারপর ? তারপর কী ভাবে তাঁর দেহান্ত হল ?

—দেহান্ত হবে কেন ? কাল রাত্রেও শয়নারতির পর আমি তাকে ভোগ পৌছে দিয়ে এসেছি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফ দিয়ে উঠে পড়েন শঙ্করদেব।

রাজবাটির সিং-দরোজায় মহাবীর প্রসাদ তাঁকে রুখল, জাবাসে ঠাহরিয়ে। কাকে চান বুড়া বাবুমশায় ?

—আমি রাণীমার সাক্ষাতে এসেছি। ছোটরাণীমা, বুড়ামা, রাণী শঙ্করী।

মহাবীর দার্শনিক উদাসীনতায় বললে, দেরী হইয়ে গেছে বাবুমশায়। বুড়ামাকে আজ সকালে নিয়ে গেল যে !

হ্যাঁ, আজ সকালেই এই সিং-দরোজা দিয়ে তাকে শেষবারের মত নির্গত হতে দেখেছে মহাবীর। ডুলিতে নয়, শববাহীদের স্কন্ধে। শ্মশানঘাটের দিকে। মহাযাত্রায় সে অংশ নিতে পারেনি। শূন্য পুরী পাহারা দিচ্ছে। উঃ! কত লোক হয়েছিল ! সংকীর্তন করতে করতে তারা নিয়ে গেছে তাদের রাণীমাকে। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে হাসতে হাসতে বিদায় নিয়েছিলেন রাণীমা তাঁর অতিসাধের রাজবাড়ি থেকে। অন্তর্জলিযাত্রা।

জ্ঞান আছে ! এখনও জ্ঞান আছে ! অস্নাত অভুক্ত পথশ্রমে ক্লান্ত অশীতি-

পর বৃদ্ধ ছুটতে থাকেন শ্মশানের দিকে। সব কিছু বদলে যায়, শ্মশান বদলায় না। সেখানে পৌঁছতে পথ ভুল হয় না। কার্তিকের অপরাহ্ণেও বৃদ্ধের ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠল।

মহাশ্মশান জনারণ্যে পরিণত। কাতারে কাতারে মানুষ। বংশবাটির অতি জনপ্রিয়া রাণীমা সম্মানে বিদায় নিচ্ছেন। সেই রাণীমা, যাঁকে ওরা একদিন এক-ঘরে করেছিল; সেই রাণীমা, যিনি ঘোমটা খুলে আদালতের কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে বংশবাটির আবালবৃদ্ধবনিতা লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল। তিল তিল করে এতদিনে তিনি আবার সম্মানের তুঙ্গশীর্ষে উঠে গিয়েছিলেন। বংশবাটির মানুষ এতদিনে বুঝেছে—তারাই ভুল করেছিল; রাণীমা নয়। তাঁর মহাপ্রয়াণে জনসমাগম হবে না! গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার একদিকে চিকের আড়াল। সেখানে সমবেত হয়েছেন পুরললনার দল। রাণী শঙ্করী একটি পালঙ্কে শায়িতা। তাঁর অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাতীরে, অর্ধ অঙ্গ গঙ্গা-নীরে। না, অর্ধ অঙ্গ নয়, শুধু সেই বলিরেখাঙ্কিত দুটি চরণ ডুবে আছে জলে। ছোট ছোট ঢেউ এসে আদর করছে পায়ের পাতায়—ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল। একদল কীর্তনিয়া সেই অন্তিম শয্যাটি ঘিরে হরিসংকীর্তন করছে। পরিক্রমা করছে পালঙ্ক। গঙ্গার দিকে পরিক্রমা করার সময় তাঁদের জলে নামতে হচ্ছে। কিছু দূরে বসে একজন পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা পাঠ করছেন:

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

বহুপঠিত শ্লোকটিতে কিন্তু আজ সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন না কাব্যতীর্থ। শঙ্করীর আত্মা দেহরূপ-বস্ত্র ত্যাগ করে দেহাতীত আবরণে আবৃত হবে ঠিকই; কিন্তু এ বংশবাটিতে যে স্থানটি শূন্য হয়ে গেল তা তো পূর্ণ হবে না। আত্মার নিত্যতা যেমন ধ্রুব সত্য, দেহীর অনিত্যতাও তেমনি অনস্বীকার্য! বংশবাটিতে নতুন নতুন রাণী আসবে—কিন্তু কোনদিন কি ফিরে আসবে সেই যৌবন-চঞ্চলা ছুটকি, ছোট রাণীমা?

কবিরাজমহাশয় মাঝে মাঝে এসে নাড়ির গতি পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। তাঁর দক্ষিণ হস্তে একটি সাবেক বালুকা-ঘড়ি। বলছেন, তাঁর গণনা অভ্রান্ত—সূর্যাস্ত মুহূর্তে ঐ মহীয়সী মহিলার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। রাণী শঙ্করার মাথার কাছে বসে আছে নতুন যুগের নতুন রাজা-মহাশয়, দশমবর্ষীয় বালক পূর্ণেন্দু দেব রায়, ওঁর প্রনাতি। মাঝে মাঝে গঙ্গোদক দিচ্ছে ওর বিশুষ্ক ওষ্ঠে। দু-এক ফোঁটা গলায় যাচ্ছে; অধিকাংশই কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রাণীমার বাম অঙ্গ

অবশ হয়ে গেছে। তবু পূর্ণ জ্ঞান আছে, এখনও বাক্‌রোধ হয়নি। একজন ব্রাহ্মণ ওর কর্ণমূলে তারক-ব্রহ্ম নারায়ণমন্ত্রোচ্চারণ করছে।

কাব্যতীর্থ সমস্ত পরিবেশটা দেখে নিলেন একবার। পরিচিত একটি মানুষকেও দেখতে পেলেন না। কেমন করে পাবেন? তিনি যে গত শতাব্দীতে দেশত্যাগ করে গেছেন। এই জনারণ্যের মধ্যে মাত্র একটি মানুষ তাঁর পরিচিত—ঐ পালঙ্কে শায়িতা অশীতিপরা মৃত্যুপথযাত্রিণী। তাহলে এই জনারণ্য ভেদ করে কেমন করে পৌঁছবেন তাঁর কাছে! কি পরিচয়ে? এরা তাঁকে কাছে যেতেই বা দেবেন কেন? তাছাড়া মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে রাণী শঙ্করীই যে তাঁকে চিনতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কি? তাই বলে ফিরে যাবেন? এতদূর এগিয়ে এসে? হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। চিতা নিভে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে যাবেন। আজ অমর্তলোকে ঐ রাণীই যে তার অগ্রজা হতে বসেছেন!

কাব্যতীর্থের কোন ভূমিকা তো এখানে নেই :

"বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওম্ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর ॥"

"অনন্তর এই প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হবে। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত এবং কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর।"

কী এখন ওঁর কর্তব্য? দূর থেকে শুধু ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণীর আত্মার সদ্গতি কামনা করা। অগ্নিদেবকে অনুরোধ করা—হে অগ্নি! তুমি ওঁকে সুপথে নিয়ে যাও। হে দেব! তুমি তো আমাদের সমস্ত কর্মই জানো। ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে এই বৃদ্ধের যে অন্তর্লীন সম্পর্ক তা তো অন্তত তোমার অবিদিত নেই? তাই এই চরম মুহূর্তে প্রার্থনা করছি, আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা মার্জনা কর প্রভু! তোমাকে বারংবার প্রণাম!

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥"

—বুড়াবাবুমশায়! মা আপনারে ডাক্‌তিছেন!

চমকে ওঠেন কাব্যতীর্থ। একটি আট-দশ বছরের বালিকা। বলেন, আমাকে? কে ডাকছেন? কেন?

শঙ্করদেব মেয়েটির অঙ্গুলি নির্দেশের সংকেত অনুযায়ী দেখলেন—ঘেরাটোপের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিধবা বধূ। বছর বাইশ-তেইশ বয়স, থান পরা, নিরাভরণা। দেখেই মনে হল, ঐ যে বিধবা মেয়েটি আজও এ পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের আনন্দ আস্বাদন করছে তা শুধু তাঁর সেই

বয়স্যের আশীর্বাদে। বয়স্য-পথপ্রদর্শক-গুরু! পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন কাব্যতীর্থ: তুমি আমাকে ডাকছিলে মা ?

মেয়েটি অবগুণ্ঠন অল্প অপসারিত করে নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখছিল। বললে, আপনিই কি শ্রীশঙ্করদেব কাব্যতীর্থমশাই ?

শঙ্করদেব স্তম্ভিত। স্বগ্রামে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। এই তরুণী বিধবাটির জন্ম তাঁর দেশত্যাগের বহু বহু দশকের পরে। তাহলে সে কেমন করে চিনতে পারল তাঁকে ? পরম করুণাময়ের এ কি লীলা! বললেন, হ্যাঁ মা। কিন্তু…কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে ?

—আমি যে জানতাম, আপনি আসবেন। এত দেরী করলেন কেন ?

শঙ্করদেব সবিস্ময়ে বলেন, তুমি জানতে আমি আসব! তুমি কি অন্তর্যামী! তুমি কে ?

—আমি ছুটকি! বংশবাটির ছোটরাণীমা।

শঙ্করদেব বজ্রাহত! সব ভুল হয়ে গেল তাঁর। স্থান-কাল-পাত্র। অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তার যেন বিন্দু হয়ে, ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল! কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে তিনি কি শতাব্দীর ও-প্রান্তে পৌছে গেলেন ? শঙ্করী কি বৃদ্ধা হয়ে যায়নি ? শঙ্করী কি অনন্তযৌবনা ? দেহাতীত আত্মার মত অজর অমর ?

—আসুন আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি যে আপনার পথ চেয়েই এখনও বেঁচে আছেন!

—তিনি! তিনি কে ?

—বাঃ! আমার ঠাকুমা—রাণী শঙ্করী। তিনি যে আপনার প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটির পিছন পিছন এগিয়ে আসেন শঙ্করদেব। না, বাধা পেতে হল না। বুঝলেন, এ মেয়েটি একালের রাণীমা, একালের ছুটকি!

মৃন্ময়ী ওঁর হাত ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল রাণীমার পালঙ্কের পাশে। নিজেও বসল অপর পার্শ্বে। তাঁর কর্ণমূলে বললে, বড়দি, চোখ চেয়ে দেখ। তিনি এসেছেন!

শঙ্করী চোখ চাইলেন। বললেন, এতক্ষণে ?

আশ্চর্য! বিশ্বনিয়ন্তার এ কী অচিন্তনীয় লীলা! অসম বয়সী দুই সখীর কাছে শতাব্দীর ওপার থেকে নিতান্ত দৈবক্রমে অন্তিম-মুহূর্তে শঙ্করদেবের এ প্রত্যাগমন কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। যেন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতই তিনি এতক্ষণে এসে পৌচেছেন—আসার কথাই ছিল, পথে কিছু দেরি হয়েছে,

এই যা!

—কই তিনি?

—ঐ তো তোমার ডান পাশে।

হাত দিয়ে ধরে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল।

শঙ্করী তাকিয়ে আছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না। দৃষ্টি না থাক, স্পর্শেন্দ্রিয় সক্রিয়। ধীরে ধীরে শঙ্করদেবের সারা গায়ে বলিরেখাঙ্কিত ডান হাতটা বুলোলেন। বললেন, কিন্তু এ তোমার কী রূপ ঠাকুর? তোমার শিখা কই? তোমার গায়ে পিরান, মুখে দাড়ি!

কাব্যতীর্থ অনেকটা সহজ হয়েছেন। হেসে বললেন, তুমিও যে অনেক বদলে গেছ শঙ্করী! তোমার সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণ কই? সেই মধ্যেক্ষামা গঠন কই? হরিণনয়নের দৃষ্টি কই?

—এই তো। আমার সবই আছে। কিছুই হারায় না—

মৃন্ময়ীকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। মৃন্ময়ী সলজ্জে নয়ন নত করে। হরিণা-নয়ন!

—কিন্তু একটা কাজ যে বাকি আছে ঠাকুর! ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিলে। গুরুদক্ষিণা নিয়ে গেছ, বীজমন্ত্র তো দাওনি। দাও। আমার কানে কানে বলে দাও। না হলে পারের কড়ি গুণে দেব কেমন করে?

শঙ্করদেব অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। এ প্রশ্ন উঠে পড়বে তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি যে এখন বিধর্মী! তিনি নিজে তা মনে করেন না, কিন্তু লোকে তো তাই ভাবে। রাজা রামমোহনের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—না, দীক্ষা নেননি, তবু রাজা রামই যে ওঁর নয়নে পরিয়েছেন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। এত সব তত্ত্বকথা তো অল্প সময়ে বোঝানো যাবে না ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণীকে। অথচ কুলগুরুর অধিকারে এমন অবস্থাতে বীজমন্ত্রদানও যে অত্যন্ত অধর্মের কাজ হবে। শুধু অধর্ম নয়, মিথ্যাচার—যে মিথ্যাকে ওঁরা দুজনেই আজন্ম পরিহার করে গেছেন।

—কী ঠাকুর! মন্ত্র দেবে না তুমি?

—আমি তো শক্তিমন্ত্র দেব না শঙ্করী!

শঙ্করী মৃদু হাসলেন। গত শতাব্দীতেই তো এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি।

—না, বৈষ্ণব মন্ত্রেও দীক্ষা দিতে পারব না। আমি আজ আর পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী নই। সেই মহামানব রাজা রামমোহনের প্রভাবে আমি এখন গুণাতীত

পরম ব্রহ্মের উপাসক। কালী নয়, শিব নয়, হংসেশ্বরী নয়, রাধামাধব নয়!

অনেকক্ষণ চোখের পাতা পড়ল না শঙ্করীর। দু চোখ বেয়ে শুধু দুটি জলের ধারা নেমে এল। বিশীর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে শঙ্করদেবের হাতটি ধরলেন। অস্ফুটে বললেন, একবার ভুল করেছি। দ্বিতীয়বার করব না। রাজা রামের কাছ থেকে যে সম্পদ পেয়ে তুমি সব ছেড়েছ তারই খুদকণা আমার কানে কানে বল। সেই মন্ত্রই দাও। তোমার হাত ধরেছি। পারানির কড়ি কটি গুণে দেবার পাথেয় তোমার হাত থেকেই নেব যে আমি। আর তো হাত ছাড়ব না ঠাকুর!

—কোনও দ্বিধা নেই?

—কিসের দ্বিধা? 'তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

শঙ্করদেবও দ্বিধামুক্ত হলেন। অবলীলাক্রমে মৃত্যুপথযাত্রিণীর শীর্ণ কণ্ঠ আলিঙ্গন করে ধরলেন। ঘনিয়ে এল তাঁর মুখ, ওঁর মুখের কাছে। কর্ণমূলে অতি সন্তর্পণে, অতি নিভৃত-কূজনে দিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের বীজমন্ত্র।

পারানির কড়ি।

যেন ফুলশয্যা-রাত্রে কানে কানে বলা—'তোমাকেই ভালবাসি।'

সমাপ্ত